দ্বিতীয় অধ্যায়

দুই 'ম'-এর নারী-শিক্ষা

> Prisons are built with stones of law, brothels with bricks of religion. অর্থাৎ, আইনের পাথরে জেলখানা তৈরি আর ধর্মের ইটে বেশ্যালয়। —আর্নলড জোসেফ টয়িনবি (১৮৮৯-১৯৫৭)

বলা হয়, কোরান, পুরাণ, বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, তৌরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে আছে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান, তাবৎ মানব জাতির কল্যাণ আর কল্যাণ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আর বর্তমান বাস্তবতা প্রমাণ করে ঠিক তার উল্টো। প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসীই নির্লজ্জভাবে দাবি করেন একমাত্র তার ধর্মই সাম্যবাদী, তার ধর্মই সহিষ্ণুতা, মানবতা ও ন্যায় বিচারের শিক্ষা দেয়; অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জগতে ধর্মের নামে যত অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা, বর্বরতা, জঘন্যতা, রক্তপাত, নিপীড়ন, শোষণ, অবদমন, অধিকারহরণ, বঞ্চনা, জাতিনির্যাতন, গোষ্ঠীনির্যাতন, নারীনির্যাতন, শিশুনির্যাতন, শ্রমশোষণ, যৌনশোষণ সংঘটিত হয়েছে—আর কোনো কিছুর কারণে এরূপ অমানুষিক, বিবেকহীন ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়নি। মুসলমানের 'আল্লাহ', হিন্দুর 'ভগবান'কে ভালবাসার কোনো কারণ নেই, তেমনি হিন্দুর 'ভগবান', খ্রিস্টানের 'গড' বা মুসলমানের 'আল্লাহ'কে ভালবাসতে পারে না। জেহোভা যেমন ইহুদিজাতিকে একমাত্র মনোনীত জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, পয়গম্বর মুহাম্মদও আরাফাতের ময়দানে বিদায়ে-হজের শেষ ভাষণে একই কথা বলেছেন; কোরানেও এমন কথা বলা হয়েছে : "মুসলমানরা শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য যাদের অভ্যুত্থান হয়েছে।" (সুরা ৩, আল-ইমরান, আয়াত ১১০)। আসলে ধর্মগ্রন্থসমূহে আল্লাহ-ভগবান-গডের যে স্বরূপ আমরা দেখতে পাই এতে তিনজনকেই নিষ্ঠুর ঘাতক মনে হয়। অনুসারীরা তাদেরকে তৈরি করার পর থেকে তারা একে অন্যকে উৎখাত করার জন্য তুলকালাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ অবধি তিনজনই বহাল তবিয়তে টিকে আছেন। তাদেরকে 'খুশি' রাখার জন্যে প্রতি বছরই পৃথিবীর নানা স্থানে ভাঙতে হচ্ছে মসজদি-মন্দির, ভাঙতে হচ্ছে বৌদ্ধমূর্তি, যাত্রী ভর্তি উড়োজাহাজ নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে টুইন টাওয়ারে, ম্লেচ্ছ নিধন করতে হচ্ছে গুজরাটে। মানব ইতিহাসের কলঙ্ক মধ্যযুগের ক্রুসেডে নিহত হয়েছেন অগণিত খ্রিস্টান ও মুসলমান। ইউরোপে তৌরাত শরিফের Exodus (হিজরত)-এর ২২:১৮ এবং Leviticus (লেবিয়)-এর ২০:২৭ নম্বর শ্লোকের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে 'ভূতগ্রস্ত' অনেক নর-নারী ও শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আবার ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের ৭নং ঋকসহ আরো কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের শ্লোকের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের নির্মম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সতীদাহ, সহমরণে হাজার হাজার নিরপরাধ নারী বলিদান হয়েছে চিতার 'পবিত্র' অগ্নিতে। বিধবা প্রথার কল্যাণে অগণিত যুবতী নারী হয়েছেন পতিতা, করেছেন আত্মহত্যা।

আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হিন্দুদের ভগবান মনু ও মুসলমানদের নবী মুহাম্মদের দৃষ্টিতে নারীর অবস্থান মূল্যায়ণ। নারী বিষয়ে এই দুই 'ম' (মনু ও মুহাম্মদ)-এর ধারণায় মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। যদিও মনু ছিলেন শুধুই একজন চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারক, বিধায় নারী বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল একমাত্রিক; পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ছিলেন একজন বিচক্ষণ সৈনিক, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি একজন রাষ্ট্রনায়ক। তাই সব বিষয়েই মুহাম্মদের (দঃ) ধারণা ছিল বহুমাত্রিক। সে জন্যেই মুহাম্মদের (দঃ) কথায়, কর্মে ও হাদিসসমূহে স্ববিরোধী বক্তব্য নানা সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রফেট মুহাম্মদের বক্তব্যে-আচরণে নারী সম্পর্কে মাঝেমাঝে কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি নজরে এলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর নারী সম্পর্কে কঠোর পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে বিভিন্ন ইসলামি-চিন্তাবিদ বিভিন্ন সময় স্ববিরোধী অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য, 'একটা হাদিস আরেকটা হাদিসকে সমর্থন করে না' অভিযোগে কিছু হাদিসকে দুর্বল (জয়িফ) আর কিছু হাদিসকে সবল বলে থাকেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একজন চতুর এবং দক্ষ রাজনীতিবিদের এরকম পদক্ষেপ নেওয়াটাই স্বাভাবিক।

যেকোনো দেশের-কালের সমাজব্যবস্থা কতটুকু উন্নত, কতটুকু মানবিক, কতটুকু গণতান্ত্রিক তা পরিমাপ করতে হলে যেমন উৎপাদকের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক, শাষক-শোষিতের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়, শোষিতদের জীবনমান নিয়ে আলোচনা করতে হয়, তেমনি সেই সমাজব্যবস্থায় বা কালে নারীর অবস্থান কোথায়, সমাজপতিরা নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে না আসলে, কোনো আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সমাজব্যবস্থা কতটুকু মানবিক ছিল তাও বুঝা যায় না। পুরুষ কর্তৃক ধর্মীয় ব্যবস্থা বহাল রাখার অন্যতম কারণ অবাধ নারীভোগ। নারীকে জগতের কোনো ধর্মই 'মানুষ' হিসেবে গণ্য করেনি, করেছে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'নারীজাতি শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক থেকেই দুর্বল, অক্ষম, অপরিপক্ষ, বুদ্ধিহীন, অসংযত। তাই স্বামী শুধু তার স্ত্রীর দেহের মালিকই নয়, স্ত্রী কর্তৃক অর্জিত টাকা-পয়সা এমন কি তার বাপের

বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সম্পত্তিরও মালিক ।' যদিও আমাদেরকে জন্মের পর থেকে শোনানো হয়, মস্তিষ্কের ভিতর একেবারে চিরতরে গেঁথে দেবার চেষ্টা করা হয় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো অপৌরুষেয়; এগুলো ঈশ্বরের (আল্লাহ-ভগবান-গড) বাণী । ঈশ্বরই নারী-পুরুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন । আমাদের এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের অনুসারীর সংখ্যাই সর্বাধিক । হিন্দুরা মনুকে ভগবান মানেন, হিন্দু আইনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে মনুসংহিতা আর মুসলমানদের কাছে মুহাম্মদ হলেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী-পয়গম্বর-রসুল; যদিও কেউ কেউ বলে থাকেন : "Muhammad is the real face of Allah." কথাটি একেবারে মিথ্যে নয় । অনেক মুসলমানই দেখেছি মোটামুটি আল্লাহর সমালোচনা-নিন্দা সহ্য করে ফেলেন, কিন্তু প্রফেট মুহাম্মদের নিন্দা তো অনেক দূরের কথা, কোনো কারণে প্রফেট মুহাম্মদ সম্পর্কে সামান্য সমালোচনা কিংবা ভিন্নমত প্রকাশ খুবই বিপদজনক ব্যাপার; ঘাড়ে দুটো মাথা না থাকলে এ ধরনের দুঃসাহস দেখানোটা বোকামি! যাহোক মূল আলোচনায় যাই, ইসলাম ধর্মীয় ভাষ্য মতে আল্লাহর 'ওহি' জিবারাইল মারফত নবী মুহাম্মদের কাছে এসেছে যা অনেক আগেই লেখা হয়েছিল এবং রক্ষিত ছিল লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে । পনেরশত বছর আগের এই কথিত আল্লাহর 'ওহি' হলো কোরান শরিফ, আর পয়গম্বর মুহাম্মদের জীবনাচরণ, বক্তব্য, দর্শন হলো হাদিস । যা আজকে সারা পৃথিবীর প্রায় একশত কোটি মুসলমানদের ঈমানের স্তম্ভ, এবং মুসলিম আইনের ভিত্তি । তাই এই দুই ধর্মের নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করতে হলে অবশ্যই দুই ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে 'নারী' সম্পর্কে কী বলা হয়েছে সেটা দেখতে হবে । প্রথমেই আমরা দেখি হিন্দুদের কথিত ভগবানের মর্যাদা পাওয়া ব্রাহ্মণ মনু 'নারী' সম্পর্কে আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিস্তৃত আলোচনার সুবিধার্থে হিন্দু ধর্মের আরো কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের 'নারী' সম্পর্কে ভাষ্যটিও জেনে নিব ।[+]
চতুর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রায়ই বলে থাকেন মনুসংহিতা হচ্ছে মানবধর্মশাস্ত্র । সেই মানবধর্মশাস্ত্রে 'নারী' সম্বন্ধে ভগবান মনু বলেন[১] (নবম অধ্যায়, চৌদ্দ নম্বর শ্লোক; সংক্ষেপে ৯:১৪) :

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥

অর্থাৎ, স্ত্রীরা রূপ বিচার করে না, (যৌবনাদি) বয়সে এদের আদর নেই, রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই সম্ভোগ করিতে চায় ।

মনু বলেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে (৫:১৫৪) :

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ ।
উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

অর্থাৎ, পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রীকর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য ।

আর স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে ব্যভিচারিণী হলে সংসারে নিন্দনীয় হয়, শৃগালের জন্মপ্রাপ্ত হয় এবং (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় (৫/১৬৪) । স্ত্রীর আগে স্বামী মারা গেলে মনু স্পষ্ট ঘোষণা দেন (৫/১৫৭) : "স্ত্রী বরং পবিত্র ফল, মূল, ফুল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, তথাপি পতি মৃত হলে অন্যের নামোচ্চারণ করবেন না ।" কিন্তু স্বামীর আগে স্ত্রী মারা গেলে মনুর নিয়মটি ঠিক উল্টো (৫/১৬৮-১৬৯): "পূর্বে মৃত স্ত্রীকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় আগুন দিয়ে (স্বামী) পুনরায় বিবাহ করবেন; বিবাহ করে আয়ুর দ্বিতীয়ভাগ গৃহে বাস করবেন ।" মানবধর্মের দারুন নমুনা!

আবার স্কন্ধপুরাণের নাগরখণ্ডের ৬০ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে :

নির্দয়ত্বং, তথা-দ্রোহং কুটিলত্বং বিশষতঃ
অশৌচং নির্ঘৃণতৃঞ্চস্ত্রীনাং দোষা স্বভাবজাঃ ।

অর্থাৎ, নির্দয়ত্ব, দ্রোহ, কুটিলতা, অশৌচ ও নির্ঘৃণত্ব এই সমস্ত দোষ নারী জাতির স্বভাবজাত । স্কন্ধপুরাণের এই শ্লোকের সাথে মিল রয়েছে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১৩ নং শ্লোকের; সেখানে মনু বলেন, "স্বভাব এস নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্/অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥" অর্থাৎ নারীদের স্বভাবই হল পুরুষদের দূষিত করা...!

[+] হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান সম্পর্ক বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন : (ক) সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬ । (খ) সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১ । (গ) কঙ্কর সিংহ, *মনুসংহিতা এবং নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০৫ ।

[১] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), *মনুসংহিতা*, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯) ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ।

অশৌচদের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের হাদিস শরিফে আছে, একবার ঈদুল ফিতরের দিনে কয়েকজন মহিলা নবীজি মুহাম্মদের (দঃ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীজি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "হে রমণীগণ, তোমরা বেশি বেশি করে দান-খয়রাত করো, কারণ আমি মেরাজের সময় জাহান্নাম ভ্রমণকালে দেখেছি দোজখের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী। একজন রমণী জিজ্ঞেস করেন—হে আল্লাহর নবী, কেন এমনটি হবে? নবীজি উত্তর দেন : 'তোমরা নির্দয়, দ্রোহী। অভিশাপ করা ও স্বামীর অবাধ্যতা তোমাদের স্বভাব। ধর্মচর্চায় ও বুদ্ধিমত্তায় তোমাদের মতো নির্বোধ, অক্ষম, অজ্ঞান আর হয় না। তোমাদের কুটিলতায় একজন সৎপুরুষ চোখের পলকে অসৎ হতে পারে।' একজন মহিলা জিজ্ঞেস করেন—নবীজি আমরা ধর্মচর্চায় ও বুদ্ধিমত্তায় নির্বোধ, অক্ষম, অজ্ঞান তার প্রমাণ কি? নবীজি উত্তর দেন : 'আল্লাহপাক স্বাক্ষীর ব্যাপারে তোমাদের দুইজনকে এক পুরুষের সমান করেছেন, এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার প্রমাণ। তোমাদের মাসিক রক্তস্রাবের কারণে নামাজ পড়তে পারো না, রোজাও রাখতে পারো না, এটা কি তোমাদের অক্ষমতা নয়?' (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৬, নম্বর ৩০১)[২]।

নবী মুহাম্মদ (দঃ) ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীলোকদিগকে অপবিত্র, নাপাক ঘোষণা দিয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান-হাদিস স্পর্শ করতে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজ-রোজা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু দোয়া দরুদ পড়তে বা ব্যবহারিক কোনো বস্তু বা স্বামী সেবা কিংবা তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে ভগবান মনু বলেন (৯:১৮) :

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্থিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণসহ সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য বেদ-স্মৃতি পাঠ, মন্ত্র উচ্চারণ, পূজা-অর্চনা প্রভৃতিতে কোনো অধিকার নেই। নারীরা মন্ত্রহীন, মিথ্যার ন্যায় অশুভ।

আবার মনু বলেন (৯:১৫) :

পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোহপীহ ভর্ত্তৃস্বেতা বিকুর্বতে॥

সহজ বাংলা হচ্ছে পুরুষ দর্শনমাত্র স্ত্রীদের পুরুষের সাথে সঙ্গম করার ইচ্ছা জাগে এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবত স্নেহশূন্যতা প্রযুক্ত স্বামী কর্তৃক রক্ষিতা হলেও স্ত্রীলোক ব্যভিচার প্রভৃতি কুক্রিয়া করে। ভগবান মনুর এই স্বর্গীয় বাণী স্ত্রী, মা, বোন সকলের প্রতি প্রযোজ্য। পদ্মপুরাণে আরও উল্লেখ পাই (সৃষ্টিখণ্ড, ৯১ নম্বর শ্লোক) : "দাসীং হাত্যাতু লিঙ্গস্য নরকান্ন নিবর্ত্ততে-কামার্তে/মাতরং গচ্ছেন গচ্ছেচ্ছিব চেটিকাম।" অর্থাৎ, শিবলিঙ্গ সেবিকা দাসী হরণ করলে চিরকাল নরক ভোগ হয়ে থাকে। কামার্ত হয়ে বরং মাতৃগমন করবে তথাপি শিবলিঙ্গ সেবিকা গমন করবে না।

পয়গম্বর মুহাম্মদ (দঃ) কখনো কামার্ত হয়ে মায়ের সাথে সঙ্গমের অনুমতি দেন নাই, তবে সাময়িক-অস্থায়ী বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন। ঘটনাটা এরকম, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের এক অভিযানে যুদ্ধরত মুসলিম সৈনিকগণ সুদীর্ঘ ১৩ দিন নারীবিহীন রজনী অতিবাহিত করার পর নবীজির কাছে এই বলে আবদার করলেন : 'আল্লাহর রসুল, কামজ্বালা আর সহ্য না, একটা বিহিত করুন।' নবীজি দুটি শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ী বিয়ের অনুমতি দিলেন; শর্তদ্বয় হলো : (১) যে মেয়ের সাথে অস্থায়ী বিয়ে চুক্তি হবে তাকে একটা কিছু (মূল্য বা মোহরানা) দিতে হবে, তা যতই ন্যূনতমমানের হোক। (২) তিন রাতের বেশি ঐ মহিলাকে রাখা যাবে না। অস্থায়ী বিয়ের ওপর হাদিস শরিফে অনেক হাদিস রয়েছে, সেখান থেকে শুধুমাত্র দুটো হাদিস এখানে ইংরেজিতে দেওয়া হলো :

> Abdullah (b. Mas'ud) reported: "We were on an expedition with Allah's Messenger and we had no women with us. We said: Should we not have ourselves castrated? The Prophet forbade us to do so. He then granted us permission that we should contract temporary marriage for a stipulated period giving her a garment, and 'Abdullah then recited this verse: 'Those who believe do not make unlawful the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Allah does not like transgressors" (al-Qur'an, 5:87). (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩, বুক ৮, নম্বর ৩২৪৩)। বুঝা গেল শুধু মহানবী মুহাম্মদেরই নয় এতে মহান আল্লাহরও সম্মতি আছে।

[২] Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahi Bukhari Hadith*, translated in English by Dr Muhammad Muhsin Khan; the internet version can be read at: http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/bukhari/index.html

আরেকটি হাদিস দেখি :

> Sabra Juhanni reported: "Allah's Messenger permitted temporary marriage for us. So I and another person went out and saw a woman of Bana 'Amir, who was like a young long-necked she-camel. We presented ourselves to her (for contracting temporary marriage), whereupon she said: What dower would you give me? I said: My cloak. And my companion also said: My cloak. And the cloak of-my companion was superior to my cloak, but I was younger than he. So when she looked at the cloak of my companion she liked it, and when she cast a glance at me I looked more attractive to her. She then said: Well, you and your cloak are sufficient for me. I remained with her for three nights, and then Allah's Messenger said: He who has any such woman with whom he had contracted temporary marriage, he should let her off." (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩, বুক ৮, নম্বর ৩২৫২) । বাংলা হচ্ছে, হজরত সাবরা জোহানি (রাঃ) বলেন : "নবীজির অনুমতি পেয়ে আমি বনি সোলায়েম গোত্রের আমার এক বন্ধুকে নিয়ে মেয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি । আমরা বনু-আমির বংশের একজন সুন্দরী যুবতীর সম্মুখীন হলাম যার ছিল উষ্ট্রীর মতো লম্বা গলা । আমরা তাকে অস্থায়ী (Temporary) বিয়ের প্রস্তাব দিলাম । প্রস্তাবে মহিলাটি জানতে চাইলো তাকে দেবার মতো আমাদের কি আছে? আমরা বললাম, গায়ের চাদর ব্যতীত আমাদের কিছুই নেই । আমার বন্ধুর চাদরখানি আমার চাদরের চেয়ে অতীব সুন্দর ও মূল্যবান ছিল তথাপি মেয়েটি আমাকেই গ্রহণ করলো । আমি তিনদিন মহিলার সাথে থাকার পর নবীজি আদেশ দিলেন, অস্থায়ী বিয়ের যাদের সময় সীমা শেষ হয়ে গেছে তাদের মহিলাদিগকে ছেড়ে দেয়া হোক ।" (দ্রষ্টব্য : সহি মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩, বুক ৮, নম্বর ৩২৫২)[৩] ।

এই হাদিসটি নিয়ে দুটি কথা বলতে চাই । দুইজন সাহাবি যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্যে নারীর খোঁজে বেরিয়ে যান; আর অপরিচিত এক সুন্দরী যুবতীকে রাস্তায় পেয়ে দুইজনে একসাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তাও দুই-তিন দিনের জন্যে । যে মহিলা জেনেশুনে এক টুকরা চাদরের মূল্যে তিন রাতের বিছানা-সঙ্গিনী হয় তাকে 'বেশ্যা' ছাড়া আর কি বলা যায়? আর তিন রাত সাধ মিটিয়ে যে মহিলাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো সে অভাগিনীদের গর্ভে সাহাবিদের পবিত্র বীর্যে কি কোনো সাহাবি জন্ম নিয়েছিল? মডার্ন ইসলামিস্টগণ এই হাদিসের কী রকম ব্যাখ্যা দেন জানার আশা রইলো ।

আরবি ভাষায় এই ধরনের অস্থায়ী বিবাহকে মু'তা বলা হয় । হিন্দু ধর্মের এক প্রকার বিবাহের নাম 'নিয়োগ প্রথা' । এই দুই ধর্মের দুই প্রকার বিবাহের প্রকারভেদ ও কার্যকারিতা প্রায় অভিন্ন । পরবর্তীতে উভয় প্রথাই নিষিদ্ধ হয়ে যায় । যদিও 'মু'তা' বা অস্থায়ী বিবাহের সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী অনেক সাহাবি ছিলেন, তথাপি চতুর্থ খলিফা হজরত আলি ইবনে আবু তালিবের যুগে মু'তা প্রথা অবৈধ হয়ে যায় । আর 'নিয়োগ প্রথা' হিন্দু মুনি পরাশর নিষিদ্ধ করে দেন । মু'তা বিবাহ ইসলাম ধর্মে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করে । হজরত ইবনে আব্বাস, আব্দুল মালিক বিন রাবি, ইবনে আবু আমরাহ আল আনসারি, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ইয়াহিয়া বিন মালিক প্রমুখ সাহাবিগণ মু'তা প্রথার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের ও হজরত আলি ইবনে আবু তালিবের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে তা টিকে থাকতে পারেনি । এক পর্যায়ে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের, ইবনে আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন : "আল্লাহর কসম আরেকবার এ কাজটি যে করবে আমি তাকে পাথর মেরে হত্যা করবো ।" এ বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হজরত আলি বলেন, নবীজি খয়বরের যুদ্ধে অস্থায়ী বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন । 'নিয়োগ-প্রথা' বিষয়ে একটু পরে আলোচনা হবে, তার আগে আরেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যাক :

স্কন্ধপুরাণ নাগরখণ্ডের ৬১ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে :

অন্তর্বিষঃ ময়া-হোতা...বহির্ভাগে মনোরমাঃ ।
গুঞ্জাফল সমাকারা ঘোষিতঃ সর্বদৈবহি॥

অর্থাৎ নারী জাতি সর্বদাই গুঞ্জাফলের ন্যায় বাইরে মনোহর । নারীর অধরে পীযুষ আর হৃদয়ে হলাহল, এ জন্যই তাদের অধর (ঠোঁট) আস্বাদন এবং হৃদয়ে পীড়ন (প্রহার) করা কর্তব্য । নারীর শুধু হৃদয়ে পীড়ন করাই নয়, শারীরিক নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে, শতপথ ব্রাহ্মণের ৪/৪/২/১৩ নং শ্লোকে : "বজ্র বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর

[৩] Abu al-Hussain b. al-Hajjaj al-Qushairi Muslim, *Sahi Muslim Hadith*, translated in English by Abdul Hamid Siddiqui; the internet version can be read at : http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/muslim/index.html

কোনো অধিকার না থাকতে পারে"; বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য বলেন : "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।" (দ্রষ্টব্য : ৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। নারীকে প্রহার করার জন্য নবী মুহাম্মদ (দঃ) কোরান শরিফের সুরা নিসায় একটু ঘুরিয়ে বলেছেন : "ওয়াল্লা-তি তাখা-ফু-না নুশু-জাহুন্না ফাআ-জিহুন্না ওয়াহজুরু-হুন্না ফি আলমাদা-জিয়ি ওয়াদরিবুহুন।" বাংলা হচ্ছে, নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হয়, যদি নারী বিদ্রোহ করে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাও, তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমার বিছানায় আসতে নিষেধ করো, তাতেও যদি বশ না মানে, তাদেরকে প্রহার করো। (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৩৪)।

ইসলামে নারীকে পেটানোর আইডিয়াটা বোধকরি খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) আবিষ্কার। নারীর প্রতি হজরত ওমরের (রাঃ) চিরদিনের ক্রোধ লক্ষ্য করা যায় তার পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনায়। একবার হজরত হাফসাকে স্বীয় স্বামী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে বেয়াদবি করার কারণে হজরত ওমর হাফসাকে মেরেই ফেলতেন, যদি না নবীজি তাকে বারণ করতেন। আবার একটি হাদিসে হজরত ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণীত হয়েছে : "নবীজি নারীকে পেটাতে নিষেধ করেছেন বহুবার কিন্তু একদিন হজরত ওমর (রাঃ) যখন নবীজির কাছে এসে বললেন যে, দেশের স্ত্রীগণ স্বামীর অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে তখনই আল্লাহর রসুল নারী পেটানোর এই আয়াত নাজিল করেন। সাথে সাথে অনেক মহিলা নবীজির পরিবারকে ঘিরে প্রতিবাদ জানান। নবীজি তাদেরকে বলেন, প্রতিবাদী নারী আল্লাহর অপছন্দ!" (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৪১)[৪]। পরের হাদিসে হজরত ওমর (রাঃ) বলেন : "নবীজি বলেছেন, নারীকে পেটানোর কারণে পুরুষকে কোনোদিন জবাবদিহি করতে হবে না।" (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৪২)। কারণ আল্লাহ তো আগেই বলে রেখেছেন : "পুরুষ নারীর কর্তা ও রক্ষক। আল্লাহ একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। যেহেতু পুরুষ তার উপার্জনের কিছু অংশ নারীর জন্য খরচ করে তাই নারীকে পুরুষের বাধ্য থাকা উচিৎ। আর তারাই উত্তম নারী যারা তাদের সতীত্ব হেফাজত করে চলে।" (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৩৪)। কিন্তু দুঃখজনক হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই, মুহাম্মদের (দঃ) জীবনে দুইজন বিদ্রোহী রমণী তাঁকে জীবনের শেষপ্রান্তে অতিষ্ট করে তুলেছিলেন। তাদের একজন হজরত আবু বকর তনয়া বিবি আয়েশা, আরেকজন হজরত ওমরের দুলালী হজরত হাফসা। সে আরেক ইতিহাস।

মনুসংহিতাতে মনু ঘোষণা দেন (৯:৩) :

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোককে কুমারী জীবনে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে; স্ত্রীলোক (কখনও) স্বাধীনতার যোগ্য নয়। আবার একটু পরেই বলা হয়েছে (৯:৮৮) : "উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ/অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥" অর্থাৎ কুলে আচারে উৎকৃষ্ট, স্বজাতি ও স্বরূপী বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্য না হলেও তাকে যথা-বিধানে সম্প্রদান করিবে। 'সম্প্রদান' মানে কি? মানে হচ্ছে বস্তু বা মালের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার বদল। নারী প্রথমে তার পিতার মাল এবং বিয়ের পরে তার স্বামীর মাল। বিবাহিত নারীর ওপর তার স্বামীর আজীবন মালিকানা থাকে। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও সে তার মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে যায়। বাল্যবিবাহ বিধিসম্মত কিন্তু বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রমতে মহাপাপ।

নবী মুহাম্মদ নিজেই ছয় বছরের শিশু আয়েশাকে বিয়ে করে বাল্যবিবাহ জায়েজ করে গেছেন। 'সম্প্রদান' ব্যাপারে হজরত আয়েশার উক্তি : "আল্লাহর রাসুল যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন আমার বয়স ছয়। আমার নয় বছর বয়সে নবীজি আমাকে তাঁর ঘরে তোলে নেন। শাওয়াল মাসের একদিন আমি আমার সঙ্গীদের সাথে খেলছিলাম। আমার মা উম্মে রুমান যখন আমার কাছে এসে চিৎকার করে ডাক দেন, আমি তখনও দোলনায় দোলছিলাম। মা আমাকে হাতে ধরে ধরে নিয়ে যান, আমি তখন গুন গুন করে গান গেয়েছিলাম। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, মা আমাকে দিয়ে কি করতে চান। সকালে যখন আল্লাহর রসুল আসেন, মা আমাকে তাঁর হাতে 'সম্প্রদান' করেন।" (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১০, বুক ৮, নম্বর ৩৩০৯, ৩৩১০)।

হিন্দু ধর্মে নারীকে গুঞ্জাফল ও গাভীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, আর ইসলাম ধর্মে তুলনা করা হয়েছে সম্পদ (মাল) ও উটের সাথে। প্রথমে নবী মুহাম্মদ যে নারীকে 'সম্পদ' (মাল) হিসেবে গণ্য করতেন, হাদিস শরিফ থেকে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণীত :

[৪] Sulaiman Ibn al-Ash'as al-Sijistani, *Abu Dawud Hadith*, translated in English by Prof Ahmad Hasan; the internet version can be read at: http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/abudawud

> Allah's Messenger (may peace be upon him) set out on an expedition to Khaibar and we observed our morning prayer in early hours of the dawn. The Apostle of Allah (may peace be upon him) then mounted and so did Abu Talha ride, and I was seating myself behind Abu Talha. Allah's Apostle (may peace be upon him) moved in the narrow street of Khaibar (and we rode so close to each other in the street) that my knee touched the leg of Allah's Apostle (may peace be upon him). (A part of the) lower garment of Allah's Apostle (may peace be upon him) slipped from his leg and I could see the whiteness of the leg of Allah's Apostle (may peace be upon him). As he entered the habitation he called: Allah-o-Akbar (Allah is the Greatest). Khaibar is ruined. And when we get down in the valley of a people evil is the morning of the warned ones. He repeated it thrice. In the meanwhile the people went out for their work, and said: By Allah, Muhammad (has come). Abd al-'Aziz or some of our companions said: Muhammad and the army (have come). He said: We took it (the territory of Khaibar) by force, and there were gathered the prisoners of war. There came Dihya and he said: Messenger of Allah, bestow upon me a girl ont of the prisones. He said: Go and get any girl. He made a choice for Safiyya daughter of Huyayy (b. Akhtab). There came a person to Allah's Apostle (may peace be upon him) and said: Apostle of Allah, you have bestowed Safiyya bint Huyayy, the chief of Quraiza and al-Nadir, upon Dihya and she is worthy of you only. He said: Call him along with her. So he came along with her. When Allah's Apostle (may peace be upon him) saw her he said: Take any other woman from among the prisoners. He (the narrator) said: He (the Holy Prophet) then granted her emancipation and married her. Thabit said to him: Abu Hamza, how much dower did he (the Holy Prophet) give to her? He said: He granted her freedom and then married her. On the way Umm Sulaim embellished her and then sent her to him (the Holy Prophet) at night. Allah's Apostle (may peace be upon him) appeared as a bridegroom in the morning. He (the Holy Prophet) said: He who has anything (to eat) should bring that. Then the cloth was spread. A person came with cheese, another came with dates, and still another came with refined butter, and they prepared hais and that was the wedding feast of Allah's Messenger (may peace be upon him). (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১৪, বুক ৮, নম্বর ৩৩২৫) ।

উপরের এই হাদিস থেকে কিছু প্রশ্ন তোলা যায় । হাদিসের বর্ণনা থেকে দেখি গতরাত পর্যন্ত শাফিয়া ছিলেন একজন সম্মানিত গোত্রনেতার স্বাধীন-সুন্দরী কন্যা । তার ঘর ছিল, বাড়ি ছিল, মা-বাবা সবই ছিল । পরের রাতে সর্বস্ব লুট করে তাকে বন্দী করে 'গনিমতের মাল' হিসেবে নবীজির হেরেমে নিয়ে আসা হলো কেন? মুহাম্মদ (দঃ) তার সাহাবিকে বল্লেন : 'বন্দীশালা থেকে যাকে পছন্দ হয় নিয়ে যাও ।' পরে আরেকজনের বেছে নেয়া নারীকে (শাফিয়া) নিজের পছন্দ হওয়ায় বলেন, 'ওকে নয়, অন্য কাউকে নিয়ে যাও ।' এতো দেখি, নারী 'মানুষ' নয়, গরুর হাটে বেচাকেনার গাভীর মত ব্যবহারিক সম্পদ, 'উপভোগ্য মাল' ।

মনুর দৃষ্টিতে সরাসরিই নারী ছিল গাভীর মতো । মনু বলেন (৯:৫০) : "যেমন গবাদি গর্ভে উৎপন্ন বৎস গো-স্বামীর (গাভীর স্বামী) হয়, তেমন পর পুরুষে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না, ক্ষেত্রীরই হয় ।" পরবর্তী শ্লোকে বলেন : "তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ/কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্॥" যদি কোনো স্ত্রীর স্বামীভিন্ন ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বীজ বপন করে ঐ স্ত্রীর পতির অর্থ সৃষ্টি করে; যার বীজ সে ফল লাভ করে না । এর পরের শ্লোকে (৫২ নং) বলেন : "ফলন্ত্বনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাং তথা/প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্ যোনির্গরীয়সী॥" মানে হল, নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে এই স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষেত্রী (স্ত্রীর স্বামী) ও বীজী (সন্তানোৎপাদক) উভয়ের হবে বলে অভিসন্ধি না থাকলে উৎপাদিত সন্তান প্রত্যক্ষরূপে ক্ষেত্রীরই হবে, কারণ বীজ অপেক্ষা যোনিই প্রধান । উল্লেখ্য, 'নিয়োগ প্রথায়' স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহ ছাড়া দেবর অথবা অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করানো মনুসংহিতাসহ হিন্দু ধর্মের আরেক ধর্মগ্রন্থ মহাভারত অনুযায়ী বৈধ । মনুসংহিতায় বলা হয়েছে (৯:৫৯) : "দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রীয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া/প্রজেস্পিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥" অর্থাৎ সন্তানের অভাবে স্ত্রী পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবর অথবা অন্য যেকোনো সপিণ্ড হইতে অভিলাষিত সন্তান লাভ করিবে । আর কাশিরাম দাস কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারতের আদিপর্বে রয়েছে : "শান্তনু রাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান । ফলে তার মাতা মৎস্যগন্ধা (পরবর্তীকালে সত্যবতী) বংশরক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন । এমতাবস্থায় তিনি স্বপত্নী গঙ্গার পুত্র ভীষ্মদেবকে আহ্বান করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী যথাক্রমে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের প্রস্তাব করেন । ভীস্মদেব ইতিপূর্বে কোনো কারণে জীবনে বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন । তাই পুত্রোৎপাদনে ভীষ্মদেব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন । অনন্যোপায় হয়ে সত্যবতী অবিবাহিত অবস্থায় পরাশর মুণির ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (আরেক নাম বেদব্যাস) নামে যে তার (জারজ?)

সন্তান হয়েছিল তাকে আহ্বান করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মায়ের আদেশ পালনার্থে তাতে সম্মতি জানান এবং তার দুই ভ্রাতৃবধু ও তাদের দাসীর গর্ভে একটি একটি করে মোট তিনটি পুত্রের অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম দান করেন।[⊥]

অন্যত্র মনু ভ্রাতৃবধূকে দেবরের মা এবং দেবরকে ভ্রাতৃবধূর ছেলে হিসেবে সম্মান দেখাতে বলেছেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর কিংবা ভাইয়ের সন্তান না থাকলে ভাতৃবধুর সাথে পুত্রোৎপাদনের জন্য সঙ্গম করার কথাও বলা হয়েছে! (৯:৫৯)। মনুর ভাষ্যানুযায়ী তাহলে তো পরোক্ষভাবে মায়ের সাথেই সঙ্গম করা! আর এ কাজটি চলতে থাকবে, পুত্রোৎপাদনে যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত। মনু বলছেন (৯:৫৭):

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু ভার্য্যা যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার স্ত্রী হলো, কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী অর্থাৎ মাতৃতুল্য এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূতুল্য। এবার পুত্রোৎপাদনের জন্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গম হবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য বিধবার সঙ্গে আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গম হবে পুত্রবধূতুল্য কনিষ্ঠ ভ্রতার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। বিষয়টি উল্টোভাবেও করা যায় যেমন, একজন সন্তানহীন বিধবা পুত্রোৎপাদনের জন্যে তার পুত্রতুল্য দেবরের সাথে এবং একজন সন্তানহীন বিধবা পিতৃতুল্য তার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাথে সঙ্গমের প্রস্তাব করতে পারবেন। এ বিশেষ সঙ্গমটি কিভাবে হবে তাও ভগবান মনু বলে দিয়েছেন (৯:৬০) : "বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি/একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন।" অর্থাৎ বিধবাতে নিযুক্ত হইয়া ঘৃতাক্ত-শরীরে, মৌনতা অবলম্বন করতঃ, রাত্রিবেলা, একটিমাত্র পুত্রোৎপাদন করিবে। কদাচ দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদন করিবে না। গভীর অন্ধকারে পুত্রোৎপাদন করার জন্যে নিশিথ রাতের অর্থ বুঝা গেল কিন্তু নারীকে মৌনতা অবলম্বন আর তার শরীরকে ঘৃতাক্ত করার মানেটা কি? মানে হতে পারে, নিঃসংকোচে যৌনকার্য চালিয়ে নিখুত সন্তান লাভ করা। তাইতো মহাভারতে আমরা দেখতে পাই[৫] : বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্যে যখন মহাপুরুষ বেদব্যাসকে নিয়োগ করা হয় তখন অম্বিকা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেছিল এবং অম্বালিকার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্থ হয়েছিল। ফলে অম্বিকার গর্ভে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত পাণ্ডুর জন্ম হয়। নবজাত পুত্রদ্বয়ের এই অবস্থা দেখে সত্যবতী খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি পুত্র বেদব্যাসকে অম্বিকা অথবা অম্বালিকার গর্ভে গন্ধর্বের মতো সুন্দর পুত্রোৎপাদনের জন্যে অনুরুধ করেন। কিন্তু অম্বিকা ও অম্বালিকা উভয়েই তাতে অসম্মতি জানান এবং উভয়ে পরামর্শক্রমে নিজেদের জনৈক শূদ্রাণীকে (দাসী) ভ্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা করতঃ অম্বিকার বিছানায় শয়ন করান। যেহেতু বেদব্যাসের সাথে সঙ্গমের সময় এই দাসীর মনে কোনো দ্বিধাসংকোচ বা ভয় ছিল না অতএব তার গর্ভে এক সুন্দর পুত্রের জন্ম হয়। যার নাম রাখা হয় 'বিদুর'। এখানে রাতের পর রাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ার পরেও সে হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'পুত্রবধূ', আর ওদিকে মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ তার পালক পুত্র জায়েদ জীবিত থাকাকালেই কথিত 'আল্লাহর অনুমতি' নিয়ে এসে পুত্রবধূ জয়নাবকে বিয়ে করে তার সাথে আজীবন রতিক্রিয়া করেন।[*] (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৭ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য নবী মুহাম্মদের পরে তাঁর কোনো উম্মত অদ্যাবধি এই ধরনের কাজ করেছেন বলে কখনো জানা যায়নি।

সুহৃদয় ভগবান মনু বিধবা নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো স্বামীর মৃত্যুকালে যদি তার (নারীর) যোনি অক্ষত থাকে! (৯:১৭৬)। কীভাবে সম্ভব? সম্ভব এভাবেই যদি ঐ নারীর কোনো নপুংসক পুরুষের সাথে বিয়ে হয়, অথবা বাগ্‌দত্তা কন্যার পতি মৃত হয়, কিংবা বিয়ের সাথে-সাথেই স্বামী মারা যায়, বা মৃত ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়! কিন্তু হায়, বিধি বাম। বিধবাদের এই সুখটুকুও পরাশর মুনির সইলো না। নিয়োগ প্রথা বা দেবরাদির দ্বারা সন্তানোৎপাদনের কাজ যতই ঘৃণ্য, অশ্লীল এবং ন্যাক্যারজনক হোক না কেন, তা চালু থাকায় হতভাগিনী বিধবাদের স্বাভাবিক শারীরিকচাহিদা নিবারণের কাজ চলে যাচ্ছিল।

[⊥] হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা-অজাচার-ব্যভিচার অথবা হিন্দু দেবতাদের সরস যৌনজীবন সম্পর্কে জানতে পাঠ করুন : (ক) মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ, *হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেব লীলা*, ঢাকা। (খ) আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, *শেষ নিবেদন*, ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা।

[৫] সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ ১৪০৮, পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪১।

[*] নবীজির যৌনজীবন এবং ইসলামে কাম ও কামকেলি সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা আন্তর্জালে দেখুন : আবুল কাশেম, *ইসলামে কাম ও কামকেলি*, http://www.mukto-mona.com/Articles/kasem/index.htm

কিন্তু মহামুনি পরাশর সেটাও সহ্য করতে পারলেন না, তিনি তাঁর আইনে (পরাশর সংহিতা) ঘোষণা দিলেন, অশ্বমেধ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস অবলম্বন, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন এই পাঁচটি কলিকালে বর্জন করতে হবে!

মহানবী মুহাম্মদ বলেন : "আদ্দুনিয়া কুল্লুহুল মাতা ওয়া খাইরু মাতা-ইদ্দুনিয়া আল-মারআ-তুসসালিহা ।" বাংলা হচ্ছে, হে পৃথিবীর মানব জাতি, এই সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ; আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ (মাল) তোমাদের আমলদার সতী নারী । (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩৭, বুক ৮, নম্বর ৩৪৬৫) । উল্লেখ্য আরবি এই 'মাতা' শব্দটি বলতে সম্পত্তি, সম্পদ, সামগ্রী, বস্তু বা দখলকৃত বা ক্রয়কৃত মাল বা ধন বোঝায়; 'মাতা' শব্দটি কোনো অবস্থাতেই, কোনো অর্থেই 'মানুষ' হয় না, হতে পারে না । আধুনিক যুগের তথাকথিত শিক্ষিত-ধুরন্ধর মুসলিমগণ সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য 'মাতা' শব্দের ইসলামি পরিভাষা আবিষ্কার করেছেন 'অমূল্য সম্পদ' । 'সতী নারী' বলতে কি বোঝায় আর নারীর সতীত্বই বা কিভাবে পরীক্ষা করা হয়? সতী নারীর প্রতি সকল ধর্মেরই প্রবল আগ্রহ লক্ষণীয় । ধর্মের দৃষ্টিতে সতী মানে সৎ চরিত্রের অধিকারী নয়; সতী বলতে অক্ষত যোনি বা যে নারীকে পূর্বে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি বোঝায় । বিবেককে ধোঁকা দিয়ে অনেক মুসলমান বলেন কোরানের বহু শব্দই না-কী রূপক অর্থে ব্যবহৃত । মানুষের কাছে 'যুক্তিহীন অগ্রহণযোগ্য কথা', গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই মূলত ইসলামি পরিভাষা, রূপক, ভাবার্থক এসব বলা হয় । কোরান যদি হয় আল্লাহর বাণী, হাদিস যদি হয় আল্লাহর অনুমোদিত কথা, তবে ভাষা কেন হবে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য? মা তার সন্তানকে বলতে পারেন, 'আমার সোনা-মণি, আমার মানিক-ধন ।' মায়ের ভালবাসায় কোনো শর্ত নেই, কোনো বিনিময় মূল্য নেই; অথচ আমাদের দয়াল নবী মুহাম্মদের কাছে নারী নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয় আর তা শ্রেষ্ঠ হয় 'সতী' শর্ত সাপেক্ষে । হাদিসে নবীজি বলেন : (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস হতে বর্ণিত) "আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাসী তোমাদের যারা দাসী খরিদ করে বিবাহ করতে চায়, তারা যেন এই বলে দোয়া করে, 'হে প্রভু এই মহিলাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রেখো, সে যেন আমার জন্য উপকারী হয়, তার মধ্যে যেন ভাল গুণ থাকে ।' আর এই দোয়া পড়বে তোমরা যখন উট খরিদ করবে ।" (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৫৫) । আমাদের বাংলাদেশের কোনো পয়গম্বর হলে হয়তো বলতেন, 'এই দোয়া পড়বে তোমরা যখন গাভী খরিদ করবে ।'

নারীকে ভোগের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য পরিষ্কার, 'পুরুষ যখন যেভাবে চাইবে নারীকে ভোগ করবে ।' সঙ্গমাসন কেমন হবে তাও নির্ধারণ করবে পুরুষ, এখানে নারীর পছন্দ অমার্জনীয় পাপ । পুরুষের লিঙ্গ জীবন্ত-সক্রিয় আর নারীর যোনি প্রাণহীন আবাদভূমি । চাষী তার জমিতে চাষ করবে তার ইচ্ছেমত যখন-তখন । নারীর যোনি যে পুরুষের চাষক্ষেত্র, এ ব্যাপারে ভগবান মনুর সাথে নবীজি মুহাম্মদের মতের মিল আছে, কোরানে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । আল্লাহ বলছেন, "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের শষ্যক্ষেত্র । তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো ।" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ২২৩) । এই আয়াতের পটভূমি সম্পর্কে জানা যায় একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন সদ্য বিবাহিত আনসারিদের এক মহিলা । মোহাজিরিনগণ যখন মদিনায় আসেন তন্মধ্যে একজন মোহাজির এক আনসারি (মদিনাবাসী মুসলিম) মহিলাকে বিয়ে করেন । ঐ মহিলা পূর্বে ইহুদিদের সাথে বসবাস করতেন বিধায় ইহুদিদের সঙ্গম পদ্ধতি অনুসরণ করতেন । কোরায়েশ বংশীয় স্বামী যখন তার সাথে তার পেছন দিক থেকে সঙ্গম করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন মহিলাটি এই বলে প্রতিবাদ করলো : "আমি উপুড় হয়ে শুইতে যাবো না, তোমার পছন্দ না হয় বিছানা ত্যাগ করতে পারো ।" সমস্যাটার সংবাদ আল্লাহর রসুলের কান পর্যন্ত পৌঁছিল । নবীজি কোরানের বাণী দিয়ে সমস্যার আশু সমাধান করে দিলেন । আর স্ত্রীগণকে আদেশ দিলেন তোমরা সব সময় প্রস্তুত থেকো, কোনো অবস্থাতেই স্বামীগণ যেন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে না যায় । কারণ হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : আল্লাহর রসুল বলেছেন, যখন একজন স্বামী সঙ্গম করার জন্য তার স্ত্রীকে আহ্বান করেন, তখন সে স্ত্রী যদি বিছানায় না এসে অন্যত্র রাত কাটায় ফেরেস্তারা ঐ নারীকে সমস্ত রজনী অভিশাপ দিতে থাকেন । (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ২০, বুক ৮, নম্বর ৩৩৬৬) । কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) ঋতুস্রাবকালে সহবাস নিষিদ্ধ করেছেন । (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ২২২) । তবে বলেছেন : "কেউ যদি ঐ সময় তা থেকে বিরত না থাকতে পারে, তাহলে সে যেন এক মুঠো খেজুর দান করে অথবা একজন ভিক্ষুক খাওয়ায় ।" (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৬৪) । ভিক্ষুক খাওয়ানো অথবা এক মুঠো খেজুর দান করার মধ্যে বেচারী স্ত্রীর লাভ-ক্ষতি মোটেই বুঝা গেলো না । এদিকে মিশকাত শরিফে পাই, রজঃস্বলা স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষ সঙ্গম করলে, তাকে এই কাজের জন্য এক দিরহাম সদকা দিতে হবে । রক্তের রঙ কিছুটা হলদে হলে সদকার পরিমাণ হবে অর্ধদিনার আর সম্পূর্ণ লাল হলে এক দিনার! (দ্রষ্টব্য : মিশকাত শরিফ, ৫৫৩-৫৫৪) ।

যাহোক, এতোক্ষণ গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করে আমরা 'নারী' বিষয়ে এই শিক্ষা পেলাম যে, নারী পুরুষের উপভোগ্য 'সম্পদ' বই কিছু নয় (মুহাম্মদ) এবং নারীগণ কেবলই মিথ্যা পদার্থ (মনু) ।

তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

তৃতীয় অধ্যায়

বিবি আয়েশা এবং প্রফেট মুহাম্মদ

কোরায়েশ বংশের বনি তায়িম গোত্রে ইসলাম ধর্মের প্রফেটের অন্যতম সাহাবি এবং প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের (রাঃ) জন্ম। তাঁর স্ত্রী কুতাইলা যখন কোনো অবস্থাতেই নিজের পিতৃপুরুষের 'পৌত্তলিক ধর্ম' ত্যাগ করে হযরত মুহাম্মদের প্রচারিত নতুন ধর্ম 'ইসলাম' গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, আবু বকর তাকে তালাক দিয়ে দেন। হজরত আবুবকরের (রাঃ) আরেক স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে হজরত আয়েশা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। প্রফেটের জীবনীকারকদের মধ্যে প্রফেট মুহাম্মদের (দঃ) পত্নীসংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতদ্বৈধতা আছে; সাধারণ হিসেবে আমাদের দয়াল নবীর এগারো জন পত্নী, দুজন উপপত্নীসহ তেরোজন সঙ্গিনী, আবার কোনো কোনো হাদিস মতে তাঁর বাইশ জন স্ত্রী ছিলেন[১], তবে এই বাইশজন পত্নীর মধ্যে কয়েকটি বিয়ে পরে অকার্যকর হয়ে যায় কারণ এই বিয়েগুলির শর্ত না-কী পূরণ করা হয়নি, কাউকে নবী মুহাম্মদ ইচ্ছাকৃত কারণেই ত্যাগ করেন (৬৩০ সালে কিন্দা গোত্রের মেয়ে আসমা বিনতে নুমানকে বিয়ের পরপরই নবীজি কোনো এক কারণে ফেরত পাঠিয়ে দেন), আবার কাউকে তালাক দেওয়া হয় (একই সালে কিলাব জাতির ওয়াহিদ গোত্রের এয়াজিদের মেয়ে আমরার সাথে বিয়ে হলেও প্রফেট তাকে তালাক প্রদান করেন)। তবে দুজন উপপত্নীসহ এগারো জন পত্নীর নাম 'Muhammad Encylopaedia' থেকে জানা যায় : খাদিজা (৪০), সওদা (৫০), আয়েশা (৬), হাফসা (১৮/২২), জয়নাব বিনতে খোজাইমা (৩০), উম্মে সালমা বা হিন্দ (২৯), জয়নাব বিনতে জাহাশ (৩৫), জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (২০), উম্মে হাবিবা বা রামালা বিনতে আবু সুফিয়ান (৩৫), রায়হানা (৩০), সাফিয়া (১৭), ময়মুনা (৩৬) ও মারিয়া কিবতিয়া (১৮)।[২] এখানে নবী মুহাম্মদের স্ত্রীদের নামের পাশে উল্লেখ করা 'সংখ্যা' দ্বারা নবীর সাথে তাঁদের বিয়ের সময়ের বয়সকে বোঝানো হয়েছে। আমরা 'বোকার স্বর্গ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি, ইরানি স্কলার আলি দস্তি তাঁর 'Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad' গ্রন্থে বলেছেন প্রফেটের জীবনে ২২ জন রমণী এসেছেন বলে জানা যায়, এদের মধ্যে ১৬ জন বিবাহের মাধ্যমে, ২ জন দাসী এবং ৪ জনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। যাহোক, আমাদের 'উম্মুল মোমেনিন' বিবি আয়েশা যেমন ছিলেন সুন্দরী তেমনি মেধাবী। মুহাম্মদের কাছে আয়েশা ছিলেন তাঁর সকল স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। মুহাম্মদের (দঃ) পরামর্শ অনুযায়ী আবু বকর যখন প্রথম প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন, কোরায়েশগণ তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনে; প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ নিয়ে তিনি তাঁর ছোট মেয়ে আয়েশার নিরাপত্তার জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কোরায়েশদের অসহযোগিতা, রক্তচক্ষু, গালমন্দে অতিষ্ট আবু বকর দেশ (মক্কা) ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। কিন্তু দূর দেশে ছোট মেয়ে আয়েশাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না। হযরত আবু বকর দম্পতির স্বপ্ন ছিল আয়েশা বড় হলে জুবায়ের বিন মোতাম নামের ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেবেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে আবু বকর (রাঃ) আয়েশার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জুবায়েরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান। কিন্তু জুবায়ের বিন মোতাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ মানে মুসলমান হতে রাজি হলেন না; তাই প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভগ্নহৃদয়ে আবু বকর (রাঃ) আয়েশাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ইয়েমেন ও পরে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যান। কিছুদিন পরেই আবার স্বপরিবারে মক্কায় ফিরে আসেন। একই বৎসর (৬১৯ খ্রিস্টাব্দে) মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। খাদিজার মৃত্যুর পরপরই মুহাম্মদ (দঃ) ৫০ বছর বয়সের সওদাকে (রাঃ) বিয়ে করেন। বয়স্ক এই মহিলা মুহাম্মদের (দঃ) চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিলেন না। খাওলা নামক হযরত মুহাম্মদের এক বান্ধবী তাঁকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দেন। মুহাম্মদ (দঃ) বললেন :

- খাওলা, তোমার জানামতে কোনো মেয়ে আছে না কি?
- হ্যাঁ আছে। একজন বিবাহিতা ৩০ বৎসর বয়স্ক বিধবা, অন্যজন অবিবাহিতা কুমারী।
- কুমারীর নামটা জানতে পারি?
- ৬ বৎসরের কন্যা আয়েশা বিনতে আবু বকর।

মুহাম্মদ (দঃ) জানতেন আবু বকর (রাঃ) আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে জুবায়েরের কাছে গিয়েছিলেন। তাই এবার তিনি নিজেই যখন আয়েশাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে আবু বকরের সামনে হাজির হলেন, আবু বকর (রাঃ) আয়েশার অপ্রাপ্ত বয়সের অজুহাত দেখাতে পারলেন না, বললেন : "মুহাম্মদ (দঃ) আয়েশা যে তোমার ভাতিজী হয়, তাকে বিয়ে করবে কিভাবে?" মুহাম্মদ (দঃ) জবাব দিলেন : "পারিবারিকসূত্রে আয়েশা আমার ভাতিজী হয় সত্য, কিন্তু ধর্মীয় সূত্রে সে আমার বোন।" যদিও পরবর্তীতে পারিবারিক সূত্রের

[১] Thomas Patrick Hughes, *A Dictionary of Islam*, W.H. Allen & CO Publications, London, 1895, Page 399-400.

[২] *Muhammad Encylopaedia*, Seerah Foundation, London, Vol-II, page 206.

অজুহাতে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর ভাতিজীর (হামজার মেয়ে) বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। বিষয়টি হচ্ছে এরকম : হামজা (রাঃ) ও আবু বকর ছিলেন পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মুহাম্মদের (দঃ) নবম স্ত্রী রামালা (আবু সফিয়ানের মেয়ে, অন্য নাম উম্মে হাবিবা) বলেছেন : "আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন। নবীজি বললেন, তোমার কি তা ভাল লাগে? আমি বললাম হ্যাঁ, কেন লাগবে না, এ ঘরে তো শুধু আমি একা আপনার স্ত্রী নই, আরও অনেকেই আছেন; সুতরাং আমি চাই আমার বোনও আমার সাথে সংসার-সুখ ভোগ করুক। রসুল বললেন, তা তো আমার জন্যে বৈধ হবে না। আমি বললাম, শুনেছি আপনি নাকি উম্মে সালমার (প্রফেটের ষষ্ঠ স্ত্রী) মেয়েকে বিয়ে করতে চান। নবীজি বললেন, সে যদি আমার সৎ মেয়ে (Step-daughter) নাও হতো, সে আমার জন্যে বৈধ হতো না; কারণ যেহেতু সে আমার পালিত ভাতিজী (foster niece)। সুতরাং আমাকে তুমি তোমার মেয়ে কিংবা বোনকে বিয়ে করতে অনুরোধ করো না।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৪২)[৩]।

যাহোক, বয়সে মুহাম্মদের (দঃ) চেয়ে দুই বছরের ছোট আবু বকরের তো মনে আর বোঝে না। পঞ্চাশোর্ধ মানুষের সাথে ছয় বছরের মেয়ের বিয়ে দিবেন কিভাবে? লোকে কি বলবে? এদিকে তিনি নবীর কথাও ফেলতে পারবেন না। বেশ সমস্যায় পড়লেন। এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন স্বয়ং মুহাম্মদ। তিনি আল্লাহর 'ওহি' নিয়ে আসলেন। সেই ওহির বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন :

> "আল্লাহর নবী একবার আমাকে বলেছিলেন, বিয়ের আগে আল্লাহতায়ালা স্বপ্নে দুবার তোমাকে দেখিয়েছিলেন। আমি দেখলাম বেহেস্তের সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢেকে একজন ফেরেস্তা তোমাকে কোলে নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত। আমি বললাম, কাপড় উঠাও। অমনি দেখি জিব্রাইলের কোলে জীবন্ত তুমি বসে আছো। আমি মনে মনে বললাম এই যদি হয় আল্লাহর ইচ্ছে, তাহলে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৮৭, নম্বর ১৪০)।

যে আবু বকর না-কী চাঁদের দিকে না তাকিয়েই বলতে পারেন প্রফেট মুহাম্মদ আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা না করেই সাক্ষী দিতে পারেন মুহম্মদ স্বশরীরে সপ্ত-আকাশ ভ্রমণ করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন! তাই এবার নবীজির মুখে স্বপ্নের কাহিনী শুনে নবীর কাছে আয়েশাকে বিয়ে দিতে রাজি না হয়ে পারলেন না। তবে শর্ত হলো 'কন্যাদান' হবে তিন বছর পর। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আয়েশা ও তার বড় বোন আসমাকে মক্কায় রেখে আবু বকর নবী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে যান (ইসলামের ইতিহাসে যাকে 'হিজরত' বলা হয়েছে)। এর কিছুদিন পর আসমাও তার ছোট বোন আয়েশাকে নিয়ে মদিনায় চলে যান। ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) আনুষ্ঠানিকভাবে নববধূ হযরত আয়েশাকে ঘরে তোলে নেন। মুহাম্মদের (দঃ) বয়স তখন ৫২ বছর, আর নববধূ আয়েশা ৯ বৎসরের বালিকা। হাতে বিয়ের আঙটি নয়, খেলার পুতুল নিয়েই বাসর ঘরে ঢুকলেন দোলনার বালিকা আয়েশা। পাশে রাখা দুধের গ্লাস থেকে হযরত মুহাম্মদ এক চুমুক দুধ পান করে আয়েশাকে দিলেন। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সাথে-সাথে পুতুল খেলার সাথীগণ তাঁর সাথে খেলতে আসবে, সেই আশায় রাত প্রভাতের পানে চেয়ে-চেয়ে ক্লান্ত আয়েশা এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন।

জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি আয়েশা (রাঃ) পরবর্তীতে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> "আল্লাহর নবী আমাকে ৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন। আমরা (আসমা ও আয়েশা) মদিনায় যাওয়ার পর হারিস বিন খাজরাজের ঘরে আশ্রয় নেই। সেখানে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং আমার মাথার চুল পড়ে যায়। কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে যখন আমার সঙ্গীদের নিয়ে দোলনায় খেলছিলাম, আমার মা এসে আমাকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি বুঝতেই পারিনি কেন আমাকে ডেকে নেয়া হচ্ছে। আমার তখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মা আমাকে কিছুক্ষণ দরজার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। আমার মাথা ও মুখমণ্ডল জল দিয়ে মুছে দেয়ার পর যখন কিছুটা শান্তবোধ করলাম, মা আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে দেখি মদিনার বেশ কয়েকজন মহিলা বসে আছেন। তারা আমাকে দেখে সমস্বরে বলে উঠলেন, শুভেচ্ছা! আয়েশা তোমার ওপর আল্লাহর রহমত ও মঙ্গল হউক। মা আমাকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন আর তারা আমাকে বিয়ের সাজে সাজালেন। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ দেখি আল্লাহর নবী এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন আর মা

[৩] Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahi Bukhari Hadith*, translated in English by Dr Muhammad Muhsin Khan; the internet version can be read at: http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/bukhari/index.html

আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৮, নম্বর ২৩৪ এবং মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১০, বুক ৮, নম্বর ৩৩০৯)[৪] ।

দোলনার বালিকা আয়েশা বুঝতেই পারলেন না যে, তিনি আর বালিকা নন বরং পরিপূর্ণ বয়সী এক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী। বিয়ের পরেও সাথীদের সঙ্গে পুতুল নিয়ে খেলতে গিয়ে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যেতেন। আয়েশা বলছেন, আমি যখন আমার বান্ধবীদের সাথে পুতুল নিয়ে খেলতাম, মাঝেমাঝে আল্লাহর নবী তা দেখে ফেলতেন। নবীজিকে দেখে আমার বান্ধবীরা লুকিয়ে যেতো কিন্তু নবী তাদেরকে ডেকে এনে বলতেন, তোমরা আয়েশার সাথে খেলতে থাকো। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৭৩, নম্বর ১৫১)।

সা-বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মুসলমান নর-নারীর জন্যে পুতুল অথবা এই ধরনের কোনো নিষ্প্রাণ বস্তু নিয়ে খেলা ইসলামে নিষিদ্ধ; কিন্তু আয়েশার বেলা তা প্রযোজ্য ছিল না, কারণ আয়েশা তখন না-বালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী 'ফাতেহ আল-বারি'তে লিখেছেন[৫] : "The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for A'isha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty." আয়েশা তাঁর ছোটকালের বর্ণনায় আরও বলেন : "মসজিদের পাশে যখন কয়েকজন ইথোপিয়ানদের খেলা আমি উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ নবী এসে তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে দেন। তথাপি খেলা দেখার তৃপ্তি মেটার আগ পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুতরাং এ থেকে তোমরা বুঝে নিও, ছোট্ট না-বালেগ মেয়ে (Who has not reached the age of puberty), খেলাধুলার প্রতি যার এমন আগ্রহ, তাকে সেভাবেই দেখা উচিৎ।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১৬৩)।

পুতুল খেলায় মগ্ন আয়েশা লক্ষ্যই করেননি যে, স্বামী তাঁর অজান্তে তাঁকে নিয়ে কতো খেলা খেলছেন। আয়েশার মতো একজন বালিকা-বধূ যার সাংসারিক অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা, 'রান্নাবাটি' খেলার বয়সই পার হয়নি তার সাথে 'খেলার' কী আনন্দ, রসুলের (দঃ) হাদিস শরিফেই তা বর্ণীত আছে। হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর (রাঃ) ভাষায় : "এক অভিযানে আমরা আল্লাহর রসুলের (দঃ) সঙ্গে ছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার পথে যখন মদিনার নিকটবর্তী হলাম, আমার অলস উটটাকে আর কোনো মতেই চালাতে পারি না। একজন লোক এসে আমার উটের পশ্চাতে একটি খোঁচা দিলো, অমনি সে তড়িৎ বেগে ছুটে চললো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ (দঃ)। নবীজি আমায় দেখে জিজ্ঞেস করেন, জাবির এতো তাড়া কিসের? আমি বললাম, আল্লাহর রসুল (দঃ), ঘরে আমার নতুন বৌ রেখে এসেছি। রসুল (দঃ) জিজ্ঞেস করেন, তুমি বিয়ে করেছো? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী, না বিবাহিতা? আমি বললাম, জ্বী না, কুমারী নয়। তিনি বললেন, 'অল্প বয়সের কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তো তুমি তার সাথে খেলতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে খেলতো।' যখন আমরা উটে চড়ে মদিনায় প্রবেশ করবো, রসুল (দঃ) বললেন, সন্ধ্যা-রাতে ঘরে ঢুকার পূর্বে একটু থামো, যাতে মহিলা, যার মাথার চুল অগোছালো সে তা চিরুনি দিয়ে গোছিয়ে নিতে পারে, আর যে মহিলার স্বামী কিছুদিন দূরে ছিল সে মহিলা তার গোপনাঙ্গের লোম কামিয়ে নিতে পারে।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১৭৪)।

রূপ-লাবণ্যে অতুলনীয় আয়েশাকে পেয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যারপর নাই খুশি হলেন আর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ৫৫ বছর বয়স্ক সওদার মনে জ্বলে উঠলো হিংসার আগুন। সওদা লক্ষ্য করলেন, তাঁর স্বামী প্রফেট মুহাম্মদ আয়শার সাথে বিয়ের পর থেকেই তাঁকে উপেক্ষা করছেন আর আয়েশার প্রতি অতিরিক্ত মনযোগী হয়ে গেছেন। তিনি রাত ভাগাভাগিতে আয়েশার সাথে সমান অধিকার দাবি করে বসলেন। সওদা জানতেন না যে ইসলামে কুমারী নারী আর বিবাহিত নারীর মর্যাদা সমান নয়। এ নিয়ে সওদা বেশ বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয়ায় দয়াল নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁকে (সওদাকে) তালাক দেয়ার হুমকি দিয়ে দিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে সবকিছু হারিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব অভাগিনী সওদা শেষ বয়সে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলেন, তাও আজ হারিয়ে যাবে। একদিন পথের ধারে নবীজিকে পেয়ে তার পবিত্র চরণ-যুগল আঁকড়ে ধরে করজোড়ে নিবেদন করেন, "আল্লাহর রসুল (দঃ) প্রেমভিক্ষে চাই না আমি, একটু প্রাণভিক্ষে দাও। শূন্যবিছানা জড়িয়ে ধরে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু তালাকের অপমান আর সইতে পারবো না। আমার বিছানায় আপনাকে আসার অনুরোধ আর কোনোদিন করবো না। আমার সকল আশা, সকল রাত আমি আয়েশাকে দিয়ে দিলাম।" নবীর মনে দয়ার উদ্রেক হলো, সওদাকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন।

পরবর্তীতে আয়েশার প্রতি হিংসাপরায়ণ অন্যান্য স্ত্রীগণ মিলে 'রাত ভাগাভাগি' নিয়ে যখন একই দাবি করে বসলেন, তখন রসুল মুহাম্মদ কোরানের আয়াত নিয়ে আসলেন :

[৪] Abu al-Hussain b. al-Hajjaj al-Qushairi Muslim, *Sahi Muslim Hadith*, translated in English by Abdul Hamid Siddiqui; the internet version can be read at : http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/muslim/index.html

[৫] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Vol 13, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, Page 143.

> "You (O Muhammad SAW) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will. And whomever you disire of those whom you have set aside (her turn temporarily), it is no sin on you (to receive her again), that is better' that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts. And Allah is Ever All-Konwing Most Forbearing."[৬] অর্থাৎ "তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার ও যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার, আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোনো দোষ নেই। এ-বিধান এ জন্য যে, এতে ওদেরকে খুশি করা সহজ হবে আর ওরা দুঃখ পাবে না, এবং ওদেরকে তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই খুশি থাকবে। তোমারে অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ সব জানেন, সহ্য করেন।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৫১)।

ধীরে ধীরে আয়েশা কৈশোরে উত্তীর্ণ হলেন। আয়েশার কুঞ্জবনের অপ্রস্ফুটিত মুকুল, অকালে দলিত-মথিত হয়ে যখন প্রস্ফুটিত হলেন, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তখন ভিন্ন কাননে মধু আহরণের সন্ধানে। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবি ও শ্বশুর আবু বকরের কাছে মনের গোপন বাসনা ব্যক্ত করলেন। আবু বকর (রাঃ) সংবাদটা মুহাম্মদের (দঃ) জামাতা হজরত উসমানকে (রাঃ) জানালেন। মুহাম্মদ (দঃ) এবার হজরত ওমরের (রাঃ) বিধবা কন্যা ২০ বৎসরের হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করবেন। ওমর (রাঃ) তা জানতেন না। হাদিসে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ঘটনাটি বর্ণনা করছেন এভাবে, "ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমার মেয়ে হাফসার স্বামী খুনাইজ বিন্ হুদাফা আস-শামীর মৃত্যুর পর যখন আমি হাফসাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে উসমান বিন আফ্ফানের কাছে নিয়ে গেলাম, উসমান বললেন, ভেবে দেখবো। কিছুদিন পর যখন তার সাথে আবার দেখা হলো তিনি বললেন, আমার মনে হয় আপাতত হাফসাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আমি হাফসাকে বিয়ে করার জন্যে আবু বকরকে অনুরোধ করলাম। আবু বকর আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। উসমানের চেয়ে আবুবকরের প্রতি আমার ভীষণ রাগ হলো। এর কিছুদিন পর, আল্লাহর রসুল এসে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলেন। রসুলের সাথে হাফসার বিয়ের পর একদিন আবুবকরের সাথে আবার দেখা হয়। আবু বকর বললেন ওমর, তুমি বোধ হয় তোমার মেয়ে হাফসাকে বিয়ে না করায় আমার উপর রাগ করেছো। আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আবু বকর বললেন, সমস্যা আসলে কিছুই ছিল না, শুধু আমি জানতাম যে আল্লাহর রসুল হাফসাকে বিয়ে করতে চান আর আমি তো রসুলের গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না, তবে রসুল (দঃ) যদি তাঁর মত পরিবর্তন করতেন, আমি নিশ্চয়ই হাফসাকে বিয়ে করতাম।"(দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৫৫)।

হজরত ওমর (রাঃ) জানতেন আয়েশা এখন আর ৯ বছরের অবোধ ছোট্ট বালিকাটি নয়। মুহাম্মদের (দঃ) মাত্রাতিরিক্ত সোহাগ, প্রেম আয়েশাকে বানিয়েছে মারাত্মক অহংকারী। রূপের গরবিনী আয়েশার ব্যাপারে হজরত ওমর (রা) তাঁর মেয়ে হাফসাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, সাহাবি হজরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত, হজরত ওমর মেয়ে হাফসার ঘরে ঢুকে বললেন, "মা হাফসা, রসুলের মাত্রাতিরিক্ত সোহাগের কারণে রূপের অহঙ্কারিণী আয়েশার ব্যবহার দেখে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।" ওমর আরও বললেন, "কথাটি আমি রসুলকেও শুনিয়েছি। তিনি আমার কথা শুনে মুচকি হাসি দিলেন।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১১৯)।

সওদা, আয়েশা ও হাফসার মধ্যকার বয়সের তারতম্যের কারণে তিন সতীনের ঘরে হিংসার অনল ধুকে-ধুকে জ্বলছিল তবে দাবানলে পরিণত হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর ফুফাতো বোন এবং পালিত-দত্তকপুত্র জায়েদ ইবনে হারিথের স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। অবশ্য আল্লাহর রসুল এর আগে আরও দুই রমণীর (জয়নাব বিনতে খোজাইমা ও উম্মে সালমা) পাণি গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু আয়েশা ও হাফসা কোনো অবস্থাতেই পালক পুত্রের স্ত্রীর সাথে এ বিয়ে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু নবীজি কোরানের আয়াত নিয়ে ধামাচাপা দিলেন : "স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন ও তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো, আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে সংগত ছিল। তারপর জায়েদ যখন (জয়নাবের সাথে) বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিয়ে করতে বিশ্বাসীদের কোনো বাধা না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৭)। এরপর তাঁরা (আয়েশা ও হাফসা) প্রফেট মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় লিপ্ত হলেন। শেষমেশ কোনো কিছু করতে না পেরে তাঁরা অভিযোগ করলেন, নবীজি না-কী নববধূ জয়নাবের ঘরে খুব বেশি

[৬] The Noble Quran, Translated into the English Language By Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan

সময় কাটান। জয়নাবের কাছে কিছু সুস্বাদু মধু ছিল, যা তিনি নবীজিকে খাওয়াতেন তাঁর ঘরে এলে। একদিন বিবি আয়েশা হঠাৎ করেই নবীকে প্রশ্ন করে বসলেন, "আপনি কার ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন আপনার মুখ থেকে যে খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছে।" নবীজি বুঝতে পারলেন, এ প্রশ্নের অর্থ কি। তিনি খুব মনোক্ষুণ্ন হলেন। পরের দিন জয়নাবের ঘরে উপস্থিত হলে, জয়নাব নবীজিকে মধু খাবার জন্য দিলে তিনি তা খেতে না করেন। আস্তে আস্তে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে নবীজি তাঁর দীর্ঘদিনের পুরানো অভ্যাসানুযায়ী নিজের নামের সাথে 'আল্লাহর' নাম সংযোজন করে কোরানের বাণী নিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। বাণীটি হচ্ছে : "কোন মুসলমান নর-নারীর জন্যে উচিৎ নয়, যে বিষয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (দঃ) সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তার ওপর মন্তব্য করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের (দঃ) অবাধ্য হয় সে নিশ্চয়ই ধ্বংসের পথে।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৬)। (দ্রষ্টব্য : The Early History of Islam, Page 219)।

আল্লাহর কালাম বলে চালিয়ে সকল স্ত্রীর মুখ বন্ধ করা গেলো, কিন্তু সমাজে ঘটনাটি অন্যভাবেও প্রচার হয়ে গেলো; এর জন্যে স্বয়ং জয়নাব কিছুটা দায়ী, কারণ তিনিই মুহাম্মদের (দঃ) সাথে বিয়ের আগে মানুষের কাছে বলে দিয়েছিলেন, তার শ্বশুর কিভাবে তাঁকে কাপড় বদলানোর সময় অর্ধোলোঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন। অবশ্য জয়নাবকে বেশি দোষও দেয়া যায় না কারণ বেচারি জয়নাব কি জানতেন 'শ্বশুর' মুহাম্মদেরই সাথেই পরবর্তীতে তাঁর বিয়ে হবে? প্রফেট মুহাম্মদ আগে তাঁর সাহাবি ও অনুসারীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন তারা যেন কারোর অবর্তমানে তার গৃহে পদার্পণ না করে; অথচ ৬২৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি নিজেই জায়েদের গৃহে গমন করেন এবং জায়েদের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীকে মনোহর মূর্তিতে দেখতে পান।[৭]

মুহম্মদের জীবনে রমনীরা

ইরানি স্কলার আলি দস্তি তাঁর 'Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad' গ্রন্থে বলেছেন প্রফেটের জীবনে ২২ জন রমণী এসেছেন বলে জানা যায়, এদের মধ্যে ১৬ জন বিবাহের মাধ্যমে, ২ জন দাসী এবং ৪ জনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তাঁর দেয়া তালিকাটি নিম্নরূপ -

মুহম্মদের (বৈবাহিক সূত্রে) স্ত্রী:

১. খাদিজা	২. সওদা	৩. আয়েশা	৪. উম্মে সালমা
৫. হাফসা	৬. জয়নাব বিনতে জাহাশ	৭. জুয়াইরিয়া	৮. উম্মে হাবিবা
৯. সাফিয়া	১০. ময়মুনা	১১. ফাতেমা	১২. হিন্দ
১৩. আসমা	১৪. (খোজায়ামার) জয়নব	১৫. হাবলা	১৬. (নোমানের) আসমা

মুহম্মদের দু'জন দাসী/রক্ষিতা:

১৭. মেরী

১৮. রায়হানা

মুহম্মদের বিবাহবহির্ভুত সম্পর্কের নারীরা:

[৭] বেঞ্জামিন ওয়াকার (সা'দ উল্লাহ্ অনূদিত), *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৩৬।

১৯. উম্মে শারিক

২০. (হারেথের) ময়মুনা

২১. জয়নব (তৃতীয় জন)

২২. খাওলা

আয়েশা কোথায় বৃদ্ধ স্বামীকে একটু সেবা-যত্ন করবেন উল্টো তাঁর জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। আয়েশা ও হাফসা মিলে আরেকটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিলেন। পুরোপুরি নারী কেলেঙ্কারি ঘটনা। ঘটনাটি ছিল এরকম : নবীজির (দঃ) আরেক স্ত্রী প্রায় আয়েশার সমবয়সী ১৮ বৎসরের খ্রিস্টান ক্রীতদাসী মারিয়া কিবতিয়াকে নিয়ে। ৬২৮ সালে কিশোর বয়সী, অত্যন্ত সুন্দরী কোঁকড়ানো চুলের মারিয়াকে মিশরের রোমান সম্রাট মুকাও কিস প্রফেট মুহাম্মদকে (দঃ) উপহারস্বরূপ দান করেছিলেন। আয়েশা কোনোদিনই মারিয়াকে প্রফেট মুহাম্মদের (দঃ) 'স্ত্রী' হিসেবে স্বীকার করেননি। মারিয়াও কোনোদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। ঘটনাটি ঘটেছিল গনিমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত নবীজির ১৭ বৎসর বয়স্ক ১১তম স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুজায়ার ঘরে (কেউ কেউ বলেন হাফসার ঘরে)। আয়েশার (ভিন্নমতে হাফসার) পালার দিন থাকা সত্ত্বেও প্রফেটকে মারিয়ার সাথে যুগলবন্দী অবস্থায় ধরে ফেলেন হাফসা। বিব্রত প্রফেট মুহাম্মদ হাফসাকে অনুরোধ করেন এ ঘটনা আয়েশার কানে না তুলতে। কিন্তু হাফসা ঘটনাটি চেপে রাখতে না পেরে তা আয়েশাকে বলে দিলেন। ব্যস, দুজনে মিলে রটিয়ে দিলেন মুহাম্মদ (দঃ) মারিয়াকে বিয়ে না করেই তাঁর সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় খাদিজার পরে একমাত্র মারিয়াই মুহাম্মদের (দঃ) 'ইব্রাহিম' নামের একটি পুত্র সন্তান তার গর্ভে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র ১৫ মাসের মাথায় শিশু ইব্রাহিম মারা যায়। যাহোক যে আয়েশাকে প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) আদরে-আহ্লাদে-যত্নে আগলে রাখতেন, কোরানের আয়াত দিয়ে সকল স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন, অসতীর অপবাদ থেকে রক্ষা করলেন, সেই আয়েশা বড় হয়ে তাঁর নামে এমন অপবাদ রটাবেন প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) তা কল্পনাই করতে পারেননি। যে রমণীগণকে মুহাম্মদ (দঃ) 'উম্মুল মোমেনিন' (মুসলমানদের মা) বলে সম্বোধন করে সম্মান দেখালেন, তারা কখনো ভাত-কাপড় চেয়ে বিরক্ত করবেন[↓], কখনো রাত ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করবেন, কখনো মধু কেলেঙ্কারি, কখনো নারী কেলেঙ্কারি রটাবেন, আবার কখনো একে-অন্যকে অসতীর অপবাদ দেবেন, এ আর কতো সহ্য করা যায়?[+] রাগ করে

[↓] একদা নবীজি যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল বিতরণ করার সময়, বিবি আয়েশা নবীজির কাছে নিজের পাওনা থেকে অতিরিক্ত কিছু চেয়ে বসেন, কিন্তু নবীজি তা দিতে অস্বীকার করেন। এতে আয়েশা খুব বিরক্তি প্রকাশ করলে হজরত আলি আয়েশাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন কিন্তু বিবি আয়েশা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে হজরত আলিকে এক হাত দেখে নিলেন। আয়েশার এই ব্যবহারে প্রফেট মুহাম্মদও রাগান্বিত হয়ে হজরত আলিকে অনুমতি দিলেন, প্রফেটের তরফ থেকে হজরত আলি চাইলে যখন খুশি নবীপত্নীদের ডিভোর্স দিতে পারবেন আর নবীপত্নীদের উদ্দেশ্যে কোরানের সুরা আহজাবের ২৮নং আয়াত তৈরি হল : "O Prophet! Say to thy Consorts: "If it be that ye desire the life of this World, and its glitter,- then come! I will provide for your enjoyment and set you free in a handsome manner." (33:28)। (দ্রষ্টব্য : *The Early History of Islam*, Page 219)।

[+] নবী মুহাম্মদের হেরেমে পত্নীগণের পারিবারিক ডায়েরি : (১) ভাত-কাপড়ের দাবি নিয়ে ঝগড়া-সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ২৮; (২) প্রকাশ্যে নবী পত্নীর অশ্লীল কাজের দ্বিগুণ শাস্তি-সুরা, আহজাব, আয়াত ৩০ (গোপনে করলে? উল্লেখ নাই!); (৩) অসঙ্গত কথাবার্তা-সুরা আহজাব, আয়াত ৩২; (৪) অপবিত্র পত্নীদের পূর্ণ পবিত্র থাকার উপায়-সুরা আহজাব, আয়াত ৩৩; (৪) পুত্রবধূকে (জয়নাব বিনতে জাহাশ) সতীন হিসেবে মেনে নেওয়া-সুরা আহজাব, আয়াত ৩৭; (৫) সতীনদের হিংসা-সুরা আহজাব, আয়াত ৫০; (৬) রাত ভাগাভাগি-সুরা আহজাব, আয়াত ৫১; (৭) হালাল দাসী-সুরা আহজাব, আয়াত ৫২; (৮) নবীপত্নীদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ-সুরা আহজাব, আয়াত ৫৩; (৯) নবীপত্নীদের কানাকানি-সুরা আহজাব, আয়াত ৫৪; (১০) পর্দাপ্রথা-সুরা আহজাব, আয়াত ৫৯; (১১) নারী কেলেঙ্কারী কেইসে জনতার কাঠগড়ায় আয়েশা-পক্ষের উকিল হিসেবে আল্লাহর (আসলে মুহাম্মদ) জবানবন্দী-সুরা ২৪, নুর, আয়াত ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫; (১২) বিনা প্রমাণে আল্লাহর নামে সাক্ষী দান-সুরা নুর, আয়াত ৬-৯; (১৩) পত্নীগণের মন রাখা-সুরা ৬৬, তাহ্‌রিম, আয়াত ১; (১৪) বিশ্বাসঘাতিনী হাফসা-সুরা তাহ্‌রিম, আয়াত ৩; (১৫) অন্যায়কারী আয়েশা ও হাফসা- সুরা তাহ্‌রিম, আয়াত ৪; (১৬) তুলনামূলক অধম নারী-সুরা তাহ্‌রিম, আয়াত ৫।

নবী মুহাম্মদ পুরো এক মাসের জন্যে সকল স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করলেন। ঐ ঘটনাটি হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদিসে এভাবে বর্ণনা করেছেন : "আমার খুবই আগ্রহ হলো ওমরকে (রাঃ) জিজ্ঞাস করি সেই দুই মহিলা সম্পর্কে যাদের কথা পবিত্র কোরানের সুরা তাহ্‌রিমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওমর (রাঃ) বললেন, ওহে ইবনে আব্বাস (রাঃ), অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ঐ দুই মহিলা হলেন আয়েশা ও হাফসা। তারপর ওমর (রাঃ) আরও বললেন, 'আমরা কোরায়েশগণ সর্বদাই নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে এসেছি, কিন্তু মদিনায় এসে দেখা যায় এখানে পুরুষের ওপর নারীর কর্তৃত্ব। আমার স্ত্রী যেদিন আমার কথা অমান্য করলো আমি তাকে ধমক দিলাম। সে উল্টো আমাকে ধমক দিয়ে বললো, "এই দিন আর সেই দিন নয়, আজকাল নবীর স্ত্রীগণও নবীর কথার ওপর কথা বলে দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো শুনা যাবে নবীর কয়েকজন স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন।" আমি তার কথা শুনে তাড়াতাড়ি মসজিদে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনি সকলের মুখে একই কথা, আমাদের রসুল মুহাম্মদ তাঁর সকল স্ত্রীকে একসাথে তালাক দিয়েছেন। আমি এক দৌড়ে আমার মেয়ে হাফসার গৃহে গিয়ে পৌঁছলাম। হাফসাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি নবীর মনে আঘাত দিয়েছো? হাফসা নির্দ্বিধায় বলে দিল, হ্যাঁ।' (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১১৯)।

কী এমন ঘটেছিল, আর কিইবা অপরাধ করলেন আয়েশা ও হাফসা, যে কোরানের আয়াত নিয়ে এসে তাঁদেরকে শাসাতে হলো? কোরান শরিফে আল্লাহ (?) বলছেন : "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি কেন আপনার স্ত্রীগণকে খুশি করার জন্যে তা হারাম মনে করবেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। হে রমণীগণ, আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন তোমাদের মুক্তির উপায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। যখন নবী (দঃ) তার একজন স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বললেন, তারপর স্ত্রী ঐ গোপন কথা অন্যকে বলে দিল, আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন। নবী তখন তাঁর স্ত্রীকে (হাফসা) কিছু বল্লেন আর কিছু গোপন রাখলেন। সে বলে, আপনাকে কে বলেছে। নবী বল্লেন, তিনি বলেছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সবজান্তা। তোমাদের উভয়ের (আয়েশা ও হাফসা) অন্তর কলুসিত হয়ে গেছে, যদি তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো, তবে ভাল। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় একে অন্যকে সাহায্য করো, তবে মনে রেখো আল্লাহ, জিব্রাইল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেস্তাগণও তাঁর সাহায্যকারী। (আজ যদি) নবী তোমাদেরকে তালাক দেন, (কাল) হয়তো আল্লাহ নবীকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, অনুতাপকারিণী, অকুমারী ও কুমারী নারী।" ইংরেজি আয়াতটিও দেখে নিই একই সাথে :

> "O Prophet! Why do you ban (for yourself) that which Allâh has made lawful to you, seeking to please your wives? And Allâh is Oft-Forgiving, Most Merciful. Allâh has already ordained for you (O men), the dissolution of your oaths. And Allâh is your Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.) and He is the All-Knower, the All-Wise. And (remember) when the Prophet disclosed a matter in confidence to one of his wives (Hafsah), so when she told it (to another i.e. 'Aishah), and Allâh made it known to him, he informed part thereof and left a part. Then when he told her (Hafsah) thereof, she said: "Who told you this?" He said: "The All-Knower, the All-Aware (Allâh) has told me". If you two (wives of the Prophet, namely 'Aishah and Hafsah) turn in repentance to Allâh, (it will be better for you), your hearts are indeed so inclined (to oppose what the Prophet likes), but if you help one another against him (Muhammad), then verily, Allâh is his Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.), and Jibrael (Gabriel), and the righteous among the believers, and furthermore, the angels are his helpers. It may be if he divorced you (all) that his Lord will give him instead of you, wives better than you, Muslims (who submit to Allâh), believers, obedient to Allâh, turning to Allâh in repentance, worshipping Allâh sincerely, fasting or emigrants (for Allâh's sake), previously married and virgins." (সুরা ৬৬, তাহ্‌রিম, আয়াত ১-৫)।

উল্লেখ্য মুহাম্মদ (দঃ) কোরানের তিনটি সুরা যেমন সুরা নুর, সুরা আহজাব ও সুরা তাহ্‌রিম, তাঁর তিন স্ত্রী যথাক্রমে আয়েশা, জয়নাব ও মারিয়াকে কেন্দ্র করে রচনা করলেও কিন্তু কোনোটাতেই তাঁদের কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। ঠিক তেমনি সুরা ইউসুফে বর্ণীত প্রেমকাহিনীতে হজরত ইউসুফের নাম আছে কিন্তু জুলেখার নাম নেই। অবশ্য সুরা ইউসুফে বর্ণীত কাহিনী কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে কাল্পনিক কাহিনীতে ভরা 'আলিফ লায়লা' ধরনের 'আরব্য উপন্যাসে'র মতো বইয়েই বেশি মানায়।

সে যাক বিবি আয়েশার কথায় ফিরে আসি। চঞ্চল দুষ্টমতি আয়েশার বয়স তখন পনেরো কি ষোল। দেহে যৌবন নদীর উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ। আয়েশা দেখেছেন নবী (দঃ) তাঁর স্ত্রীগণ ছাড়াও আরও চারজন রমণীর (খাওলা, জয়নাব, উম্মে শারিক ও ময়মুনা) সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। একবার খাওলা বিনতে হাকিম নামের এক মহিলা যখন নিজেকে মুহাম্মদের (দঃ) সামনে উপস্থাপন করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আয়েশা গর্জে উঠলেন, বললেন : "কি বেহায়া-বেশরম মেয়ে, নিজেই এসে পুরুষের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছে। নবী (দঃ) বিরক্ত হয়ে আয়েশাকে আল্লাহর সনদ শুনালেন : "হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদেরকে বৈধ করেছি যাদেরকে তুমি দেনমোহর দিয়েছ ও বৈধ করেছি তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে যাদেরকে আমি দান

করেছি, এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতে, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো বোনদেরকে যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে আর কোনো বিশ্বাসী নারী নবীর কাছে নিবেদন করলে আর নবী তাকে বিয়ে করে বৈধ করতে চাইলে সে-ও বৈধ। এ বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। বিশ্বাসীদের স্ত্রী ও তাদের দাসীদের সম্বন্ধে আমি যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তুমি ওদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার ও যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার, আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোনো দোষ নেই। এ-বিধান এজন্য যে, এতে ওদেরকে খুশি করা সহজ হবে আর ওরা দুঃখ পাবে না, এবং ওদেরকে তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই খুশি থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সব জানেন, সহ্য করেন।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৫০-৫১)। আয়েশা নবীকে কানে কানে বললেন, "আপনাকে খুশি করতে আপনার 'আল্লাহ' ওহি নিয়ে আসতে দেখছি খুব একটা দেরি করেন না!" ঘটনাটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> Narrated Hisham's father: Khaula bint Hakim was one of those ladies who presented themselves to the Prophet for marriage. 'Aisha said, "Doesn't a lady feel ashamed for presenting herself to a man?" But when the Verse: "(O Muhammad) You may postpone (the turn of) any of them (your wives) that you please," (33:51) was revealed, 'Aisha said, 'O Allah's Apostle! I do not see, but, that your Lord hurries in pleasing you. (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৪৮)। বিবি আয়েশার এই বক্তব্য তো আমাদেরও।

তাই বলে নবী কিন্তু একেবারে অপছন্দের কোনো মহিলাকে বিয়ে করতেন না, সে যতই এতিম, অসহায়, নিরাশ্রয়, নিরুপায় হোক না কেন। হজরত সোহেল ইবনে সাদ আস-সাইদি (রাঃ) এমনি একটি ঘটনার বর্ণনায় বলেন : "একজন মহিলা (আত্মীয়-স্বজনহারা, ভিটে-মাটিহীন) নবীজির কাছে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহর রসুল আমি আমাকে মোহর ছাড়াই আপনার হাতে সমর্পন করলাম, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। নবীজি মহিলাটিকে আপাদমস্তক ভালভাবে পরখ করলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। রসুলকে নিরুত্তর দেখে কিছুক্ষণ পর একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে রসুল ঐ মহিলাকে যদি আপনার প্রয়োজন না হয়, আমাকে দিয়ে দিন আমি তাকে বিয়ে করবো। রসুল বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে তাকে দেয়ার মতো? লোকটি বললো কিছুই নেই। নবীজি বললেন, তুমি কি কোরানের কিছু আয়াত মুখস্ত বলতে পারবে? সে বললো, হ্যাঁ, পারবো। কোরানের ঐ আয়াতগুলোকে মোহরানা ধরে নবীজি লোকটির কাছে মহিলার বিয়ে দিয়ে দিলেন।" (ঈষৎ সংক্ষেপিত) (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ২৪)। হায়! নারী তো দেখি আর মানুষ নয়, খোলা বাজারের পণ্য! একজনের পছন্দ না হলে আরেকজনকে দিয়ে দেওয়া যায়।

এদিকে রূপের গরবিনী আয়েশা তাঁর সতীনদের প্রায়ই কটাক্ষ করে বলতেন যে, তিনিই এই পরিবারে একমাত্র কুমারী মহিলা যাকে কোনো পরপুরুষ কোনোদিন স্পর্শ করেনি। ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, সতীত্বের অহংকারিণী আয়েশার কপালে একদিন নিন্দুকেরা অসতীর কলঙ্ক লাগিয়ে দিল। ঘটনাটি আয়েশার মুখ থেকেই শুনা যাক। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলছেন : "তখন ষষ্ঠ হিজরির (৬২৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে) শা'বান মাসের এক কালো রাত্রি। বানু মুস্তালিক গোত্রকে আক্রমণ করা হবে। নবীজি যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করতেন কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নেবেন। লটারিতে আমার নাম উঠলো। সেনাপতির দায়িত্বে নবীজি আর আমি তাঁর সাথে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না, নিশীথ রাতের অতর্কিত হামলা প্রতিরোধ করার মতো সময় ওদেরকে দেয়া হয়নি। ঘুম থেকে জেগে ওঠে বানু মুস্তালিক গোত্র দেখতে পেলো তাদের ঘরবাড়ি, এলাকা সবকিছু মুসলমানগণ দখল করে নিয়েছেন। তাদেরকে বন্দী করে গনিমতের মালপত্র নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মদিনার অদূরে 'মুরাইস' নামক এক জায়গায় আমরা বিরতি নিলাম। এখানে পানি উত্তোলন নিয়ে হজরত ওমরের চাকরের সাথে মদিনার কিছু লোকের ঝগড়া হয়। ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে, মদিনার প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্ বলতে শুরু করলেন, "মদিনাবাসী দেখো শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয়ার পরিণতি। খাল কেটে তোমরা কুমির এনেছ, আদর করে তাদেরকে মাথায় তুলেছ, তোমাদের সহায়-সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব দিয়েছ, এখন তারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। এবার বাড়ি গিয়ে এই নীচমনাদেরকে তাড়াতে হবে।" আব্দুল্লাহ বিন উবে রীতিমতো মদিনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। নবীজি কোনো রকম বিষয়টা সামাল দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবু উঠিয়ে মদিনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতিকালে আমি প্রশ্রাব করার উদ্দেশ্যে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার গলার হারটি কোথায় পড়ে গেছে। হারের সন্ধানে আমি আবার বেরিয়ে যাই। আমার মালপত্র উটের মাচায় উঠানো হলো কিন্তু কেউ লক্ষ্যই করলো না যে, আমি উটের উপরে নেই। ফিরে এসে দেখি তারা সবাই চলে গেছেন। আমার সাথে একখানা চাদর ছিল। উটের উপর আমাকে না দেখে, দলের লোকজন নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরে আসবে, এই আশায় চাদর গায়ে দিয়ে আমি সেখানে শুইয়ে পড়ি। ভোরবেলা সৈনিক সাফওয়ান বিন আল-মুত্তাল আস-সুলামি আধ-ধাকাওয়ানি যিনি সৈন্যদলের পেছনে ছিলেন, আমার জায়গায় এসে পৌঁছুলেন। আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় চিনতে পারলেন, কারণ এর আগে তিনি আমাকে বহুবার দেখেছেন, নবীজি আমাদের জন্য বোরকা

বাধ্যতামূলক করার আগে। সাফওয়ান চিৎকার দিয়ে বললেন, "হায় সর্বনাশ! নবীজির স্ত্রীকে ফেলে সবাই চলে গেলো।" তার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে আমি উঠে বসি। আল্লাহর কসম, আমরা একে অন্যের সাথে কোনো কথা বলি নাই। তিনি তার উটটিকে আমার সামনে নত করে দেন। আমি তার উটের ওপর আরোহণ করি। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় আমরা আমাদের মূলদলের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হই। মূল দলের কেউ জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি আমি যাত্রার অর্ধেক সময় তাদের সাথে ছিলাম না। মদিনায় পৌঁছে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। পুরো একমাস বিছানায় পড়ে থাকি। আমি লক্ষ্য করলাম এই একমাসের মধ্যে নবীজি আমাকে দেখতেও আসেন না, আমার সাথে কথাও বলেন না। আমার সন্দেহ হলো বিষয়টা কি? অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি মায়ের কাছে চলে যাই। এক রাতে মিসতাহ্‌র (বদরেরযুদ্ধে নবীজির এক সৈনিক) মায়ের সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে মিসতাহ্‌র মা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যান; চিৎকার করে বললেন, 'মিসতাহ তোর ধ্বংস হউক!' আমি বললাম, 'তুমি এ কেমন মা, নিজের সন্তানকে অভিশাপ দিচ্ছো।' তিনি বললেন, 'আয়েশা তুমি কি শুনো নাই, মিসতাহ অন্যান্যদের সাথে তোমার নামে কেমন কেলেঙ্কারি রটাচ্ছে?' মিসতাহর মায়ের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। দৌঁড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে সারারাত কাঁদলাম। ভোরে উঠে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, কেলেঙ্কারি রটনায় অগ্রণী ভূমিকায় আছেন আমার সতীন জয়নাবের বোন (নবী মুহাম্মদের শালিকা) হামনাহ্‌ বিনতে জাহাশ, নবীর অফিসিয়াল কবি হাসান বিন থাবিত, বদর যুদ্ধের সৈনিক (আয়েশার চাচা) সাহাবি হজরত মিসতাহ বিন হাসাসা ও আব্দুল্লাহ বিন উবে।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৪৬২)।

ঘটনাটি একই রকম বর্ণনা করা হয়েছে এই উপমহাদেশের ইসলামি আন্দোলনের নেতা, কোরানের তফসিরকারক সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মৌদুদির 'তাফহীমুল কোরআন' (উর্দু সংস্করণ)।[৮] তৃতীয় খণ্ডের ৩১২ পৃষ্ঠায় মাওলানা মৌদুদি উল্লেখ করেছেন :

> "অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, যখন সাফওয়ান আয়েশাকে নিয়ে ভোর বেলা কাফেলার সামনে এসে পৌঁছুলেন, আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্‌ উচ্চকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম এই মহিলা আর সতী হতে পারেন না, দেখো নবীর স্ত্রীর অবস্থা, সারারাত সাফওয়ানের সাথে কাটিয়ে কেমন বেপর্দা হয়ে তার সাথে ফিরে এসেছেন।"

এ ঘটনায় নবীজি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। একমাস অতিবাহিত হয় আয়েশার সাথে দেখা নেই, কথা নেই। আয়েশা নিজেই এসে নবীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না? মুহাম্মদ (দঃ) বললেন, তুমি দোষী হলে শাস্তি পাবে অন্যথায় আল্লাহই তোমাকে মুক্ত করবেন। আয়েশা বললেন, ঠিক আছে আমার অপেক্ষা করাই ভাল। ইতোমধ্যে মুহাম্মদ (দঃ) এ ব্যাপারে হজরত আলি (রাঃ), আবু বকর (রাঃ) ও উসমা বিন জায়েদসহ একান্ত কিছু বিশ্বস্ত লোকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। প্রায় সকলেই বললেন যে, তারা আয়েশাকে চরিত্রহীনা মনে করেন না, এ নিয়ে আলাপ-আলোচনার দরকার নেই, এখানেই বিষয়টির সমাপ্তি হওয়া ভাল। হজরত আলি (রাঃ) ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, নবীজি আপনি এই অসতী নারীকে এখনই তালাক দিয়ে দিন। নবীজি আলির কথা অবজ্ঞা করে পরের দিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে 'সুরা নুর' আবৃত্তি করলেন : "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকে বিয়ে করে, আর ব্যভিচারিণী নারী কেবল ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করে, আর এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। যারা সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।" (সুরা ২৪, নুর, আয়াত ৩-৪)

এরপর আর কখনো কোনো অভিযানে আয়েশাকে একা সঙ্গে নেননি। তবে গুজব ছড়ানোকারীদের মধ্যে ভাড়াটে কবি হাসান বিন থাবিতসহ কয়েকজনকে চাবুক মারা হয় কিন্তু আব্দুলাহ ইবনে উবেহ্‌কে পদমর্যাদার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। (দ্রষ্টব্য : ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৩৪)। আয়েশা ব্যভিচারিণী ছিলেন কী-না তা প্রমাণ করা আমাদের এই আলোচনার বিষয় নয়, তবে প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায় : (১) অপবাদ রটনায় যারা জড়িত ছিলেন, একমাত্র আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্‌ ছাড়া বাকি সকলই তো ছিলেন আয়েশা ও মুহাম্মদেরই আপনজন এবং সাহাবি; (২) আয়েশার জবানবন্দি হজরত আলি (রাঃ) না হয় বিশ্বাস করলেন না, স্বয়ং নবীজি কি আয়েশাকে বিশ্বাস করেছিলেন? (৩) জয়নাব ও মারিয়া কিবতিয়ার সাথে বিয়ের পয়গাম নিয়ে আল্লাহর ওহি আসতে এক ঘণ্টা সময় লাগে না, সেখানে নবীজির কথিত প্রিয় স্ত্রী আয়েশার ওপর এমন বিপদে ওহি আসতে ১ মাস লেগে যায় কেন?; 'গুপ্তচর মারফত নবীজি 'খবর' জেনে নিতে পারলে আল্লাহ তৎক্ষণাৎ জেনে যান আর নবীজি না জানলে আল্লাহও জানতে পারেন না।' এটাই তো আসল রহস্য! (৪) আর চারজন লোক সাক্ষী রেখে কেউ কি কোনোদিন ব্যভিচারী কাজ করে; যেখানে নবীপত্নীর মতো অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তির সাথে চাকরকে জড়িয়ে 'স্ক্যান্ডাল'?

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৮ বছরের প্রিয়তমা পত্নী আয়েশার বুকে মাথা রেখে নবী মৃত্যুবরণ করেন। বিধবা মুসলিম নারীদের জন্যে পুনঃবিবাহ বৈধ হলেও মৃত্যুর আগে নবীজি তাঁর পত্নীগণের জন্যে পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ করে গেলেন : ৩৩ নং সুরা আহজাবের ৫৩ নং

[৮] S.A. Mawdudi, *Tafhimul Quran*, part-3, Tarjuman-ul-Quran Publisher, page 312.

আয়াত দিয়ে। ইবনে সা'দ এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, আবু বকরের চাচাতো ভাই তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ একবার বলেছিলেন, প্রফেট মারা গেলে তিনি আয়েশাকে বিয়ে করবেন, প্রফেট মুহাম্মদ এ কথা শুনার কিছুদিন পরেই তাঁর সুন্দরী পত্নীদের 'মোমেনগণের মাতা' হিসেবে ঘোষণা করে কোরানের আয়াত (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৬) নিয়ে আসেন এবং পত্নীগণের জন্য পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ করে দেন। নবীজি নিজের খেয়ালখুশি মতো ভাতিজী আয়শাকে নিজের স্ত্রী বানাতে পারেন, আবার তালহার শালী আয়েশাকে তালহার মা বানাতে পারেন, একজন নবী হিসেবে এটা খুবই সহজ ব্যাপার! মাত্র ১৮ বৎসরের যুবতী আয়েশা আর কোনোদিন বিয়ে করতে পারবেন না, কারো মা হতে পারবেন না। এ সুন্দর পৃথিবী তাঁর কাছে বড়ই কুৎসিত মনে হলো। এই অল্প বয়সে আয়েশা প্রত্যক্ষ করেছেন, মিথ্যে ভালোবাসার প্রতারণা, এক ডজনেরও অধিক নবীপত্নীর অপমান-অপবাদ, নোংরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থপর সমাজের লাঞ্ছনা, অন্যায় অবিচার। সমাজের প্রতি পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ধীরে ধীরে আয়েশাকে বিদ্রোহী করে তোলে। ১৪ বৎসর পর হজরত আলির (রাঃ) খেলাফত অস্বীকার করে আয়েশা সকল আবরণ-অবরোধ-বন্ধন ছিন্ন করে, মুহম্মদের (দঃ) সকল বাধা-নিষেধ অগ্রাজ্য করে তলোয়ার হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন বিদ্রোহী মুসলমান খলিফা হজরত উসমানকে (রাঃ) হত্যা করে। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আয়েশা (রাঃ) মুহম্মদের (দঃ) উত্তরাধিকারী হজরত আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইসলামের ইতিহাসে তা 'জঙ্গে জামাল' নামে অভিহিত। ইরাকের বসেরায় হজরত আলির (রাঃ) সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে আয়েশা পরাজয় বরণ করেন। হজরত আলি (রাঃ) আয়েশাকে বন্দী করে মদিনায় নিয়ে যান। ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে বিবি আয়েশা (রাঃ) জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে রিক্ত-নিঃস্ব অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জি :

(১) Saifur Rahman Mubarakpuri, Memoris of the Noble Prophet (Pbuh), the internet version of English translation can be read at : http://web.youngmuslims.ca/online_library/books/the_sealed_nectar/index.htm
(২) P. De Lacy Johnstone, Muhammad and His Power, Kessinger Publishing, New york, 1901, page 35-36.
(৩) M. R. M. Abdur Raheem, Muhammad the Prophet, Pustaka Nasional Pte Ltd, 1988.
(৪) Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, (translated in English by S. Moinul Haq), Vol 1 & 2, Kitab Bhavan, India.
(৫) Saiyid Safdar Hosain, The Early History of Islam, Volume 1 & 2, Low Price Publications, Delhi, (First Published 1933), Reprinted 2006.

চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

প্রথম অধ্যায়

বোকার স্বর্গ[১]

You may fool all the people some of the time; you can even fool some of the people all the time; but you can not fool all of the people all the time. অর্থাৎ, সকল মানুষকে কিছু সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায়। কিছু মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায়, কিন্তু সকল মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায় না।— মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯—১৫ এপ্রিল, ১৮৬৫)।

১

মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, রাহাজানি, হানাহানি, খুনোখুনি, আর্থ-সামাজিক অবনতির অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রধান ও অন্যতম কারণ হচ্ছে 'ধর্ম' (Religion)। সমাজবিজ্ঞান আর নৃবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি আদিম-অসহায় মানুষদের অজ্ঞতা, কল্পনা আর ভয়ভীতি থেকে একদা ধর্মের উৎপত্তি; এবং এর যাত্রা শুরু আজ থেকে প্রায় চল্লিশ থেকে পঁচিশ হাজার বছর আগের মানুষের পূর্বপ্রজাতি নিয়ান্ডার্থাল প্রজাতির মধ্যে। আস্তে আস্তে সময়ের পরিক্রমায় মানুষের যেমন ক্রমবিকাশ ঘটেছে, চিন্তাচেতনার নানা স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন দর্শনে, তেমনি ধর্মীয় চেতনারও বিস্তৃতি ঘটেছে ভিন্ন ভিন্নরূপে। বিচ্ছিন্ন মানুষ বনে-জঙ্গলে হিংস্র পশুর আক্রমণ, বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে আর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, ক্ষরা, অধিক বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দাবানল ইত্যাদি) থেকে বেঁচে থাকতে গিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে, গোষ্ঠীবদ্ধ থেকে সমাজবদ্ধ হয়েছে, সমাজ থেকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করেছে; এই সমাজ কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের মতো করে কিছু নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সে সময়কার মানুষের জীবন-জগৎ সম্পর্কে পরিপূর্ণ কিংবা বিশ্লেষণী জ্ঞান না থাকার দরুন তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য, বন্য পশুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য, পেটপুরে কিছুটা খাবার সংগ্রহের নিশ্চয়তা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রাক-ধর্মীয় চেতনা বিস্তার লাভ করে। প্রাক-ধর্মীয় চেতনা যেমন দীর্ঘ সময়ে আত্মার ধারণা থেকে টোটেমবাদ, টোটেমবাদ থেকে সর্বপ্রাণবাদ, সর্বপ্রাণবাদ থেকে সর্বেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ থেকে বহুঈশ্বরবাদ-এ মোড় নিয়েছে, সমন্বয় ঘটেছে; তবে সবাই জানেন এগুলো সবসময় সবজায়গায় কখনো একরৈখিক ছিল না। স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, সমন্বিত হয়েছে। যাহোক, ধীরে ধীরে মানুষ বহুঈশ্বরবাদ থেকে আবার একেশ্বরবাদে পৌঁছেছে (সমাজ অগ্রগতির প্রক্রিয়াতেই একটা সময় হয়ত একেশ্বরবাদের অবশিষ্ট একটি ঈশ্বরকে ছেঁটে ফেলে মানব সভ্যতা 'নিরিশ্বরবাদে' পৌঁছিয়ে যাবে)। মানুষের এই সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। মানুষের তৈরি প্রচলিত একেশ্বরবাদ বা বহুঈশ্বরবাদের ধর্মীয় শাস্ত্রগুলো কঠোর পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে রচিত, যেখানে নারী নরকের কীট। শাস্ত্রগুলি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েই রেখেছে নারী পুরুষের অধীন, নারী শয়তানের বেশ ধরে আসে, শয়তানের বেশ ধরে যায়, নারীর কোনো গুণ নেই, তার কাজ শুধু পুরুষদের দূষিত করা ইত্যাদি। বাইবেলে দেখি কথিত সৃষ্টিকর্তা 'ঈশ্বর' বলেন, তিনি তাঁর নিজের অবয়বে মানুষ সৃষ্টি করছেন (God created man in his own image - জেনেসিস, ১:২৭)। কিন্তু তৌরাত, ইঞ্জিল, বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কোরান ইত্যাদি বর্তমানে প্রচলিত তথাকথিত ধর্মীয় শাস্ত্রগুলো নির্মোহভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় এগুলোতে চরম পিতৃতান্ত্রিকতার ধ্বজাধারী পুরোহিত-মোল্লা-পাদ্রিরাই 'ভগবান', 'ঈশ্বর', 'আল্লাহ', 'গড'-এর মুখ দিয়ে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। নিজেরা যেভাবে জগতকে দেখতেন, বিচার করতেন, তেমনি কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদ থেকে হোক, নিজের উদরপূর্তির জন্যই হোক, অথবা নিজের ভয়-ভক্তি-বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সৎ উদ্দেশ্য থেকেই হোক, শাস্ত্রগুলোর বক্তব্যকে 'সর্বশক্তিমান' 'সর্বজ্ঞানী' সৃষ্টিকর্তা-ঈশ্বরের নামে রটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ফলে

---

[১] এ প্রবন্ধের শিরোনাম 'বোকার স্বর্গ'; যা বাংলাভাষায় বহুল ব্যবহৃত এবং প্রচলিত বাগধারা। শিরোনামটি দেখে সরলপ্রাণ, দুর্বলচিত্তের ধর্মবিশ্বাসীদের গোস্বা করা বা উত্তেজিত হওয়া কিংবা হঠাৎ করে ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত-আহত হওয়ার কিছু নেই, কারণ এর দ্বারা সকল ধর্মবিশ্বাসীদের নির্বিশেষে কোনোভাবেই বোকা বা নির্বোধ বা বুদ্ধু বলা হচ্ছে না; বা তাদের কোনোভাবেই অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞা-অপমান-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে না। 'বোকার স্বর্গ' বলতে বোঝানো হচ্ছে শুধু 'ধর্ম' নামক ব্যবস্থাকেই; যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈশ্বর-আল্লাহ-ভগবান সংক্রান্ত ধারণাসমূহ, উপাসনার নিয়ম-নীতি, রীতি-নীতি, বৈশিষ্ট্য, প্রথা ইত্যাদি।

আমরা প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ হতে ঈশ্বরের যে রূপ দেখতে পাই তা একেবারে একজন সাধারণ মানুষের মতো। ঈশ্বর মানুষের মতো হাসেন, কাঁদেন, রাগ করেন, খুশি হন, কষ্ট পান, প্রতিশোধ নেন, পিছন থেকে আক্রমণ করে শত্রুকে হত্যা করেন, গুণগ্রাহীদের প্রতিদান দেন, যৌন উত্তেজনায় ভোগেন, সময়ে সময়ে একাধিক বিয়ে করেন, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি করেন ইত্যাদি। সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায়, আপনার-আমার মতো মানুষের দ্বারা ঈশ্বর তৈরি করা হয়েছে বলেই ঈশ্বরের ওপর এমন 'নরাত্বরোপ' (anthropomorphism) করা হয়েছে। তা মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণী যদি ঈশ্বর তৈরি করতো, তাহলে? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের গ্রিক কবি জেনোফিনিস (৫৭০-৪৮০ খ্রিস্টপূর্ব)। তিনি বলেছিলেন :

"If oxen had hands and the capacities of men, they would make gods in the shape of oxen."

অর্থাৎ ষাঁড়ের যদি মানুষের মতো হাত ও ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা দেব-দেবীর আকার, রূপ, চরিত্র ষাঁড়ের মতো করেই তৈরি করতো।

ঈশ্বরের নরাত্বরোপ

ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করলে ঈশ্বর সম্বন্ধে এক প্রবল প্রতাশালী রাজার মূর্তিই আমাদের সামনে ফুটে উঠে। ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর রাগ করেন, হিংসা করেন, তোষামোদে খুশি হন, যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন না, তাদের শাস্তি দেন। হীরক রাজার দেশের রাজা যেমন প্রজাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা-আনুগত্য চান, আমাদের ধর্মগ্রন্থের কল্পিত ঈশ্বরও তেমনি তার অনুসারীদের কাছ থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং নিরঙ্কুষ আনুগত্য চান। সম্রাট যেমন প্রজাদের আনুগত্যহীনতায় রুষ্ঠ, ব্যাথিত এবং অসন্তুষ্ট হন, ঈশ্বরও তেমনি ধর্মদ্রোহিতায় এবং ঈশ্বরদ্রোহিতায় ক্ষেপে উঠেন। সম্রাটের যেমন থাকে কারাগার, কিংবা রাজদ্রোহীকে শূলে চড়ানোর ব্যবস্থা, তেমনি ঈশ্বরও নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য রেখে দিয়েছেন নরকের। সেখানে ধর্মদ্রোহীদের পুড়িয়ে অত্যাচার করার নানা বন্দোবস্ত। এগুলো সবই আসলে ঈশ্বরের নরাত্বরোপের (Anthropomorphism) নানা প্রমাণ। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মনুষ্য নির্মাণ করেন। কথাটা আসলে ঘুরিয়ে বলা উচিৎ, মানুষই আপন চিন্তার মাধুরী মিশিয়ে ঈশ্বরকে নির্মাণ করেছিলো। মানুষ নিজের কল্পনায় একসময় ঈশ্বরকে গড়েছিল বলেই তার প্রকাশ হয়েছে এক ক্ষমতাধারী মানুষের মত বৈশিষ্টসম্পন্নভাবে। জেনোফিনিস সেজন্যই বলেন, 'ষাঁড়ের যদি মানুষের মতো হাত ও ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা দেব-দেবীর আকার, রূপ, চরিত্র ষাঁড়ের মতো করেই তৈরি করতো'। যাহোক, যে ধর্ম ছিল একসময় মানুষের প্রকৃতির দুর্গেয় রহস্য ব্যাখ্যা করার অন্যতম নিয়ামক, কল্পিত আশ্রয়, হতাশ মানুষের নিরাপত্তার আচ্ছাদন, সভ্যতার আলো না-পাওয়া, যুক্তি-বিবেকের সমন্বয় ঘটাতে না-পারা কতিপয় দুর্বল মানুষের অবলম্বন; সেই ধর্মই আজকের যুগে গোটা সমাজের জন্য যেন 'দানব'রূপে দেখা দিয়েছে। শোষিত মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে ক্ষমতায় টিকে রাখার স্বার্থে ধর্মকে নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর সর্বনাশা ব্যবহার আর 'বোকার স্বর্গে' বাস করা কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন (কিংবা শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী) লোকের তথাকথিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-চর্চার দ্বারা ধর্ম আজ বিরাট বিষবৃক্ষ। গোটা ধর্মটাই 'মৌলবাদ' আর 'রাজনীতি'র মিশেলে তৈরি; এই দুটি ধারণা ব্যতীত পৃথিবীতে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া বর্তমানে দুষ্কর এবং তা কোনো 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' থেকে কোনোকালে বিছিন্ন ছিল না বলেই জানা যায়।

ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই সৃষ্টি হয়েছে নানা মতভেদ, নানা বিভ্রান্তি, নানা বিদ্বেষ। নিজ নিজ ধর্মের প্রসার আর তালুক দখলের লোভ সবই একসূত্রে গাঁথা; যা মানুষে-মানুষে শুধু জিঘাংসাই বৃদ্ধি করেছে। ধর্মগুলো তাদের নিজস্ব গ্রন্থে (যেমন হিন্দুদের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মনুসহিংতা, গীতা, ইহুদিদের ওল্ডটেস্টামেন্ট, খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্ট, মুসলমানদের কোরান-হাদিস) যেসকল সদাচার-ধর্মাচারের সুনির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট বয়ান দিয়েছে, তাই আজকের যুগে ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল উৎস। ধর্মবাদীদের দৃষ্টিতে সেখান থেকে এক চুল পরিমাণ নড়বার উপায় নেই! আমরা জানি একজন মানুষের জন্মের ওপর তার নিজের কোনো হাত নেই, জন্মটা বলতে গেলে এক ধরনের 'এক্সিডেন্ট'; যেমন, যৌনসঙ্গমের সময় পিতার শরীরের প্রজননতন্ত্র থেকে প্রতিবার নির্গত বীর্যের (Semen) মধ্যে গড়ে প্রায় ২০০-৫০০ মিলিয়ন শুক্রাণু (Sperm, or spermatozoa) থাকে যা যোনি পথ দিয়ে মাতৃজঠরে প্রবেশ করে কিন্তু এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি সপ্রাণ শুক্রাণু সাতার দিয়ে মাতৃজঠরে থাকা একটি সপ্রাণ ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হতে পারে (বাকি শুক্রাণুগুলো কয়েক ঘণ্টা পরই নষ্ট হয়ে যায়) এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে ঐ সপ্রাণ 'শুক্রাণু' এবং 'ডিম্বাণু' একত্রে নিষিক্ত হয়ে ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়, ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। এ গোটা ঘটনাটিতে কোনো ঐশ্বরিক পূর্বপরিকল্পনার স্থান বা অংশগ্রহণ নেই; কারণ কোন সপ্রাণ শুক্রাণু

কোন সপ্রাণ ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবে, সেটা আগে থেকে নির্ধারণের কোনো উপায় নেই। তাই মানুষ যেহেতু তার জন্মকে নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করে না, তাহলে বলা যায় সে কোন ধর্মাবলম্বীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে কোন ধর্মীয় পরিচয় গ্রহণ করবে, সেটা সে নির্ধারণ করে না। কিন্তু জন্মের পর পিতৃপ্রদত্ত আরো অনেক কিছুর সাথে তার মতামতের তোয়াক্কা না করে শিশুকাল থেকেই ধর্মীয় পরিচয় চাপিয়ে দেওয়া হয়, অবুঝ মনের দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়[২]। এরপরও প্রায় প্রত্যেক ধর্মবাদী জোর গলায় বড়াই করে থাকেন : "শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ/স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥" অর্থাৎ স্বধর্ম যদি গুণহীনও হয় তথাপি তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে শ্রেয়; স্বধর্মে মৃত্যুও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কর্মযোগ, তৃতীয় অধ্যায়, ৩৫নং শ্লোক)। আসলে প্রতিটি ধর্মই কর্তৃত্ববাদ বা প্রভুত্ববাদ (Authoritarianism)-এর পরিচায়ক; এখানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার কোনো সুযোগ নেই, বিশ্বাসের কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে এক ধর্মের সাথে আরেক ধর্মের রয়েছে প্রচণ্ড মতভেদ-বিভেদ-বিদ্বেষ; এগুলোকে মনীষী রাহুল সাংকৃত্যায়ণ চিহ্নিত করেছেন এভাবে[৩] : "একজন যদি পুবমুখো হয়ে পূজার বিধান দেয় তো অন্যজন পশ্চিমে। একজন মাথার চুল বড়ো রাখতে বলে তো আর-একজন দাড়ি। একজন গোঁফ রাখার পক্ষে তো অন্যজন বিপক্ষে। একজন পশুর কণ্ঠনালী কাটার নিয়মের কথা বলে তো অন্যজন মুণ্ডচ্ছেদ করতে বলে। একজন জামার গলা ডানদিকে রাখে তো অন্যজন বাঁ-দিকে। একজনের যদি এঁটোকাঁটার বাছ বিচার না থাকে তো অন্য জনের নিজের জাতের মধ্যেও তেরো হাড়ি। একজন পৃথিবীতে শুধু খোদার নাম ছাড়া আর কিছু থাকতে দিতে রাজি নয় তো আর-একজনের দেবতার সংখ্যা অগণিত। একজন গো-রক্ষার জন্য জান দিতে রাজি তো অন্য জনের কাছে গো কোরবানি অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।" 'বাংলার সক্রেটিস' অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ তাঁর প্রবচনগুচ্ছে বলেছিলেন[৪] :

> "হিন্দুরা মূর্তিপূজারী; মুসলমানরা ভাবমূর্তিপূজারী। মূর্তিপূজা নির্বুদ্ধিতা; আর ভাবমূর্তিপূজা ভয়াবহ।"

অধ্যাপক আজাদ অধুনা মুসমানদের ভাবমূর্তিপূজারী হিসেবে অভিহিত করলেও আরো অনেক আগে আরবের (উত্তর সিরিয়া) অন্ধকবি আবু-আল-আলা আল মারি (৯৭৩-১০৫৭) মুসলমানদের হজের সময় কাবা শরিফকে বাঁ দিকে রেখে ডাইনে থেকে বাঁয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করা, কালো পাথরে চুম্বন বা মাথা নোয়ানো, মিনাতে 'শয়তান' লক্ষ্য করে পাথর মারা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে ইসলামের (মূলত মুসলমানদের) 'পৌত্তলিক ভ্রমণ' হিসেবেই উল্লেখ করেছেন[৫] :

> People come from far corners of the land
> to throw pebbles (at the Satan) and to kiss the (black) stone.
> How strange are the things they say!
> Is all mankind becoming blind to truth?
> * * *
> O Fools, awake! The rites ye sacred hold
> Are but a cheat contrived by men of old
> Who lusted after wealth and gained their lust
> And died in baseness—and their law is dust

ইরানি সুফিবাদী কবি জালালউদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩) 'ইসলামের প্যাগান বৈশিষ্ট্য'কে চিহ্নিত করে রসাত্মক ভঙ্গিতে বলেছিলেন[৬] :

> "I search for the way, but not the way to the Ka'ba and the temple. For I see in the former a troop of idolaters and in the latter a band of self-worshippers."

---

[২] প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স বুদ্ধিশুদ্ধি হবার আগেই পৈত্রিক ধর্মকে জোর করে শিশুদের ঘারের উপর চাপিয়ে দেয়াকে এক ধরণের 'শিশু নির্যাতন' বা 'চাইল্ড এবিউজ' হিসবে অভিহিত করেছেন। তিনি তার সাম্প্রতিক গ্রন্থ God Delusion এর Childhood, Abuse and Religion অধ্যায়ে এ নিয়ে বিষদ ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'Even without physical abduction, isn't it always a form of child abuse to level children as possessors of belief that they are too young to thought about?' (Richard Dawkins, God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt , 2006, pp 315)

[৩] রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, *তোমার ক্ষয়*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০।

[৪] হুমায়ুন আজাদ, *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২২।

[৫] Ali Dasti, *Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*, London, 1985, Page 94 এবং Ibn Warraq, *Why I am not a Muslim*, Prometheus Books, New York, U.S.A., 1995, Page 35.

[৬] Ali Dasti, Ibid, Page 1; the internet version of English translation can be read at: http://ali-dasti-23-years.tripod.com

যাহোক, ধর্ম কিংবা ধর্মবাদীদের কাছে একজন ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতার মূল্য অত্যন্ত গৌণ; গুরুতর গর্হিত কাজ! গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা তো ধর্মবাদীদের কাছে ঈশ্বরদ্রোহের সমতুল্য। আজকের যুগেও স্বাধীনতার সংজ্ঞা এখানে নির্ধারিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয় কতিপয় প্রাগৈতিহাসিককালের ধ্যান-ধারণাকে অবলম্বন করে বসে থাকা অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মোল্লা-পুরোহিত দ্বারা। ধর্মীয় পাণ্ডারা একজন সাধারণ ব্যক্তির নিজস্ব বোধ-অনুভূতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে প্রতিনিয়ত, চাপিয়ে দিতে চায় নিজেদের মত। কোনো ব্যক্তির জন্মের পর থেকে কি নাম হবে, নামের শেষে পদবী কি হবে, কি কাপড় পড়বে, কাপড় কতটুকু লম্বা হবে, গোড়ালির উপর উঠবে কি উঠবে না, মাথায় তকি না টিকি দিবে, সে কি খাবে, গরু বা শূকরের মাংস খাবে কি-না, সে কাকে বিয়ে করবে, কিভাবে করবে, কোন্ জাত-গোত্র-বর্ণের সাথে আত্মীয়তা হবে, তার সন্তানকে মসজিদ না মন্দিরে পাঠাবে, মারা গেলে সৎকার কিভাবে হবে, কবর না আগুনে পোড়ানো হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত নির্দেশই ধর্মবাদীদের কাছে একমাত্র অনুসরণ ও অনুকরণের বিষয়; এর বাইরে কোনো ভিন্নমত কোনোভাবেই বরদাশ্‌ত যোগ্য নয়।

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোমান দার্শনিক-রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত লুসিয়াস আনায়েউস সেনেকা (৪ খ্রিস্টপূর্ব-৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ধর্মের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন এভাবে : "সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম সত্য বলে বিবেচিত, জ্ঞানীর কাছে মিথ্যে আর শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা ফায়দা লুটবার হাতিয়ার।" লক্ষ্য করুন, সেনেকার এই বক্তব্য এখনো কতোটা প্রাসঙ্গিক! শুধু রোমান সম্রাট কেন, আমাদের প্রাচীন ভারতের লোকায়ত দার্শনিক চার্বাকবাদীরা প্রকাশ্যেই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা প্রচারিত ঈশ্বর-স্বর্গ-নরক-আত্মা-পাপ-পূন্য-যজ্ঞ ইত্যাদির বিরোধিতা করে বলতেন[৭] :

> "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ/নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥"
> মানে হচ্ছে, "স্বর্গ বলে কিছু নেই; অপবর্গ বা মুক্তি বলেও নয়, পরলোকগামী আত্মা বলেও নয়। বর্ণাশ্রম-বিহিত ক্রিয়াকর্মও নেহাতই নিষ্ফল।"

তারা আরো বলতেন : "যাদের না-আছে বুদ্ধি, না খেটে খাবার মুরোদ, তাদের জীবিকা হিসাবেই বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তিন বেদ, সন্ন্যাসীদের ত্রিদণ্ড, গায়ে ভস্মলেপন প্রভৃতি ব্যবস্থা; চোরেরাই মাংস খাবার মতলবে যজ্ঞে পশুবলির বিধান দিয়েছেন; ব্রাহ্মণদের জীবিকা হিসেবেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে (শ্রাদ্ধাদি) প্রেতকার্য বিহিত হয়েছে। তাছাড়া এসবের আর কোনো উপযোগিতা নেই। যারা তিনবেদ রচনা করছেন তাঁরা নেহাতই ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর। জর্ফরীতুর্ফরী (প্রভৃতি অর্থহীন বেদমন্ত্র) ধূর্ত পণ্ডিতদের বাক্যমাত্র।" বৈদিক ধর্ম ও ব্রাহ্মণ সম্পর্কে চার্বাকবাদীদের এরকম চাঁছাছোলা সমালোচনার কারণে আমরা রামায়ণ-মহাভারতে পাই চার্বাকদের 'রাক্ষস', 'দুর্বৃত্ত', 'কূটকৌশলী' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করার কথা; তাদের বইপত্র পুড়িয়ে ফেলা, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা, চার্বাকবাদীদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয়-সমালোচনাকে কী নির্দয়ভাবে দলন, দমন পেষণ করে আসা হয়েছে। এসময় ঈশ্বরের মিষ্টি মিষ্টি ছেলে-ভুলানো কথা কোনো কাজে আসে না। যাহোক, রোমান সম্রাট সেনেকার বক্তব্য থেকে আরও স্পষ্টভাবে খোলাখুলি বলেছেন (হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের) কুরু-পাণ্ডবের গুরু ভীষ্ম; তিনি বলেন[৮] : "রাজাদের পক্ষে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানই লোকসাধারণকে বশীভূত রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায়। রাজদণ্ডের প্রভাবেই পৃথিবীতে ধর্মের প্রচার সম্ভব হয়েছে। রাজার দণ্ডনীতি না থাকলে বেদ ও সমুদয় ধর্ম এক কালে বিনষ্ট হয়ে যায়। রাজধর্মের প্রাদুর্ভাব না থাকলে কোনো মানুষই নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা রাখে না।" (মহাভারতের শান্তিপর্ব, ১২/৫৮-৫৯, ১২/৬৩)। রাজদণ্ডের সাথে ধর্মপ্রচারের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। একটু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, যেসকল ধর্ম কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে (মানে ধর্মবাদীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ণ ঘটেছে), কিংবা রাষ্ট্র (শাসক গোষ্ঠী) কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তারাই আজ প্রবল বিক্রমে বেঁচে রয়েছে; আর যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে পারেনি তাদের ইতিহাস বা বর্তমান অবস্থা জানতে আজ আমাদের মিউজিয়ামে যেতে হয়! আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আমরা এখানে খুব ছোট্ট করে হিন্দু ধর্মবাদীদের ক্ষমতায়ণের ধারাটি জেনে নেই : এখন পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞান থেকে জানা যায়, হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক আর্যরা মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব পনেরশো শতাব্দীর দিকেই ইরান-আফগানিস্তান অঞ্চল থেকে ভারতীয় অঞ্চলে আসে এবং আস্তে আস্তে এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী ভূমিপুত্র অনার্যদের (শূদ্র) হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে শুরু করে, একসময় তারা সফল হয়। প্রচার করতে শুরু করে বেদভিত্তিক বৈদিক ধর্ম। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দিকে সম্রাট অশোক (২৬৪-২৩৮ খ্রিস্টপূর্ব) রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি ঘটলে, বৈদিক ধর্মের সাথে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যা হোক মৌর্য বংশের পতন, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সুঙ্গ বংশের অভ্যুত্থান এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী সাতবাহন এবং গুপ্ত রাজাদের রাষ্ট্রীয় সমর্থন-পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ত্বরান্বিত হয়। এরপর নানা সময়ে সেনরাজারা হিন্দুধর্মের গাছে পানি-সার দিয়ে চাষাবাদ করেছেন। কিন্তু যখন রাষ্ট্রশক্তি পুনরায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী

[৭] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

[৮] জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্মের ভবিষ্যৎ*, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১০।

আফগান-তুর্কিদের হাতে চলে যায় তখন আবার হিন্দু ধর্মটি অস্তিত্বের সংকটে ভোগতে শুরু করে। পরে ব্রিটিশরা এ অঞ্চলে মুসলমানদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে কিছুটা হলেও প্রাণশক্তি ফিরে পায় ব্রাহ্মণ্যবাদের দোসর এই ধর্ম। বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত ভারতে প্রকাশ্যে এবং পরোক্ষভাবে সুবিধা পেয়ে চলছে হিন্দু ধর্মটি!

ধর্ম আর ধর্মবাদীদের কারবার নিয়ে 'মানবজাতির বিবেক' ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) উক্তি প্রণিধানযোগ্য। ভলতেয়ার বলেন[৯] :

> The first clergyman was the first sly rogue that met the first fool...

অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম পুরোহিত বা মোল্লা ব্যক্তিটি হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ধূর্ত বাটপাড়, যার মোলাকাত হয়েছিল প্রথম বোকা-নির্বোর্ধ ব্যক্তিটির সঙ্গে; বাটপাড় ব্যক্তিটি নির্বোধ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে-পাড়িয়ে নিজের অনুগত প্রথম ভক্ত বানিয়ে ফেলে। ক্রমে পুরোহিত তথা ধর্মযাজকেরা নতুন নতুন সুযোগ বুঝলো—সৃষ্টি হল পুরোহিততন্ত্র (Priestcraft); তারা সহজসরল মানুষের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতা ও ডিভিনিটি দাবি করলো। দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা উৎপাদনশ্রম থেকে রেহাই পেল। পুরুষ মৌমাছি (Drone) মধুমক্ষিকার মতো তারা সাধারণের কষ্টার্জিত সম্পদে শুয়ে-বসে ভোগ করতে লাগলো। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস, দুর্বলতা, বিশ্বাসপ্রবণতা, সরলতা ইত্যাদিকে হাতিয়ার করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যুগে যুগে অনাচার, রক্তপাত, ডাইনি শিকার, শোষণ, নিপীড়ণ প্রভৃতির মহড়া চালিয়ে আসছে তথাকথিত ডিভিনিটির দাবিদার ডিভিন পুরোহিতেরা।" খ্রিস্টধর্ম, পুরোহিত শ্রেণী ও রোমান ক্যাথলিক চার্চকে লক্ষ্য করে ভলতেয়ারের একটি বিখ্যাত স্লোগান ছিল এরকম : "এই কুখ্যাত বস্তুটাকে গুড়িয়ে দাও!" (Crush the Infamy!)। শুধু ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার কেন, পৃথিবীর অনেক-অনেক দার্শনিক, চিন্তাবিদ, মনীষী, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণে চাঁছাছোলা ভাষায় 'ধর্ম'-কে আক্রমণ করেছন। ইউরোপের অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানবাদী আন্দোলনের (Enlightenment) তাত্ত্বিক নেতা Baran D Holbach (১৭২৩-১৭৮৯) বলেছিলেন :

> "We find in all the religions of the earth, 'a God of armies', 'a jealous God', 'an avenging God', 'a destroying God', 'a God who is pleased with Carnage'..."

জ্ঞানবাদী আন্দোলনের অসীম সাহসী নেতা ও পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ডেনিস দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪) পোপ তৃতীয় ক্লেমেন্ট এবং রাষ্ট্রের প্রবল বাধা অতিক্রম করে ষোল খণ্ডে পৃথিবীর প্রথম বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপেডিয়ার সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। দিদেরো মনে করতেন[১০] : "ধর্মের প্রতি যেকোনো ধরনের সহানুভূতি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে আপোষেরই নামান্তর।" শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির দিশারী-বস্তুবাদী দার্শনিক মনীষী কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ইউরোপের ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) আইনের দর্শনের পর্যালোচনার ভূমিকাতে বলেন[১১] :

> "ধর্ম হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয় ঠিক যেমন সেটা হল আত্মবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হল জনগণের জন্য আফিম। মানুষের মায়াময় সুখ হিসেবে ধর্মকে লোপ করাটা হল মানষের প্রকৃত সুখের দাবি করা। বিদ্যমান হালচাল সম্বন্ধে মোহ পরিত্যাগ করার দাবিটা হল যে-হালচালে মোহ আবশ্যক, সেটাকে পরিত্যাগ করার দাবি। তাই ধর্মের সমালোচনা হল ধর্ম যার জ্যোতির্মণ্ডল সেই অশ্রু উপত্যকার (এই পার্থিব জীবনের) সমালোচনার সূত্রপাত।"

'ঈশ্বর মৃত' (God is dead) ঘোষণাকারী হিসেবে খ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রাহিদ্‌রিশ ভিল্‌হেলম নীট্‌শে (১৮৪৪-১৯০০) বলেছিলেন : "যারই ধমনীতে ধর্মতাত্ত্বিকের রক্ত আছে তিনি একেবারে প্রথম থেকেই সবকিছুর প্রতি ভ্রান্ত ও অসৎ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।... ধর্মতাত্ত্বিক যাকে সত্য বলে মনে করেন তা অবশ্যই মিথ্যা; এটিই সত্যতা নির্ণয়ের একটি মাপকাঠি।" এলবার্ট হিউবার্ট (১৮৫৯-১৯১৫) বলেন : "ধর্মতত্ত্ব হলো কিছু লোকের একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা, যে বিষয়টি তাঁরা বোঝেন না। সত্য কথা বলা ধর্মতাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্য নয়, ধর্মানুসারীদের খুশী করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।" (দ্রষ্টব্য : *পার্থিব জগৎ*, পৃষ্ঠা সতের)। আলবেয়ার কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০) তাঁর 'The Rebel' গ্রন্থে বলেছিলেন : "One must learn to live and to die and in order to be a man, to

[৯] শফিকুর রহমান, *পার্থিব জগৎ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১২৭।

[১০] জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্মের ভবিষ্যৎ*, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৬১।

[১১] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

refuse to be a God." (অর্থাৎ একজনকে বাঁচা এবং মরার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং মানুষের মতো বাঁচতে হলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতেই হবে।)। ভারতীয় বস্তুবাদী পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ (১৮৯৩-১৯৬৩) 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' সম্পর্কে বলেন[১২] :

> "অজ্ঞানতার অপর নাম ঈশ্বর। আমরা আমাদের অজ্ঞানতাকে স্বীকার করতে লজ্জা পাই এবং তার জন্য বেশ ভারী গোছের একটা নামের আড়ালে আত্মগোপন করি। সেই ভারী গোছের আড়ালটির নামই ঈশ্বর। ঈশ্বর বিশ্বাসের আরও একটি কারণ হল বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অপারগতা ও অসহায়ত্ব। ...অজ্ঞানতা আর অসহায়ত্ব ছাড়া আর কোনো কারণ যদি ঈশ্বর বিশ্বাসের পিছনে থেকে থাকে তা হল ধনী ও ধূর্ত লোকদের নিজ স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস। সমাজে চলতে থাকা সহস্র অন্যায় অবিচারকে বৈধতা দেবার জন্য তারা ঈশ্বরের অজুহাতকে সামনে এনে রেখেছে। ...ঈশ্বর বিশ্বাস এবং একটি সহজ সরল ছোটো শিশুর নিজস্ব বিশ্বাস, বস্তুত একই। পার্থক্য শুধু এইটুকুই ছোটো শিশুটির যুক্তি ভাণ্ডার, উদাহরণ ইত্যাদির পরিমাণ খুবই সামান্য, আর বড়োদের ওগুলো খানিকটা বিকশিত।"

সোনার পাথর বাটি বা অশ্বডিম্ব যেমন অসম্ভব একটি বিষয়, তেমনি অসম্ভব উৎপীড়ণের ব্রহ্মাস্ত্র ধর্মকে টিকিয়ে রেখে আর তোষণ করে জগতে কল্যাণ কায়েমের চেষ্টা। বর্তমান সময়ে 'ধর্ম' নামক সিস্টেমটি এ সমাজের জন্য মঙ্গলময়, কল্যাণকর ইত্যাদি মিথ্যে ধারণার খোলস খোলসা করে দেওয়ার জন্যই 'বোকার স্বর্গ' নামটি বেছে নেওয়া হয়েছে। যদিও 'বোকার স্বর্গ' ধর্ম নামক ব্যবস্থার কারণেই কোটি কোটি মানুষ কী রকম নির্বিবেক, অপরিণামদর্শী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে যায় তার ভুড়িভুড়ি উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই ঘটে চলছে সুদীর্ঘকাল ধরেই। গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীরা এ ব্যাপারে গোস্বা না করলে দু-একটি উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি : হয়তো অনেকেই জানেন খ্রিস্টানরা চতুর্থ শতাব্দীর দিকে প্রাচীন প্যাগান (Pagan) জার্মানদের 'সভ্য' করার নামে, ধর্ম প্রচারের নামে গণহত্যা চালিয়েছিল বিভৎস পন্থায়। ঐ সময় কোনো কোনো প্যাগান জার্মান গোষ্ঠী ওক গাছের পূজা করতো। যদি ওক গাছ 'সভ্য হওয়া' জার্মানদের পুরানো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, আবার তাদের পথভ্রষ্ট করে ফেলে, সেজন্য খ্রিস্টধর্মাবলম্বী রোমান সৈন্যরা জার্মানিতে প্যাগানদের হত্যা করার পাশাপাশি একটিও ওক গাছ আস্ত রাখেনি, কেটে সব সাফ করে দিয়েছিল! ধর্ম নামক ব্যবস্থা বলবৎ থাকার কারণে কিংবা ধর্মে বিশ্বাস রাখার কারণেই তো (শিক্ষিত-অশিক্ষিত) হিন্দুরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি-কাণ্ডজ্ঞান 'সিন্ধুকে তালা মেরে দিয়ে' সাপের পূজা করে (মনসা দেবী), নদীর পূজা করে (গঙ্গা), গরুকে পূজা করে, গরুকে নিজের মায়ের সঙ্গে তুলনা করে, গরুর মলমূত্র দিয়ে ঘরবাড়িসহ নিজেদের পবিত্র করে, বাঁদরের (হনুমান) পূজা করে! মুসলিমরা অন্য ধর্মের উপাসনার রীতিনীতিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা-সমালোচনা করলেও নিজেদের বোধবুদ্ধি, জ্ঞানকে 'বগলদাবা' করে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি, কোরান শরিফের বাণী (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ১৫৮, ১৮৯, ১৯৬-২০৩; সুরা ৩, আল ইমরান, আয়াত ৯৭; সুরা ২২, হজ, আয়াত ২৭ ইত্যাদি)[১৩] অনুসরণ করে পরম পুণ্যের কাজ ভেবে প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে সৌদি আরবে গিয়ে হজের সময় কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে সাতবার প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ)[১৪] করে, বহু শতাব্দী প্রাচীন 'হাজর-উল-আসওয়াদ' বা কালো পাথরে (ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, এটি একটি উল্কাপিণ্ড) আধ্যাত্মিক উল্লাস লাভের জন্য হুমড়ি খেয়ে গিয়ে চুমো খায়; হাজিদের কাছে এতো শুধু পাথরে চুমু খাওয়া নয়, নবী মুহাম্মদের হস্ত মুবারকেই চুমু খাওয়া! যদিও খলিফা ওমরের একটি বক্তব্য অনেক মুসলমানের জানা আছে; ওমর (রাঃ) একদা কাবা ঘরের ঐ কালো পাথরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

> "আমি জানি তুমি একটা পাথর ছাড়া কিছুই নও, মানুষকে সাহায্য করা বা ক্ষতি করার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। যদি আমি আল্লাহর রসুলকে না দেখতাম তোমায় চুম্বন করতে, আমি তোমাকে কখনো চুম্বন করতাম না; বরং কাবাঘর হতে বহিষ্কৃত করে তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করতাম।"[১৫] (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ২, বুক ২৬, নম্বর ৬৬৭)।

---

[১২] রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, *তোমার ক্ষয়*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩৫।

[১৩] মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম এবং অন্যান্য, *ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৭৭-২১৪।

[১৪] হজ বা কাবা ঘর 'তাওয়াফ' করা নিয়ে অনেক আগে থেকেই মুসলমান পণ্ডিত-গুণীজনের ভিন্নমত রয়েছে। তাপসী রাবেয়া বসরী (মৃত ৮০১) হজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : "আমি শুধু ইট আর একটি ভবন দেখেছি। এর থেকে আমি কি পুণ্য অর্জন করবো?" বায়েজিদ বোস্তামি (মৃত ৮৭৪) হজে যাবার পূর্বে এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন, "আমাকে ঘিরে সাতবার চক্কর দাও। কাবাতে চক্কর দেয়া আর আমাকে চক্কর দেয়া একই কথা, সুবিধা হলো তোমার সময় বাঁচবে আর দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবে।" বায়েজিদ তাই করে বাড়ি ফিরে গেলেন। (দ্রষ্টব্য : *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, পৃষ্ঠা ২৩৪)।

[১৫] বেঞ্জামিন ওয়াকার (সা'দ উল্লাহ্ অনূদিত), *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৪১। এবং আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৬।

এই তো বছর কয়েক আগে (২০০৫ সালে) 'শয়তান'কে মারতে গিয়ে অর্ধশতাধিক বাংলাদেশিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তিনশতাধিক হাজি মারা গেছেন!

ইসলাম কি পৌত্তলিকতা মুক্ত?

ইসলামের অনুসারীরা সোচ্চারে দাবি করেন যে, তাদের ধর্ম পৌত্তলিক রীতি নীতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত। অথচ একটু চোখ মেলে তাকালেই বোঝা যায়ু এ দাবীটি আসলে একেবারেই মিথ্যা। আল্লাহ নিজেই কোরানের বিভিন্ন সুরায় চন্দ্র, সূর্য, গোধুলী আর নক্ষত্রের নামে শপথ করেছেন (দেখুন, ১১৩ : ১, ৮৪ : ১৬-১৯ ইত্যাদি), বেশ কিছু সুরাতে দেখতে পাই ডুমুর, জলপাই, সিনাই পর্বত, নিরাপদ নগরী (৯৫:৩), বাতাসের (৭৭: ১), দ্রুতগামী ঘোড়ার (১০০: ১-৫) শপথ নেওয়া হয়েছে। জড় পদার্থ এবং নানা জীবজন্তুর নামে শপথ করার ব্যাপারটা পুরোটাই আসলে প্যাগান রীতি থেকে ধার করা। ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হবার অনেক আগে থেকেই প্যাগানরা সূর্য, চন্দ্র কিংবা নক্ষত্রের নামে শপথ করতো কিংবা কালো পাথরের চারিদিকে সাতবার ঘুরতো। প্যাগানদের এই পৌত্তলিকতার রীতি অব্যাহত রাখার পরামর্শ আল্লাহই দিয়েছেন কোরানে (২ : ১৫৮) :

> নি:সন্দেহে সাফা ও মারওয়া (মক্কার দুই পর্বত) আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই।

কোরানের অনেক সুরাতেই তাই এখনো প্যাগান দেবদেবীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরানে বলেন (৫৩ : ১৯-২০)

> তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?

ধর্মের ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি, একশ্বেরবাদী ধর্মগুলো সংগঠিত এবং বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে মানুষ বিভিন্নভাবে প্রাক-ধর্মীয় 'টোটেম-প্রথা' (Totemism) অনুসরণ করতো। টোটেম মানে সাধারণভাবে বিশেষ প্রজাতির প্রাণী; তবে বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং জড়বস্তুকেও টোটেম হিসেবে পূজা করা হয়; যেমন হিন্দুরা নির্দিষ্ট ধরনের কালো রঙের পাথরকে 'শিবলিঙ্গ' বানিয়ে পূজা করে। ইসলামপূর্ব আরবে সার্বিয়েনরা ছিল নক্ষত্র পূজারী, হিমিয়ারবাসীরা সূর্যের উপাসনা করতো, আসাদ ও কিয়ানা গোত্রের লোকেরা 'আল্লাত' দেবী হিসেবে চন্দ্রের, সাথে 'মানাত' দেবী হিসেবে ভেনাসের (শুক্র গ্রহ) ও 'উজ্জা' দেবী হিসেবে সাইরিয়াসের (লুব্ধক নক্ষত্র) পূজা করতো। কোরানে আমরা দেখি, সুরা নজমে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, "আল্লাহ সাইরিয়াসের প্রভু" (সুরা ৫৩, নজ্‌ম, আয়াত ৪৯)। কোরানের সুরার অনেকগুলির নামকরণ হয়েছে প্যাগান দেব-দেবীর নামে, যেমন : সুরা ৮৬ 'তারিকা' নক্ষত্র দেবতার নাম, সুরা ১১০ 'নসর' প্রাচীন আরব্যগোষ্ঠী হিমিয়ারদের দেবতার নাম, সুরা ৯১ 'শামস্' মধ্যপ্রাচ্যে এক সময় ব্যাপকভাবে পূজিত সৌরদেবীর নাম। ইসলামপূর্ব আরবেও কাবা ঘরের এই পাথরকে পবিত্র মনে করা হতো, পূজা করা হতো। বর্তমানে হাজিদের কাবা শরিফে তাওয়াফের সময় পাথরে চুম্বন করা টোটেম-প্রথারই রূপান্তর মাত্র। আরবের বিখ্যাত জন্মান্ধ কবি পন্ডিত আবুল আলা আল-মারী হজ্বকে সেজন্য 'পৌত্তলিক ভ্রমণ' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন সঙ্গত কারণেই। হজের সময় হাজিরা মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন, সাদা কাপড় (ইহরাম) পরিধান করেন, মক্কার কাবা ঘর থেকে কয়েকশো গজ দূরে সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেন, মিনাতে কংক্রিটের তিনটি স্তম্ভকে 'শয়তান' বানিয়ে সাতবার করে মোট একুশটি ঢিল ছোঁড়েন। সেই ঢিলে আহত হয়ে এতোদিনে শয়তান মারা গিয়েছে কি-না জানা যায়নি, তবে শয়তানকে মারতে গিয়ে নিজেদের প্রচণ্ড অন্ধবিশ্বাস আর আবেগের আতিশয্যে সৃষ্ট হুড়োহুড়ির কারণে পদপিষ্ট হয়ে নিরীহ হাজিরা প্রায়শই মারা যান! হজ্ব ছাড়াও ইসলামে পশু কোরবানি প্রথার মূলে রয়েছে মানুষের টোটেম-প্রথার অনুসরণ। হাদিসেও আমাদের নবীজির পৌত্তলিক উপাসনার নানা প্রমাণ রয়েছে।

পশু কোরবানির কথাইবা বাদ যাবে কেন। হিন্দুরা প্রতি বছর দুর্গা পূজা-কালী পূজাতে মহাধূমধামের সাথে পাঠা বলি দিয়ে থাকেন এবং বেশিদিন আগের কথা নয়, বৃটিশ রাজত্বেই এই অঞ্চলের কিছু হিন্দু রাজা-জমিদারেরা দুই পূজাতে আয়োজন করে নরবলি দিতেন। বর্তমানে নরবলি দেওয়ার প্রথা রহিত হয়ে গেলে পূজা উপলক্ষে পাঠা বলি দেওয়া বেশ প্রচলিত। ইহুদি-খ্রিস্টান-ইসলামের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, আব্রাহাম বা ইব্রাহিম একটি স্বপ্ন দেখেই 'অন্ধের মতো' নিজের সন্তানকে কোরবানি দিতে নিয়ে যান, তবে শেষমেশ ঐশীবাণী পেয়ে সন্তানকে কোরবানি না দিয়ে একটি দুম্বাকে কোরবানি দেন! আব্রাহামের এই কর্মকে বিশ্বাস করে সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতি বছর কোরবানির ঈদে লক্ষ লক্ষ নিরীহ পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন। এতে তাদের বিন্দুমাত্র চিত্তবিচলিত হয় না, মনে কোনো সংশয় জাগে না; এ অপচয়-বাহুল্য ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। বাংলাদেশের অন্যতম লোকায়ত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর এ নিয়ে 'না বুঝের' মতো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রশ্ন তুলেছিলেন[১৬] :

> "কোরবানি প্রথার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় নয়। একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পশুর জীবন নষ্ট হইতেছে। উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে যেরূপ ভুল করা হয়, স্বপ্নের রূপককে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিলে সেইরূপ ভুল হইতে পারে না কি?... বর্তমান কোরবানি প্রথায় পশুর কোনো সম্মতি থাকে কি? একাধিক লোকে যখন একটি পশুকে চাপিয়া ধরিয়া জবেহ করেন, তখন সে দৃশ্যটি বীভৎস বা জঘন্য নয় কি? মনে করা যাক, মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এক অসুর জাতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া, তাহারা পুণ্যার্থে মহেশ্বর নামক এক দেবতার নামে জোরপূর্বক মানুষ বলি দিতে আরম্ভ করিল। তখন অসুরের খাঁড়ার (ছুরির) নীচে থাকিয়া মানুষ কি কামনা করিবে? 'মহেশ্বরবাদ ধ্বংস হউক, অসুর জাতি ধ্বংস হউক, অন্ধ বিশ্বাস দূর হউক'—ইহাই বলিবে না কি?... কোরবানি প্রথায় দেখা যায় যে, কোরবানি পশুর হয় 'আত্মত্যাগ' এবং কোরবানিদাতার হয় 'সামান্য স্বার্থত্যাগ"। দাতা যে মূল্যে পশু খরিদ করেন, তাহাও সম্পূর্ণ ত্যাগ নহে। কেননা মাংসাকারে তাহার অধিকাংশই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সামান্যই হয় দান।... বলির পশুর আত্মোৎসর্গ না মাংসোৎর্গ? মাংস তো আহার করি এবং আত্মা তো ঐশ্বরিক দান। উৎসর্গ করা হইল কি?"

কতো সাধারণ প্রশ্ন অথচ কী তার গভীরতা! নৃতত্ত্ববিদ Robertson Smith তাঁর '*Religion of The Semites*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, পশু কোরবানি প্রথার মূলে রয়েছে মানুষের টোটেম-প্রথার অনুসরণ। বিশেষ অনুষ্ঠানে বা উৎসবে টোটেম প্রাণীকে হত্যা করে তাকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করার রীতি বিভিন্ন ধর্মে বেশ প্রচলন রয়েছে। প্রাক ইসলামি আরব-সমাজেও পশু ও মানুষ কোরবানির ব্যাপক প্রচলন ছিল; কিন্তু সমাজ বিকাশের সাথে সাথে এবং সামাজিক প্রয়োজনে 'মানুষ' কোরবানির রীতি ধীরে ধীরে রহিত হয়ে গেছে তবে আদিম সংস্কৃতির কিছু কিছু অবশেষ যেমন পশু কোরবানির প্রথা এখনো টিকে রয়েছে। Samuel M. Zwemer তাঁর '*The Influence of Animism on Islam: An account of Popular Superstitions*' গ্রন্থে অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন প্রফেট মুহাম্মদ আরো কয়েকজনের সহযোগিতায় একেশ্বরবাদ চর্চার অংশ হিসেবে ইসলাম ধর্ম তৈরি এবং প্রচার করলেও সম্পূর্ণরূপে সফল হতে পারেননি; তিনি 'সময়' এবং 'পরিবেশ' দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।[১৭] ইসলাম ধর্মের প্রচুর উপাদান যেমন নামাজ পড়ার রীতি, সন্ত ান জন্মের পর আকিকা করা, শয়তান-ফেরেশতা-জীনের ধারণা, হজ, কোরবানি ইত্যাদি সর্বপ্রাণবাদী (Animist) রীতি ইসলাম পূর্ব আরবে বহুল প্রচলিত ছিল এবং এগুলো প্রফেট মুহাম্মদ দু'হাতে ইসলামে আত্তীকরণ ঘটিয়েছেন; আবার কিছু কিছু বাদও দিয়েছেন। ইসলামে প্রচলিত কোরবানী প্রথা যে আসলে ইসলাম-পূর্ব টোটেম প্রথার অনুসরণ এবং পরিবর্ধণ তা গবেষক এবং ঐতিহাসিকরা আজ নিঃসন্দেহ। আজকের যুগে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 'মডার্ণ মুসলিমেরা' অজুহাত খাড়া করেন, এই কোরবানির ফলে নাকি গরীবের মাংস খাবার চাহিদা মিটবে কিছুটা হলেও। সারা বছর খোঁজ নেই, আর বছরে একবার মাংস খেয়ে গরীবেরা শরীরের প্রোটিন-চাহিদা মিটিয়ে ফেলবে! আরো বলা যায়, মুসলিমদের রোজা কিংবা হিন্দুদের উপবাসের কথা। এ নিয়ে উভয় ধর্মাবলম্বীরা সময় পেলেই প্রায় সমার্থক 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি' প্রদান করে থাকেন। মুসলিম বুজুর্গরা আমাদের জ্ঞান দেন, বছরে একমাস দিনের বেলায় উপবাসী (রোজা) থাকা (সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকা) স্বাস্থ্যপ্রদ এবং সে কারণে ইসলাম ধর্মের এই বিধান 'বিজ্ঞানসম্মত'। এমনও প্রচার আছে যে, রোজা রাখলে নাকি পেটের আলসার (পেপটিক আলসার, যা মূলত খাদ্যগ্রহণের অনিয়ম থেকে হয়) সেরে যায়! এ ধরনের বৈজ্ঞানিক 'গুজব' সম্পর্কে ডা. মনিরুল ইসলাম বলেন[১৮] :

---

[১৬] আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৫, ২৫৭।

[১৭] The Influence Of Animism On Islam, An Account Of Popular Superstitions, Samuel M. Zwemer, F.R.G.S, http://www.answering-islam.org/Books/Zwemer/Animism/index.htm

[১৮] মনিরুল ইসলাম, *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার*, ক্যাথার্সিস পাবলিশিং, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

> "রোজাকে মোটা দাগে স্বাস্থ্যপ্রদ বলা মোটেও সঠিক নয়। মানুষের যে জৈবিক ঘড়ি (Biological Clock) থাকে, রোজার সময় তার হেরফের হয় এবং শরীরে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়, অবশ্য অধিকাংশ মানুষের শরীর এই অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। দিনের বেলায় মানুষ যখন জেগে থাকে এবং কাজ করে তখন শরীরে ক্ষয়মূলক অপচিতির (Catabolism) মাধ্যমে প্রচুর ক্যালরি (শক্তি) নির্গত হয়। এ সময় বিশেষত যারা কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের পক্ষে খাদ্য গ্রহণ না করা মোটেও স্বাস্থ্যপ্রদ নয় বরং স্বাস্থ্যহানিকর। বলা হয়, রোজার সময় খাদ্যনালী বিশ্রাম লাভ করে এবং সবল হয়ে ওঠে। এটি কোনো পরীক্ষিত ব্যাপার নয়। দীর্ঘ উপবাস (৮ ঘণ্টার উপরে) অন্ত্রের আলসার বা ঘা বাড়িয়ে তোলে। কিছু কিছু পেটের রোগে সাময়িক উপবাস চিকিৎসার একটি অঙ্গ কিন্তু সে সব রোগগ্রস্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক মানুষের সাথে তুল্য নয়। এবং এদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খাদ্যপুষ্টি ও ঔষধ শিরার মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের এই 'ধর্মীয়মূঢ়তা'কে উদ্দেশ্য করে *রাশিয়ার চিঠি*তে বলেছিলেন : "যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন ক'রে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক-না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ ক'রে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।... ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।"[১৯]

আমরা দেখেছি একটি সমাজের জনসাধারণের পক্ষে অর্থসম্পদজনিত সমস্যার সমাধান মোটেই অসম্ভব নয়। বর্তমানে পশ্চিমের অনেক দেশেই বিভিন্ন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে সেই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে; কিন্তু সমাজে ধর্ম কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা, মারামারি, সংঘাতের সমাধান আদৌ লক্ষণীয় নয়; বিজ্ঞানচেতনা ও মানবিকতাবোধের প্রসার আর ধর্মগুলো বিলীন না করা পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। ধর্মবিশ্বাস মানেই কম-বেশি পরমত অসহিষ্ণুতা, এবং তা না থাকলে নিজের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিই থাকে না। এক ধর্ম অন্য ধর্মকে শুধু ঘৃণা করে না, নিজের মধ্যেও প্রচণ্ড ঝগড়া, ফ্যাসাদ, আগ্রাসন, হত্যা, হুমকি, উন্মাদনা সৃষ্টি করে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান কেউই দাবি করতে পারবে না, তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতানৈক্য, দলাদলি, মারামারি নেই। যারা এই সত্যকে অস্বীকার করে তারা অবশ্যই প্রতারক বা জ্ঞান-পাপী, তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করতে চায় বা করছে এবং জনগণকেও রাখতে চায়। ধর্মের প্রতি মোহমুক্ত হয়ে তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় ধর্মকে যতটা মানবিক হিসেবে প্রচার করা হয় আসলে তা নয়। ধর্মটা মনুষ্যত্বের নয়, কতিপয় গোষ্ঠী-গোত্রবাসীর স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র। ধর্ম মানুষের মাঝে একতা গড়ে তোলে না, আনে বিদ্বেষ; যা যা প্রকারান্তরে রূপ নেয় উগ্র, হিংস্র, জংলী আচরণে। সত্যি বলতে কি, যে কোনো ধর্মে বিশ্বাসীরাই কম-বেশি মৌলবাদী ও ধর্মান্ধ। কোনো ধর্মই গণমানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক মুক্তির পথ দেখায়নি; করেছে কেবল শাসকগোষ্ঠীর ক্লান্তিকর তাবেদারি। 'মানব মুক্তি'র যে ধর্মীয় ফর্মুলা দেয়া হয়ে থাকে তা কল্পিত এবং পারলৌকিক, ইহজাগতিক নয়। তাই গরীব মানুষ আরো গরীব হয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নীতি, কঠোরভাবে পালন ও অনুসরণ করেও; আর ধনী আরো ধনী হয়—ভণ্ডামির মধ্যে লালিত হয়। বিজ্ঞানের বিকাশে ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়েছে বলেই ধর্মবাদীরা মাঝেমাঝে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে মিলে-মিশে থাকার কথা ঘোষণা করে, 'যত মত তত পথ' জাতীয় বার্তা আউড়ানো, শান্তিবাদী হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করা ইত্যাদি আসলে মস্ত বড় শুভঙ্করের ফাঁকি; কারণ জগতে ধর্মের নামে, এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই অগণিত মানুষ খুন হয়েছে এবং আজও সে ধারা অব্যাহত আছে। হাজার বছর ধরে টিকি, দাড়ি আর ক্রুশের বাড়াবাড়িতে সাধারণ মানুষ বুঝে, না-বুঝে নাজেহাল। ফলে ধর্ম আজ 'মানব-সভ্যতার কলঙ্ক' হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু বিধর্মী নয়, স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করে এতো বিভেদ আর বিষ অন্তরে পোষণ করে একেকটা শান্তির ঝাণ্ডাধারী ধর্মগুলো; উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীর দল কোনো হিন্দু স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে 'সতী' বানাতো। ইংরেজ আমলে আইন করে এ ধর্মীয় বর্বর প্রথাকে রুখতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কানের (Kane) 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' (আট খণ্ড) গ্রন্থের 'সতী' বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায়ে বেশ কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে নারীর সতীত্ব রক্ষার ধুয়া তুলে কেবলমাত্র বাংলাতেই (যা তখন বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) ২৩৬৬ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে সতী বানানো হয়েছিল, যার মধ্যে কলকাতাতেই সতীদাহের সংখ্যা ১৮৪৫। আর ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত বাংলাতে ৮১৩৫ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে 'সতী' বানিয়েছিল ঠাকুর-পুরহিতের দল। এটা কি গণহত্যা নয়? এ কি জঘন্য-বর্বর ধর্মীয় রীতি নয়? বীভৎস ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি ইঙ্গিত করে ফরাসি গণিতবিদ-দার্শনিক Pascal বলে ছিলেন : "Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction." হিন্দু নারীরা কি স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় ওঠে সহমরণে যেতেন? মোটেই তা নয়। ঐতিহাসিকগণ জানিয়েছেন কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সদ্য বিধবা নারীকে উত্তেজক পানীয় পান

[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি*, (সম্পাদনা করুণাসিন্ধু দাস), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৪২।

করিয়ে কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য শুকিয়ে অজ্ঞান করে, অর্ধচেতন অবস্থায় স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হতো। এ বিষয়ে ভারতের অন্যতম মানবতাবাদী লেখক ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন[২০] :

> "সদ্যবিধবা নারী নববধূর মতো সাজে, তার শ্রেষ্ঠ পোষাক পরে, সিঁদুর, কাজল, ফুলমালা, চন্দন, আলতায় সুসজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে সে চিতায় ওঠে, তার স্বামীর পা দুটি বুকে আঁকড়ে ধরে কিংবা মৃতদেহকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে, এইভাবে যতক্ষণ না আগুন জ্বলে সে বিভ্রান্তির সঙ্গে অপেক্ষা করে। যদি শেষ মুহূর্তে বিচলিত হয় এবং নীতিগত, দৃশ্যগতভাবে ছন্দপতন ঘটে তাই শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে উত্তেজক পানীয় পান করায়। এমন কি পরে যখন আগুনের লেলিহান শিখা অসহনীয় হয়ে ওঠে, পানীয়র নেশা কেটে যায়, তখন যদি সেই বিধবা বিচলিত হয়ে পড়ে, 'সতী'র মহিমা ক্ষুণ্ন হবার ভয় দেখা দেয় তখন সেই শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে চেপে ধরে যদি সে চিতা থেকে নেমে আসতে চায়, প্রতিবেশী, পুরোহিত, সমাজকর্তা সকলেই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অতিমাত্রায় সাহায্য করতে চায়। তারা গান করে, ঢাক বাজায় এতো উচ্চ জয়ধ্বনি দেয় যে সতী যা কিছু বলতে চায় সবই উচ্চনাদে ঢেকে যায়।"

বর্তমানকালের তথাকথিত 'মডারেট' হিন্দুরা স্বীকার করতে চাইবেন না, অথবা (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি) অনেক হিন্দুই জানেন না তাদের ধর্মগ্রন্থে 'স্বামী মারা গেলে বিধবাকে স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়ে মরে সতী হওয়ার' সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। প্রমাণ চাই তো, দেখুন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ৭ নং ঋক (১০/১৮/৭) :

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु ।
अनश्रवो.अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयोयोनिमग्रे ॥

শ্লোকটির ইংরেজি হচ্ছে : "Let these women, whose husbands are worthy and are living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their eyes). Let these wives first step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned." অথর্ববেদে দেখি রয়েছে : "আমরা মৃতের বধু হবার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি।" (১৮/৩/১,৩)। পরাশর সংহিতায় পাই, "মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ বৎসরই স্বর্গবাস করে।" (৪:২৮)। দক্ষ সংহিতার ৪:১৮-১৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "A sati who dies on the funeral pyre of her husband enjoys an eternal bliss in heaven." (যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়)। এই দক্ষ সংহিতার পরবর্তী শ্লোকে (৫:১৬০) বলা হয়েছে, "যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে।" যেমন করে সাপুড়ে সাপকে তার গর্ত থেকে টেনে বার করে তেমনভাবে সতী তার স্বামীকে নরক থেকে আকর্ষণ করে এবং সুখে থাকে। ব্রহ্মপুরাণ বলে, "যদি স্বামীর প্রবাসে মৃত্যু হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর পাদুকা বুকে ধরে অগ্নিপ্রবেশ করা।" (দ্রষ্টব্য : *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, পৃষ্ঠা ১৪০)। মহাভারতের মৌষল পর্বে আমরা দেখি, ভগবান কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর চার স্ত্রী রুক্মিণী, রোহিণী, ভদ্রা এবং মদিরা তাঁর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। এমন কি বসুদেবের আট পত্নীও তাঁর মৃত্যুর পরে সহমরণে গিয়েছিলেন। ব্যাসস্মৃতি বলছে, চিতায় বিধবা নারী তার স্বামীর মৃতদেহে আলিঙ্গন করবেন অথবা তার মস্ত কমুণ্ডন করবেন। (২:৫৫)। ষষ্ঠশতকের বরাহমিহির তার বৃহৎসংহিতায় বলেন, "অহো নারীর প্রেম কি সুদৃঢ়, তারা স্বামীর দেহ ক্রোড়ে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে।" (৭৪:২৩)। এ কুযুক্তি শুধু বরাহমিহির কেন, আজকের একুশ শতকের কতিপয় পুরোহিত-ঠাকুর গর্বভরে ঘোষণা করেন, "নারী তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার জন্যই সহমরণে যায়; এ হিন্দু নারীর বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, মমত্ব, স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার দুর্লভ উদাহরণ।" ঠাকুর-পুরহিতের প্রচলিত ভণ্ডামিপূর্ণ বক্তব্যের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন সুকুমারী ভট্টাচার্য; তিনি বলেন :

> "বৃহৎসংহিতার যুগ থেকেই সমাজ এই অতিকথা ঘোষণা করে আসছে যে নারী তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার জন্যই সহমরণে যায়। এই মিথ্যার অবসান হওয়া উচিৎ। যদি স্বামীর প্রতি প্রেমে এক নারী আত্মহত্যা করে তবে কেন আজ পর্যন্ত কোনো স্বামী তার স্ত্রীর চিতায় আত্মহত্যা করেনি? এ তো হতে পারে না যে আজ পর্যন্ত কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসেনি। যদি সতীদাহের ভিত্তি হতো প্রেম, তবে আমরা অবশ্যই কিছু কিছু ঘটনা দেখতে পেতাম যেখানে মৃত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীও সহমরণে গেছেন। কিন্তু তা হয়নি, এ বিষয়ে কোনো শাস্ত্রীয় বিধিও নেই।

[২০] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৪৭।

> সুতরাং মূল ব্যাপার হল স্বামীর স্বার্থে স্ত্রীর সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন; আর সতীদাহ এই আজীবন নাটকেরই পঞ্চমাংকের শেষ দৃশ্য।" (দ্রষ্টব্য : *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, পৃষ্ঠা ১৪৮)।[২১]

হিন্দু ধর্মের বেদ-গীতা, মনুসংহিতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণপাঁচালি ইত্যাদির মধ্যে এতো জাতপাতের বৈষম্য, বর্ণভেদ, গোত্রবিভেদ, ধর্মভেদ, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা, নারীর প্রতি কুসংস্কার, বিরূপ ধারণা, ভয়, ঘৃণা, জংলী আইন-কানুন একই ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা করেও বৈশ্য-শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শ্রেণীবিভেদের বিপুল সমাহার আর সরব উপস্থিতি-চর্চা দেখেই হয়তো উপনিবেশিক ভারতবর্ষে বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাণপুরুষ বলে পরিচিত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও তাঁর অনুসারীরা '*Athenium*' নামক মাসিক পত্রিকায় সোচ্চারে ঘোষণা দিয়েছিলেন[২২] : "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."

ইহুদিরা অগণিত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে গলা কেটে হত্যা করেছে, আগুনে পুড়িয়েছে, তা-তো ধর্মগ্রন্থেই লিখিত আছে; খ্রিস্টানরা স্বধর্মাবলম্বী-বিধর্মী অগণিত নারীদের 'ডাইনি' ঘোষণা দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত তৌরাত শরিফের Exodus (হিজরত)-এর ২২:১৮ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, "Thou shalt not suffer a witch to live." (কোনো জাদুকারিণীকে বেঁচে থাকতে দেবে না); এবং Leviticus (লেবিয়)-এর ২০:২৭ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে "A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood shall be upon them." অর্থাৎ 'যেসব পুরুষ বা স্ত্রীলোক ভূতের মাধ্যম হয় কিংবা যারা ভূতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে তাদের শাস্তি হবে মৃত্যু। তাদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে। নিজেদের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।' জ্যাকব স্প্রেঙ্গার আমাদের হিসাব দিয়েছেন, নবী মুসার আইন হিসেবে ঘোষিত তৌরাত শরিফের এই দুই আয়াতের উপর ভিত্তি করে ইউরোপ জুড়ে কয়েকশ বছর ধরে নব্বই লক্ষ 'ভূতগ্রস্ত' নারী-পুরুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তিন থেকে চার বছরের শিশুরাও পর্যন্ত খ্রিস্টান মৌলবাদীদের নৃশংস ও বীভৎস কালো হাত থেকে রেহাই পায়নি; অভিযোগ শয়তানের সঙ্গে নাকি তাদের মিলন হয়েছে! কুমারী মাতা মেরির কোলে ছোট্ট, সুন্দর, শুভ্র, নিষ্পাপ যিশুর ছবি দ্বারা যেসব খ্রিস্টান মিশনারিজরা শান্তিবাদী-করুণাময় যিশুর রূপ তুলে ধরতে চান, তাদের গালে চপোটাঘাত করে বাইবেলে যিশুর এই উক্তি :

> "আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি এ কথা মনে করো না। আমি শান্তি দিতে আসিনি বরং আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করাতে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি।" (মথি, ১০:৩৪-৩৫)।

ব্ল্যাসফেমির (ঈশ্বর নিন্দা) কারণে যে কোনো ব্যক্তিকেই পাথর ছুড়ে হত্যার নির্দেশ দেওয়া আছে এই তৌরাত শরিফের Leviticus (লেবিয়)-এর ২৪:১৬ নম্বর শ্লোকে! বাইবেলের এসব নিষ্ঠুর, আগ্রাসী আয়াতের উপর নির্ভর করে যুগে যুগে কত যে স্বাধীন চিন্তাবিদ, লেখক, মুক্তচিন্তার অধিকারী ব্যক্তিকে নির্যাতন, বন্দীত্ব বরণ, অঙ্গচ্ছেদ, আগুনের ছেঁকা ইত্যাদির শিকার হতে হয়েছে তার কোনো ইয়াত্তা নেই।[২৩] এমন কি যে ইহুদিরা একসময় খ্রিস্টানদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল, সেই ইহুদিরাও খ্রিস্টানদের হাতে কম নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি। খ্রিস্টানদের অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়ে ইহুদিদের যাযাবরের জীবন বেঁছে নিতে হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে পোপ প্রথম লিও বাইবেল সম্পর্কে ভিন্নমতপোষণকারী স্বাধীন চিন্তাবিদদের ধরে এনে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। নবম শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এক লক্ষ ভিন্নমতাবলম্বীকে হত্যা করে, দুই লক্ষ লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। ফ্রান্সের আবেলার পীয়রকে (১০৭৯-১১৪২) ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তাঁর পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়, সব রচনা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফ্লোরেন্সের স্যা ভোনা রোলা (১৪৫২-১৪৯৮) খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন, গির্জার সংস্কার দাবি করেছিলেন; এজন্য তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারের মধ্যে জাঁতা কাঁধে তুলে দিয়ে পৈশাচিক পন্থায় নির্যাতন চালানো হয়। স্পেনের মনীষী মাইকেল সারভেন্টাস খ্রিস্টানদের 'ট্রিনিটি' (TRINITY : One God which is shared among three persons, Father, Son, and Holy Spirit) অস্বীকার করেছিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্রের অবিনশ্বরত্বকে অবিশ্বাস করেছিলেন, যার জন্য তাঁকে খোঁটায় বেঁধে শ্বাসরোধ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। যাজকতন্ত্রের নিন্দা করায় আলেকজান্ডার লেটনকে (১৫৬৮-১৬৪৯) বেত্রাঘাত করা হয়, তাঁর নাক-কান কেটে ফেলা হয়। খ্রিস্টান পোপ নবম গ্রেগরি ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয়-বিরুদ্ধবাদীদের (বাইবেল সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণকারী) খুঁজে বের করে তাদের ফাঁসিতে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে হত্যার জন্য 'ইনকুইজিশন' বা ধর্মীয় বিচার

[২১] আগ্রহীরা ড. সুকুমারী ভট্টাচার্যের বইটিসহ হিন্দু ধর্মে নারী হত্যার লোমহর্ষক কাহিনী জানতে আরো পড়ুন : *Genocide of Women in Hinduism* by Sita Agarwal

[২২] সফিউদ্দিন আহমদ, *ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৮।

[২৩] ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক, মানবাধিকার-বিরোধী, নারী-বিদ্বেষী বক্তব্য জানতে পড়ুন : The Dark Bible, Compiled by Jim Walker; the internet version can be read at : http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm

সভার প্রবর্তন করেন। এই ইনকুইজিশনের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মবিরোধী যেকোনো ব্যক্তিকে নির্যাতনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওরদানো ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) ধর্মান্ধদের হাত থেকে বাঁচতে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডে পালিয়ে বেড়াতে হয়। অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে ধর্মান্ধের দল। বৃদ্ধ গ্যালিলিও গ্যালিলিকে অত্যাচারের শিকার হতে হয়, গির্জার সামনে নতজানু হয়ে পাদ্রিদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। দার্শনিক স্পিনোজাকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমস্টারডামের সিনাগগ (ইহুদিদের ধর্মমন্দির) সমাজচ্যুত করে, নির্বাসন দেয়। বার্থোলোমিউ লির্গেটকে (১৫৭৫-১৬১১) নিজের চিন্তা প্রচারের অভিযোগে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়; ১৬১৮ সালে স্যার ওয়াল্টার রাওয়ালকেও ধর্মবিরোধিতার কারণে হত্যা করা হয়। জানা যায়, তাকে শিরোচ্ছেদ করার পর মাথাকে মমি করে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তুলুজে লুচিলিও ভানিনিকে ১৬১৯ সালে 'নাস্তিকতার' অপরাধে জিহ্বা ছিড়ে ফেলা হয়, পরে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। এদিকে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক-অনুগত-উত্তরসূরিরাও কম যাননি বিধর্মী (ইহুদি-খ্রিস্টান-অগ্নিউপাসক), ভিন্নমতাবলম্বীর ওপর অত্যাচার-জুলুম-নির্যাতন করার ক্ষেত্রে। প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) ও খলিফারা মক্কা দখলের পর থেকে খ্রিস্টান, ইহুদি, অগ্নিউপাসক জরথুস্ত্রবাদীদের (কোরানের ভাষায় 'মাজুস'; সুরা ২২, হজ, আয়াত ২৭) ওপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়ে, উৎখাত করে, নির্যাতন চালিয়ে, তাড়িয়ে দিয়ে, ধর্মান্তরিত করে, তাঁদের শিশু, নারী-পুরুষ, সহায়-সম্পত্তিসহ গোটা দেশ দখল করে নিয়েছিলেন ইসলামের ইতিহাস এর গর্বিত সাক্ষী। খ্রিস্টান ধর্মের মতো ইসলামও ধর্মত্যাগী কিংবা নিরীশ্বরবাদীদের শাস্তি হিসেবে যুগ যুগ ধরে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে আসছে। এমন কী রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক 'ইনকুইজিশন' প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই আরব-বিশ্বের ইসলামি রাষ্ট্রে এই ধরনের ব্যবস্থা (মিহনা) বহুল প্রচলিত ছিল। নবী মুহাম্মদ এবং অনুসারীরা 'মুরতাদ'-'কাফের' কিংবা বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ভীষণ কঠোর ছিলেন এবং এ ধরনের প্রচুর লোককে কঠোর হস্তে দমন করেছেন, প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। হাদিসে এরকম প্রচুর ঘটনার উল্লেখ আছে, যার মাত্র দুটি ঘটনার কথা এই মুহূর্তে উল্লেখ করছি : (ইকরিমা হতে বর্ণিত) নবী মুহাম্মদের আদেশ ছিল, কোনো মুসলমান ধর্মদ্রোহী বা ধর্মান্তরিত হলে শাস্তি হিসেবে কখনো আল্লাহর শাস্তি 'আগুনে পুড়িয়ে হত্যা' করবে না, তবে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে পারো, কিন্তু হযরত আলি কয়েকজন লোকের ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় তাদের ধর্মে ফিরে গেলে, তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন। কারণ আল্লাহর রসুলের নির্দেশ আছে কেউ যখনই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে তখনই তাকে হত্যা করবে। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫২, নম্বর ২৬০ এবং বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৮৪, নম্বর ৫৭)[২৪]। আবার একটি ইহুদি লোক ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু কিছুদিন পর সে আবার ইহুদি ধর্মে ফিরে যায়; এ খবর শুনে নবী মুহাম্মদ মুয়াদ বিন জবলকে নির্দেশ প্রদান করেন ঐ লোকটিকে হত্যা করতে। মুয়াদ বিন জবল ঐ লোকটিকে হত্যা করতে গেলে আবু মুসা 'ধর্মদ্রোহী' লোকটিকে গ্রেফতার করে হাত-পায়ে বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসেন; এরপর মুয়াদ বিন জবল ঐ লোকটিকে হত্যা করেন। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৮৪, নম্বর ৫৮ এবং বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৮৯, নম্বর ২৭১)। নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা আবু বকর ইসলাম ধর্মত্যাগী কিংবা ভিন্নমতাবলম্বীদের পুনরায় পদানত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'রিদ্দা যুদ্ধ' হিসেবে খ্যাত। নবী মুহাম্মদের জীবিত থাকাকালেই মুসাইলামা নামের এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে 'প্রফেট' ঘোষণা করেন। আবু বকর তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ৬৩৪ সালে ইয়ামামার যুদ্ধ পরিচালনা করেন। নবীর রাজত্বকালেই ইহুদিদের আরব দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, হত্যা করা হয়েছিল, দখল করা হয়েছিল তাদের সকল সম্পত্তি। খ্রিস্টান অনেক গোত্রকেই প্রাণের বিনিময়ে ধর্মান্তরিত করা হয়। খলিফা আবু বকরের চরম দমননীতির ফলে মাত্র দুই বছরের মাথাতেই সারা আরবভূমি 'ইসলামি রাষ্ট্রে' পরিণত হয়ে যায়। বাকি খলিফারা ওমর, উসমান, আলি প্রত্যেকেই তরবারির জোরে বহির্বিশ্বকে ইসলামি সাম্রাজ্যের করায়ত্ত করতে আরব মরুভূমি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েন। উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ (দ্বিতীয় ওমর বলেই খ্যাত) ৭১৭-৭২০ পর্যন্ত মাত্র তিন বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তিন বছরের ক্ষমতাকালে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সকল অমুসলিমদের জন্য 'চরম সাম্যবাদী' নীতি ঘোষণা করেন, এর কয়েকটি হচ্ছে : (১) কোনো অমুসলিম তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় যেমন গির্জা, সিনাগগ ইত্যাদি নতুন করে তৈরি করতে পারবে না, পুরাতন হয়ে গেলেও মেরামত করতে পারবে না। (২) অমুসলিমরা কোরান শরিফ পাঠ করা তো দূরের কথা, প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্মচর্চা ও প্রচার করতে পারবে না। (৩) অমুসলিমরা মুসলমানদের বাসা থেকে উঁচু বাসা তৈরি করতে পারবে না। (৪) অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় সিম্বল যেমন খ্রিস্টানদের ক্রস ইত্যাদি প্রকাশ্যে দেখাতে পারবে না। (৫) অমুসলিমরা প্রার্থনার সময় উচ্চস্বরে শব্দ করতে পারবে না, এমন কি মৃত্যুর সময় সৎকার প্রক্রিয়ায় উচ্চস্বরে কাঁদতে পারবে না। (৬) মুসলমানদের সাথে পার্থক্য করা যায় এমন পোশাক অবশ্যই অমুসলিমদের পরিধান করতে হবে। (৭) মুসলমানরা চাওয়া মাত্রই বসার জন্য অমুসলিমদের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। (৮) অমুসলিম কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তার আত্মীয়-স্বজন বাধা দিতে পারবে না। এবং অমুসলিমরা মুসলিম নারী বিয়ে করতে পারবে না, মুসলিম পুরুষ অবশ্যই অমুসলিম নারীকে বিয়ে করতে পারবে। (৯) অমুসলিমরা ওয়াইন বিক্রি করতে পারবে না। (১০) অমুসলিমরা তাদের বাড়ির দরজা অতিথি মুসলমানদের জন্য

[২৪] Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahi Bukhari Hadith*, translated in English by Dr Muhammad Muhsin Khan; the internet version can be read at: http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/bukhari/index.html

সর্বদা খোলা রাখতে হবে এবং তিনদিন পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে খাদ্য ও আশ্রয় দিতে অমুসলিমরা বাধ্য থাকিবে।[২৫] দ্বিতীয় ওমরের এই তথাকথিত 'সাম্যবাদী' রাষ্ট্রীয়নীতি পরবর্তী উত্তরসূরিরা ভালোভাবেই অক্ষুণ্ন রাখেন। এই অবস্থা অর্থাৎ অমুসলিমদের প্রতি চরম বলপ্রয়োগের নীতি চূড়ান্তরূপ লাভ করে ৮৫০ সালে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের (খলিফা মামুনের ভ্রাতুষ্পুত্র) সময়ে এসে। দমন ও ভেদনীতি, তীর্থযাত্রীদের ওপর আক্রমণ, খ্রিস্টান চার্চগুলোতে লুটপাট, ভেঙে দেওয়া অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল মুসলিম আধিপত্যের সময়ে। দশম শতাব্দীতে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। ৯৪৩ সালে মুসলিমরা রামলেহ, সিজরা এবং আসকালনের চার্চগুলো ধ্বংস করে দেয়। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমি খলিফা মুইজ জেরুজালেমের পবিত্র সেপালকার চার্চের এক অংশ আগুনে পুড়িয়ে দেন। ৯৭৫ সালে জেরুজালেমের আর্কবিশপকে বাইজেনটাইনের 'গুপ্তচর' অভিযোগে প্রকাশ্যে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলমান মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে একে অপরের মারাত্মক অবিশ্বাস-সন্দেহ-অহংবোধ-যুদ্ধাংদেহী মনোভাব 'শান্তি' আর 'সহনশীলতার' বাণীকে অতিক্রম করে বিভেদ-বিদ্বেষ-আগ্রাসন বাড়িয়ে তুলেছে; এবং ২০০১ সালের ৯/১১ এরপর পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতিতে আরো প্রচণ্ডরূপে দেখা দিচ্ছে। আগেই বলে রাখি, ইসলামের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী ব্যক্তিদের সাথে যুগে যুগে 'ইসলাম' রক্ষাকর্তাদের 'শান্তিময়' আর 'সহনশীল' আচরণের পূর্ণ কাহিনী এখনো ইসলামের ইতিহাসে অর্ধলিখিত রয়ে গেছে। কখনো বা ইসলাম-বিরোধীদের চক্রান্ত, প্রোপাগান্ডা, ইহুদি-নাসারা দালালদের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বলে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়েছে, এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কিংবা গোপন রাখা হয়েছে। এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের কি অবস্থা হয়েছিলো তা পাঠকদের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করব সামান্য ক'টি উদাহরণের সাহায্যে:

ইসলামের মূলনীতির সাথে কিছুটা ভিন্নমতপোষণকারী (কোরান শরিফ আল্লাহ প্রদত্ত নয়, মানবসৃষ্ট) মোতাজিলা দার্শনিক হাসান আল-বসরীর অন্যতম ছাত্র আল-জাআদ ইবনে দিরহামকে ৭৩৭ সালে (ভিন্নমতে ৭৪১ সালে) মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন উমাইয়া খলিফা হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ)। খলিফার আদেশ পেয়ে ইবনে দিরহামকে তৎকালীন ইরাকের গভর্নর খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কাসরী গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করেন। গভর্নর আল-কাসরী কোরবানি ঈদের দিনে ইবনে দিরহামকে জেল থেকে বের করে নিয়ে এসে বলেন, 'আজকে ইবনে দিরহামকে আমি কোরবানি দিতে চাই। সে বলে, আল্লাহ নবী ইব্রাহিমকে 'বন্ধু' হিসেবে গ্রহণ করেনি, নবী মুসার সঙ্গে কথাও বলেননি। আল-যাদ ইবনে দিরহামকে কোরবানি দিয়ে এসব বক্তব্য থেকে আল্লাহর নামকে পবিত্র করা হবে।' এরপর গভর্নর মোতাজিলা দার্শনিক দিরহামের গর্দান কেটে ফেলেন। একই ধরনের 'অপরাধের' (মুক্তচিন্তা) অভিযোগ তুলে ৭৪২ সালে দামেস্কর যুক্তিবাদী দার্শনিক গায়লান আল-দিমাশকিকে হত্যা করা হয়। ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসী খলিফা মেহদি ইবন মনসুর 'মিহনা' ধরনের একটি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন; যার কাজ ছিল খোঁজে খোঁজে ভিন্নমতাবলম্বী-কাফের-মুরতাদদেরকে শাস্তি দেওয়া। ৭৫৪ সালে ইবন আল মুকাফা প্রফেট মুহাম্মদের সমালোচনা করে একটি পুস্তক রচনা করেন, সেখানে দাবি করেন, তিনি কোরানের স্টাইল নকল করতে সক্ষম। এজন্য ইবন আল মুকাফার একটা একটা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আব্বাসিয় খলিফা আল-মাহদির শাসনামলে ইসলাম ধর্ম বাদে অন্য ধর্মের গ্রন্থ অধ্যয়ন-চর্চা ও জরথুস্ত্রবাদ আমদানির অভিযোগ তুলে অন্ধকবি বাশার ইবনে বারদকে ৭৮৪ (মতান্তরে ৭৮৭) খ্রিস্টাব্দের দিকে বাতিহা জলাভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়। আরেক আব্বাসিয় খলিফা আল হাদি ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় এসে মোল্লা-মৌলভির সহায়তায় বাগদাদে পাঁচ হাজার ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীকে হত্যা করেন 'আল্লাহ', 'মুহাম্মদ' ও 'ইসলাম'-এর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য! এতো নির্যাতন-নিপীড়ণ আর অত্যাচারের খড়গ চালানোর পরও ইসলামের মধ্যে যে সামান্য সময়ের জন্য যুক্তিবাদ আর মুক্তচিন্তার আলোকছটা দেখা গিয়েছিল তা হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে যায় মোতাজিলাদের পৃষ্ঠপোষক আব্বাসিয়া খলিফা মামুনের (৮১৩-৮৩৩) 'অদূরদর্শী' রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে; তিনি ৮৩৩ সালে 'মিহনা' (Mihna) নামের তদন্তকারী বিচার সভা গঠন করে বিরুদ্ধমতকে দমন করার প্রথম সুসম্বদ্ধ বিচারব্যবস্থা (Inquisition) এবং বিরুদ্ধ মতাদর্শকে খতম করার প্রথম বিধিবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। যে মোতাজিলারা এতোদিনের গৎবাঁধা ইসলামি চিন্তার বাইরে এসে বৈশ্বিক জ্ঞান মূলত গ্রিকদের কাছ থেকে জগৎ-জীবন-দর্শন সম্পর্কে নবচেতনা লাভ করার কারণে মোল্লা-মৌলভী-শাষকগোষ্ঠীর

[২৫] এই ধরনের 'ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী' শুধু এমন নয় যে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগের কয়েকজন ইসলামিক সাম্রাজ্যের খলিফাদের কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; আশ্চর্যের বিষয় এই একবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক বিশ্বেও আমরা একই প্রচেষ্টা গ্রহণের মানসিকতা দেখতে পাই। Mervyn Hiskett (১৯২০-১৯৯৪) তাঁর '*Some to Mecca Turn to Pray: Islamic Values in the Modern World*' গ্রন্থে (Claridge Press, London, 1993, page 245-246) জানিয়েছেন ১৯৮৯ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে তুরস্কের "*2000' ne Dogru*" পত্রিকায় ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের লাহোরে 'ইসলামিক এ্যালায়েন্স' নামক সংস্থা দ্বারা আয়োজিত একটি কনফারেন্সের খবর বেড়িয়েছে। কনফারেন্সে গৃহীত মূলনীতির সারসংক্ষেপ হচ্ছে : "The Countries of the Middle East should be fully Islamised by the year 2000 and a large and powerfull Islamic Republic established across the Middle East. This would involve the forced conversion or removal of all non-muslim minorities from the region, in particular the Assyrians, the Chaldeans and the Armenians. The state of Isreal should also be removed. Billions of dollars should be invested in the plan. The various Churches of the region should either be bought out or taken over by force." পত্রিকাটির ভাষ্য মতে, পরবর্তী সময়ে একই মূলনীতিকে সামনে রেখে নাইজেরিয়াসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশ যেমন জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ডে আরো কিছু ইসলামি সংস্থা এই ধরনের 'কনফারেন্স' আয়োজন করেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলোর কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জোর দাবি জানিয়েছে।

রোষের শিকার হয়েছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, সেই মোতাজিলাদের আদর্শে প্রভাবিত খলিফা মামুন ক্ষমতায় থাকাকালে মোতাজিলা দর্শনকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং 'মোতাজিলাবিরোধী'দের খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের জন্য 'মিহনা' অফিস সফলভাবেই ব্যবহার করেন।[২৬] আহমদ ইবনে হাম্বল ছিলেন মিহনার প্রথম শিকার। তিনি মোতাজিলা নীতিতে একমত ছিলেন না বলে চাবুক মারা হয়, বন্দী করে রাখা হয়। '*আরব জাতির ইতিহাস*' গ্রন্থের রচয়িতা ফিলিপ কে. হিট্টি 'মিহনা' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে : "ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, মুক্তচিন্তার সমর্থনে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেটাই পরে চিন্তার স্বাধীনতা দমনের এক মারাত্মক হাতিয়ার হয়ে উঠল।" (দ্রষ্টব্য : *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৪১৯)। খলিফা মামুনের পরবর্তী দুই উত্তরসূরির (মামুনের ছোট ভাই খলিফা আল-মুতাসিম এবং ভাইয়ের ছেলে আল-ওয়াসিফ) আমলেও রক্ষণশীল আদর্শের অনুগামীদের ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। কিন্তু খলিফা মামুনের ভাইপো (মুতাসিমের ছোট ছেলে) আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনকালে এসে ৮৪৮ থেকে ৮৫০ সালের দিকে রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে মোতাজিলা দর্শন থেকে সমর্থন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, পুরানো রক্ষণশীল মতবাদকেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শুরু হয় আবার মোতাজিলা অনুসারীদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন। ধর্মান্ধ খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে পারসিয়ানদের বাইরে একমাত্র আরব বংশোদ্ভূত উজ্জ্বল দার্শনিক আল কিন্দিকে মোতাজিলা মত ধারণের জন্য প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়, তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরি আল-কিন্দিয়াকে করা হয় বাজেয়াপ্ত। মরমী ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী মনসুর আল-হাল্লাজ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সাথে আল্লাহর আধ্যাত্মিক মিলন হয়েছে; তিনি এবং আল্লাহ অভিন্ন। এই 'অপরাধে' মনসুর আল-হাল্লাজকে ৯২২ সালে মোল্লারা নির্দয়ভাবে পিটিয়ে শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ৯৩৪ সালের দিকে শিয়া রহস্যবাদী নেতা শালমাযানীর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, কারণ তিনি প্রচার করেছিলেন, 'মুসা এবং মুহাম্মদ দুজনই প্রতারক। মুসাকে হারুন যে মিশন দিয়েছিলেন, তার সাথে মুসা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আর মুহাম্মদকে আলি যে মিশন দিয়েছিলেন, তার সাথে মুহাম্মদ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।' ৯৩৭ সালে জন্মান্ধ কবি রুদাকীকে ফতোয়া দিয়ে বহিষ্কার করা হয়। ১১৯১ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে সুফিবাদের প্রতি অনুরক্ত শিহাবুদ্দিন ইয়াহিয়া সুহরাওয়ার্দি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস অস্বীকার করার কারণে রাজা সালাহুদ্দিন এবং তাঁর সন্তান আল-মালিক আল-জাহিরের নির্দেশে হত্যা করা হয়। একই সালে পার্সিয়ান কবি লেখক আব্দুল ফুতুহ ইসলাম ধর্মের প্রচলিত মতের বাইরে সর্বেশ্বরবাদ প্রকাশ করার কারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের অনুসারী, আন্দালুসিয়ান দার্শনিক, (ফরাসি লেখক আর্নেস্ট রেনান যাকে 'মুক্তচিন্তার জনক' বলে অভিহিত করেছেন) আবু রুশদকে (মৃত ১১৯৮) গ্যালিলিও গ্যালিলির মতো 'ধর্মবিরোধী' ঘোষণা করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে মোল্লার দল, খলিফা আবু ইউসুফের নির্দেশে তাঁর রচনাবলী আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়, বিচারের নামে প্রহসন করে তওবা করানো হয়েছে। ইরানের শ্রেষ্ঠতম সুফিবাদী কবি জালালউদ্দিন রুমিকে (১২০৭-১২৭৩) ক্ষমতাসীন মোল্লা-মৌলভী ধর্মমাতালের দল 'কাফের' ফতোয়া দিয়ে নানা সময়ে হয়রানি করেছে। ১২৮০ সালের দিকে বাগদাদের বিখ্যাত ইহুদি দার্শনিক ইবনে কাম্মুনা '*Examination of the Three Faiths*' গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি বজায় রেখে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের স্রষ্টা-নবীদের আগমন, কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করেন। ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মকে সমালোচনা করলেও গ্রন্থ প্রকাশের বছর চারেক পরে বাগদাদের মুসলমানদের হর্তাকর্তা মুসতানসিরিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র, মোল্লা-মৌলভী-আমির বিশাল জঙ্গি মিছিল নিয়ে 'কাফের' ইবনে কাম্মুনার বাড়িঘর-বইপত্র পুড়িয়ে দেয়। ইবনে কাম্মুনা প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁকে ধরে বিচার বাসনো হয়, এবং বিচার শেষে মোল্লারা ইবনে কাম্মুনার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতো গেল ইহুদি দার্শনিকের কথা, কিন্তু মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা চিকিৎসক আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি (৮৬৫-৯২৫), তুর্কি দার্শনিক আল-ফারাবি (৮৭০-৯৫০), ইবনে হাইতাম (৯৬৫-১০৩৯), দার্শনিক-চিকিৎসক আবু আলি ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), কবি-বিজ্ঞানী ওমর খৈয়ামের (১০৩৮-১১২৩) মতো প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কাকে রেখে কার কথা যে বলি, সবাইকেই, যারা প্রচলিত ইসলামি অনুশাসনের গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের চর্চা করেছেন, তাঁদেরকে কাফের-মুরতাদ-নাস্তিক ঘোষণা দিয়ে তৎকালীন ইসলামের রক্ষাকর্তারা যে পরিমাণ অত্যাচার-নির্যাতন-নাজেহাল করে বাস্তুচ্যুত করেছে তার বিশদ বিবরণ দিতে গেলে স্বতন্ত্র আরেকটি গ্রন্থই রচনা করতে হবে। তবে এখানে উল্লেখ না করে পারছি না, শল্য চিকিৎসার জনক বলে পরিচিত আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজির প্রতি ধর্মান্ধ শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা। বর্তমানে পারস্যের (ইরান) রাজধানী তেহরান থেকে অল্প কিছু দূরে তিনি ৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রিসের বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি ছিলেন আগ্রহী মধ্যযুগের এই দার্শনিক-চিকিৎসক 'আল্লাহর ওহি বা প্রত্যাদেশে' অবিশ্বাসী ছিলেন, মনে করতেন একমাত্র যুক্তি মানুষকে দিকনির্দেশনা দিতে পারে; তাঁর কাছে 'ধর্ম বিপজ্জনক বস্তু।' তাঁর নিজের করা ১২৮টি বড় ধরনের এবং ২৮টি ছোট গবেষণার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা, রসায়ন সম্পর্কিত নানা বিষয়। যে গুটি বসন্ত পৃথিবীর বিশাল অংশের মানুষের কাছে দীর্ঘসময় ঈশ্বরের অভিশাপ বলে বিবেচিত হতো, আল-রাজিই সর্বপ্রথম সেই গুটি বসন্তের রোগ-লক্ষণ, ক্ষতিকর প্রভাব ও রোগমুক্তির উপায় সম্পর্কে ডাক্তারি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অথচ আরবের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে নিজের মনন-দর্শনের কারণে দিতে হয় চরম মূল্য। 'ধর্মদ্রোহী' চিকিৎসককে শাস্তি দিতে 'ইসলামওয়ালাদের' পরামর্শে বুখারার আমির

[২৬] মোতাজিলা সম্পর্কে জানতে পাঠ করুন: Dr Muhammad Kamal, *Mutazilah: the rise of Islamic rationalism*, The Rationalist Society of Australia's Newsletter: *Australian Rationalist*, Number 62, Page 27-34. the internet version can be read at: http://www.rationalist.com.au

আল-রাজিকে তাঁর রচিত বই দিয়ে মাথায় প্রহার করার আদেশ দেন যতক্ষণ না মাথা কিংবা বই, দুটোর একটা ছিন্ন না হয়; কারণ এই মস্তকে 'শয়তান' বাসা বেঁধেছে! আল রাজিকে বন্দি করে মাথায় বই দিয়ে প্রহার শুরু হল। এক সময় মাথা ফেটে যায়, রক্ত বের হয়, অজ্ঞান হয়ে যান, দৃষ্টিশক্তি হারালেও কোনো রকমে প্রাণ বেঁচে যান তিনি। পরবর্তীতে যতদিন বেঁচে ছিলেন এতোদিনকার জীবনের পাথেয় চিকিৎসা, দর্শন, বিজ্ঞান-সাধনা সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে একান্ত নিভৃতে বসবাস করতে শুরু করেন। বন্ধু-সহকর্মী চিকিৎসক একবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে চিকিৎসার অনুরোধ জানালে তিনি প্রচণ্ড অভিমান আর ধিক্কার জানিয়ে বলেছিলেন : "আমার এ চোখ দুটো দিয়ে আমি ইতোমধ্যে পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছি। আমার আর এরচেয়ে বেশি দেখার সাধ নেই।" ৯২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে মধ্যযুগের প্রথিতযশা এ চিকিৎসক দৃষ্টিহীন অবস্থায় প্রচণ্ড মনোবেদনা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইসলাম যতোই শান্তি আর সহনশীলতার বাণী প্রচার করুক না কেন, কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা দেখি 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলাম ধর্মের রক্ষকরা কোনোকালেই ধর্মদ্রোহী বা নাস্তিক তো দূরের কথা ধর্মের প্রতি সামান্য ভিন্নমত পোষণকারীকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারেননি; চালিয়েছেন কঠোর আক্রমণ, নির্যাতন-নিপীড়ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে তো দেখতে পাই মোল্লা-মৌলভী-শাষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ-ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মদ্রোহিতা-আল্লাহদ্রোহিতার 'বোগাস' অভিযোগ তুলে একরকম গায়ে জোরেই মুসলিম বিশ্ব থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের সূর্য অস্তমিত করে দেয়, ডুবে যায় গাঢ় অন্ধকারে; এরপর সুদীর্ঘকাল মুসলিম বিশ্বে মুক্তচিন্তার অধিকারী কোনো মানুষ গড়ে ওঠতে পারেনি। এ জন্য অনেকাংশেই দায়ী আল-গাজ্জালী, আল-আশারির মতো ব্যক্তিদের ইসলাম ধর্ম নিয়ে একগুঁয়েমি আর গোঁয়ার্তুমি মনোভাব। ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যে ইসলামওয়ালারা শাহওয়ালীউল্লাহর পিটিয়ে হাত ভেঙে দেয়, চোখ সেলাই করে দিল্লি থেকে নির্বাসন দেয়, পণ্ডিত দারাশিকোহের গর্দান কেটে ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কিছুটা আগে কলকাতা থেকে '*তসবীরে রসূল*' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন শ্রী ভোলানাথ রায়। উক্ত গ্রন্থটিতে মহানবী হজরত মুহাম্মদের একটি 'কল্পিত' ছবি ছাপা হয়েছিল। ফলে ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; সৃষ্টি হয় মারমুখী জংলী আন্দোলন এবং তা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে নানা স্থানে। কয়েকমাস পর লাহোর থেকে আসা দুই ভাই আমির এবং আব্দুল্লাহ মিলে প্রকাশক শ্রী ভোলানাথ রায়কে হত্যা করলে আস্তে আস্তে এ আন্দোলন প্রশমিত হয়ে আসে।[২৭] ১৯২৪ সালের দিকে ব্রিটিশ উপনিবেশিক ভারতবর্ষে রাজপাল নামের এক ব্যক্তি 'প্রফেট মুহাম্মদের নারীপ্রীতি' নিয়ে স্যাটায়ারধর্মী 'রঙিলা রসুল' রচনার কারণে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের হাতে পুনরায় খুন হন। 'শান্তির ধর্মের' ধ্বজাধারী বুজুর্গরা সংখ্যালঘু বাহাই মতাবলম্বীদের ওপর যে পরিমাণ নির্যাতন-নিপীড়ন-হত্যা-গুম-সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালীন নাৎসিবাহিনী কর্তৃক ইহুদি নিধনের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। বাহাই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা আলী মুহাম্মদ নিজেকে প্রফেট বলে ঘোষণা দিলে ১৮৫০ সালে গুলি করে মারা হয়, তাঁর ছেলেমেয়ে, পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। ব্রিটিশ রাজত্বে ইসলামের মুরব্বি-পাণ্ডারা কাজী নজরুল ইসলামকে কতবার যে কাফের বানিয়েছে, নাজেহাল করেছে তার কোনো ইয়াত্তা আছে? অথচ আজকে নজরুল ওই মৌলভীগোষ্ঠীর কাছেই 'হিরো'! ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর লাগামহীন শ্বেত সন্ত্রাস, নির্যাতন, অসহিষ্ণু আচরণ অন্য কোনো ধর্মের ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি এরকম আগ্রাসী আচরণ আজ-কাল আর দেখা যায় না। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে জামাতে ইসলামির গুরু মাওলানা মৌদুদির নেতৃত্বে মুসলমান নামধারী ধর্মান্ধরা হাজারে হাজারে আহমদিয়াদের কচুকাটা করে ফেলেছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তান সরকার একসময় এই গণহত্যা বন্ধে সামরিক শাসন জারি করতে বাধ্য হয়। আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে গণহত্যায় অংশগ্রহণ ও প্ররোচিত করায় মৌদুদির ফাঁসির আদেশও দেওয়া হয়। মজার বিষয় সামরিক ট্রাইবুনালে বিচারের রায় ঘোষিত হলেও সৌদি আরবসহ আরো কয়েকটি মধ্যপ্রাচ্যের সরকারের হস্তক্ষেপে কিছুদিনের মধ্যেই মৌদুদি বেকসুর খালাস পেয়ে যান! শুধু পাকিস্তান কেন, ইরানে কমপক্ষে বিশ হাজার বাহাই মতাবলম্বীকে হত্যা করেছে ধর্মীয় ফ্যানাটিকরা। অনেকগুলো ইসলামি রাষ্ট্র (সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইরান প্রভৃতি) আইন করে আহমদিয়া, বাহাইদের 'অমুসলিম' ঘোষণা করেছে, তাদেরকে প্রকাশ্যে ধর্মচর্চা করতে দেওয়া হয় না। বাংলাদেশেও আমরা কিছুদিন আগে আইন করে আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে ভয়ঙ্কর সব জঙ্গি আন্দোলন দেখতে পেয়েছি, দেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদিয়াদের মসজিদসহ বাসাবাড়িতে লুটপাট-ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মৌলবাদতোষণকারী সরকারগুলো চমৎকার ভঙিতে 'মুখে আঙুল দিয়ে বসে আছে'। এরপরও যারা দাবি করেন, এহেন ধর্ম মানুষের গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার, ভিন্নমত প্রকাশের নিরাপত্তা-নিশ্চয়তা দেয়, বলতে বাধ্য হচ্ছি হয়তো তাঁরা 'উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে' থাকেন বলেই এমনটা বলতে পারেন। বরং এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে অন্য যে কোনো ধর্মের তুলনায় বর্তমানকালে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে সেন্সরশিপ আরোপের প্রবণতা ইসলাম ধর্মেই বেশি। কোরান নিয়ে অর্থোডক্স মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, কোরানের অলৌকিকত্ব-সাহিত্যমান-রচনাশৈলী-ঐতিহাসিক ভিত্তি ইত্যাদি নিয়ে সন্দেহ করা যাবে না, কোনো বির্তক তো দূরের কথা কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি ইরাকের নাবলুসের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সুলেমান বশিরের কথা। নাবলুসের 'An-Najah National University'-এর শিক্ষক সুলেমান বশির তাঁর ক্লাস লেকচারে ইসলাম এবং কোরানের 'ঐশীত্ব' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কোরান' মুহাম্মদের কাছে আসা আল্লাহর কোনো ঐশী বাণী নয়, বরং এটি 'the product of historical development'। স্যারের মুখে এই ধরনের 'বে-ইসলামি' কথা শুনে ঈমানদার সুবোধ ছাত্ররা কি করলো? কিছুই না। কেবল শিক্ষক

[২৭] মাওলানা মোবারক করীম জওহর, *আমি ধর্ম বলছি*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১০।

সুলেমান বশিরকে তুলে জানালার বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল! শুনতে সব ধর্মবিশ্বাসীর খারাপ লাগবে, বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দলন-দমন-পেষণ করে সব ধর্মই নানা সময়ে 'রক্ত' দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছে; কিন্তু বিশেষ করে ইসলামের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন আর অন্যের জীবন হরণ খুব বেশি প্রকট। ইরানি স্কলার আলি দস্তি (Ali Dasti) নবী মুহাম্মদের জীবন নিয়ে রচিত (১৯৩৭ সালে লেখা হলেও ১৯৭৪ সালে বৈরুত থেকে প্রথম প্রকাশিত) '*Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*' নামের গ্রন্থে শতাধিক উদাহরণ হাজির কওে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন : 'কোরান শরিফ কোনোভাবেই আল্লাহ প্রদত্ত বক্তব্য নয়, কারণ এ গ্রন্থে (কোরানে) যেমন প্রচুর ব্যাকরণগত ভুল আছে, তেমনি আছে অনেক অস্পষ্টতা, পরস্পরবিরোধী বক্তব্য, ভুল ব্যাখ্যা এবং অপ্রয়োজনীয় বক্তব্য; তাই বলতে হয় এটি অলৌকিক কোনো গ্রন্থ নয় বরং কয়েকজন 'আল্লাহভীরু' মানুষের (নবী-সাহাবি) সাহায্য-সহযোগিতায় রচিত।' তিনি বলেন :

> "The Qur'an contains sentences which are incomplete and not fully intelligible without the aid of commentaries; foreign words, unfamiliar Arabic words, and words used with other than the normal meaning; adjectives and verbs inflected without observance of the concords of gender and number; illogically and ungrammatically applied pronouns which sometimes have no referent; and predicates which in rhymed passages are often remote from the subjects. These and other such aberrations in the language have given scope to critics who deny the Qur'an's eloquence." (Page 48)।

স্বাভাবিকভাবেই বইটি প্রকাশের সাথে সাথে ইরানের তৎকালীন ক্ষমতাসীন শাহ রেজা মুহাম্মদ পাহলভি সরকার বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে কথিত 'ইসলামি' বিপ্লবে শাহ সরকার উৎখাত হলে ক্ষমতায় আসে কট্টর মৌলবাদী আয়াতুল্লাহ খোমেনির দল। খোমেনি ক্ষমতায় এসেই আলি দস্তিকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়; 'ধর্মদ্রোহিতা'র অভিযোগ তুলে টানা তিন বছর ধরে প্রচণ্ড শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করতে করতে ১৯৮৪ সালে জনাব আলি দস্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। জানা যায়, মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর নিকট বন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন : "Had the Shah allowed books like this to be published and read by the people, we would never have had an Islamic revolution." পরের বছর ১৯৮৫ সালে সুদানে মুহাম্মদ মাহমুদ তাহা নামের ধর্মতত্ত্ববিদকে 'ফিৎনাহ্' সৃষ্টির অভিযোগ তুলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়, তাঁর বইপত্র আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় কারণ তিনি বেশ কিছু বইয়ে মাদানি সুরার ওপর ভিত্তি করে রচিত শরিয়া আইন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন কোরানের মাদানি সুরা (মদিনায় রচিত) এখনকার যুগে আর প্রযোজ্য নয়, ওখানে প্রচুর আগ্রাসী-উত্তেজক বক্তব্য আছে; বরং বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে এগিয়ে যেতে হলে শরিয়া আইন সংস্কার করে মক্কি সুরার ওপর ভিত্তি করে রচনা করা উচিৎ। ১৯৮৬ সালে মিশরের বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও লেখক ফরজ ফাদা তাঁর '*No To Sharia*' নামের ছোট পুস্তিকাতে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার দাবি জানিয়ে ইসলামি শরিয়া আইনের কঠোর সমালোচনা করেন; এতে ক্ষুব্ধ হয়ে 'ধর্মীয় (ইসলাম) রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান' মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'মুরতাদ' সাব্যস্ত করে এবং ৮ই জুন ১৯৯২ সালে তাঁকে ছেলে এবং ছেলের বন্ধুসহ গুলি করে হত্যা করা হয়। মিশরের সশস্ত্র জঙ্গিদল আল-গামা আল-ইসলামিয়া এই হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব স্বীকার করে বিবৃতি দেয়। ১৯৯৪ সালের ১৪ই অক্টোবর মুসলমান ফ্যানাটিকরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিশরীয় লেখক নাগিব মাহফুজকে ৮৩ বছর বয়সে 'জবাই' করার জন্য গলায় ছুরি চালিয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি এ যাত্রা বেঁচে যান। তাঁকে হত্যাচেষ্টার কারণ ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত '*Children of Gabalawi*' নামের রূপকাশ্রয়ী-উপন্যাসে জনাব মাহফুজ না-কী আল্লাহ, মহানবী মুহাম্মদ এবং ইসলামকে 'ইনসাল্ট' করেছেন! জঙ্গিদল আল-গামা আল-ইসলামিয়ার আধ্যাত্মিক নেতা শেখ ওমর আব্দুল রাহমি নাগিব মাহফুজের মস্তক কেটে ফেলার জন্য ফতোয়া দিয়ে মৌলবাদীদের উসকে দেন নানা সময়ে। কোরান সম্পর্কে অর্থোডক্স ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ভিন্নমত পোষণ করার কারণে মিশরের আরেক কোরানিক স্কলার নাসের আবু জায়েদ (Nasr Abu Zaid)-এর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় ১৯৯৫ সালে। শুধু তাই নয়, 'ধর্মদ্রোহী' মুসলমানের সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ ইসলামি বিধিসম্মত নয়, শরিয়া আইনের এ বাধ্যবাধকতা তুলে ধরে আবু জায়েদ এবং তাঁর স্ত্রীকে জোরপূর্বক 'তালাক'-এর মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করা হয়। জায়েদের পরিবারের প্রতি মৌলবাদীদের ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি, সাধারণ মুসলমানদের বাক্যবাণ, তির্যক-কটু মন্তব্য আর নাজেহাল অবস্থায় অতিষ্ট হয়ে নাসের আবু জায়েদ স্ত্রী ইবতিহাল ইউনুসকে সাথে নিয়ে কায়রো ছেড়ে হল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান পরবর্তীতে। প্রাণ বাঁচাতে নাসের আবু জায়েদের নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে ভিনদেশে গমনের প্রতি ইঙ্গিত করে মিশরের অর্থোডক্স মুসলিম নেতা শেখ ইউসুফ আল-বাদ্রি খুব গর্বিত কণ্ঠেই বলেন[২৮] :

[২৮] Toby Lester, *What is the Quran?*, Published in *The Atlantic Monthly*; http://www.theatlantic.com/doc/199901/koran

> "We are not terrorists; we have not used bullets or machine guns, but we have stopped an enemy of Islam from poking fun at our religion.... No one will even dare to think about harming Islam again."

পাকিস্তানের চিকিৎসক ইউনুস শেখকে (Dr. M. Younus Shaikh) ৪ অক্টোবর ২০০০ সালে ব্ল্যাসফেমির (পাকিস্তানি পিনাল কোড ২৯৫-গ ধারা মোতাবেক) অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি না-কী ক্লাসে মেডিকেলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে লেকচার দিতে গিয়ে কোনো এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদের পিতামাতা মুসলমান ছিলেন না, নবুয়ত লাভের আগ পর্যন্ত নবীও মুসলিম ছিলেন না; এবং তাঁর খৎনা করা হয়নি।' পাকিস্তানের মতো ইসলামি রাষ্ট্রে এখনো 'ইসলাম' সম্পর্কে এই ধরনের সামান্য ভিন্নভাবনা বা বক্তব্য বিন্দুমাত্র বরদাশ্‌ত করা হয় না। ফলে আমরা দেখতে পাই, ২০০১ সালের আগস্ট মাসে ইউনুস শেখকে ব্ল্যাসফেমির মামলায় ফাঁসিয়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সারা বিশ্বে এই অমানবিক-অগণতান্ত্রিক রায়ের বিপক্ষে তীব্র গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের *মুক্তমনা* (www.mukto-mona.com) আন্তর্জালসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু বিজ্ঞানমনস্ক-মানবাধিকার সংগঠনগুলোর (Amnesty International, IHEU, Rationalist International) সম্মিলিত প্রয়াস এবং জাতিসংঘসহ কয়েকটি বিদেশি রাষ্ট্রের (নরওয়ে, ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র) কূটনৈতিক তৎপরতায় 'চাপে পড়ে' পাকিস্তানের তৎকালীন মোশারফ সরকার ইউনুস শেখকে তিন বছর জেল খাটিয়ে ২১ নভেম্বর, ২০০৩ সালে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।[২৯] বর্তমানে ডাক্তার ইউনুস শেখ পশ্চিমের একটি দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেছেন। 'সাবমিশন' নামে একটি ১০ মিনিটের একটি 'ইসলাম-বিরোধী' চলচিত্র নির্মানের কারণে ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে ডাচ চলচিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গগকে নির্মমভাবে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। আততায়ী মোহাম্মদ বৌয়েরী হল্যান্ডের রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে থিও ভ্যান গগের দেহের উপর আট রাউন্ড গুলি বর্ষণ করার পর ছুড়ি দিয়ে গলা কেটে নেয়, আর তার বুকের উপর ছুড়ি দিয়ে গেথে দেয় সাবমিশন চলচিত্রের অভিনেত্রী এবং লেখিকা আয়ান হারসি আলীর মৃত্যু পরোয়ানা। এই খবর সাড়া বিশ্বে আলোড়ন তুলে। তার চেয়েও বেশি আলোচিত খবর ছিলো ২০০৫ সালে - যখন একটি ডেনিশ পত্রিকা Jyllands-Posten ইসলাম এবং মহানবী মুহম্মদ (দঃ)কে নিয়ে এক ডজন কার্টুন প্রকাশ করে ইসলামী বিশ্বের 'ধর্মানুভূতি'তে আঘাত সৃষ্টি করে। এ নিয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শুরু হয় জালাও পোড়াও আন্দোলন। পাকিস্তানের এক ইমাম কার্টুনিস্টের মাথার দাম ধার্য করে এক মিলিয়ন ডলার। সিরিয়া, লেবানন, ইরান, পাকিস্তান বাংলাদশ সহ সারা পৃথিবীতে সহিংসতায় মারা যায় শতাধিক লোক। ব্রিটেনের ফ্যানাটিক মুসলিমেরা ব্যানার নিয়ে মিছিল করে - 'Slay those who insult Islam', 'Butcher those who mock islam' এবং 'Behead those who say Islam is a violent religion' - এ ধরনের শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার গুলো 'শান্তিময় ইসলামের' স্বরূপ্‌ খুব ভাল করেই বিশ্বের কাছে উন্মোচিত করে দিলো। এ দিকে আমাদের আরজ আলী মাতুব্বর, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদের সাথে এই সেদিন পর্যন্ত কী করেছে জেহাদি জোশে মাতোয়ারা আল্লাহর সৈনিকরা; আজকে 'মৃত্যু' শুধু তাঁদের দূরে রেখেছে মৌলবাদী উন্মত্তার উত্তাপ থেকে। স্বাধীনতার অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দাউদ হায়দারকে প্রফেট মুহাম্মদকে নিয়ে 'স্যাটায়ারধর্মী' কবিতা লেখার কারণে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়; কবি-লেখক তসলিমা নাসরিন তো এদেশের না মৌলবাদী, না সাধারণ ধর্মাবলম্বী, না প্রগতিশীল কারো কাছ থেকেই নিস্তার পাচ্ছেন না। তসলিমার লেখনী আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রুখতে সবাই এখানে একাট্টা! সামান্য 'মুহম্মদ বিড়াল' নিয়ে কার্টুনের জের হিসবে জেলে যেতে হয় কার্টুনিস্ট আরিফকে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সালমান রুশদির কথা তো সবারই জানা আছে; প্রায় বিশ বছর আগে প্রকাশিত 'স্যাটানিক ভার্সেস' নামের উপন্যাসে ক্ষিপ্ত মোল্লাদের প্রাণনাশের হুমকির কারণে এখনো রুশদি প্রকাশ্যে আসতে পারছেন না।

আমাদের এ প্রবন্ধে আলোচনা মূলতঃ ইসলাম এর উপর সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব; বিশেষ করে প্রফেট মুহাম্মদের জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটসহ কোরান শরিফ নিয়ে অসংকুচিতচিত্তে নির্মোহ আলোচনা দরকার বলে আমি মনে করি। বর্তমানযুগে 'ইসলাম' নানা কারণেই আলোচনার বিষয়; স্বীকার করতে হবে ২০০১ সালের ৯/১১-এর পর এ আলোচনার গতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য অনেক ধর্মের মতোই ইসলামকে নতুন যুগের আলোয় পুনর্মূল্যায়ণ করা হচ্ছে। কালোপযোগী করার লক্ষ্যে সময়ের পরিবর্তনে যুগে যুগে ইহুদি, হিন্দু, খ্রিস্টান ধর্মসমূহে কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে। মেয়েশিশু হত্যা, ডাইনি হত্যা, সতীদাহ প্রথা, বিধবা প্রথা, আজ আর নেই; আইনত অপরাধ। (অনেক ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থে কি লেখা আছে তার দিকে না-তাকিয়ে) গির্জায় নারী নেতৃত্ব-সমকামী বিবাহ আজ আইনত বৈধ। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের সামনে মাথানত করে ধর্মযাজকেরা তাদের ধর্মগ্রন্থের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন তাদের পূর্বসূরিগণকর্তৃক অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার জন্যে।[৩০] তবে এর মানে আমি বলতে চাচ্ছি না যে, খ্রিস্টান ধর্ম আর তাদের ধর্মযাজকরা এতেই একদম সাফসুতরা হয়ে গেছে; তাদের সাত খুন মাফ হয়ে গেছে। এখনো

[২৯] *International Humanist News*, International Humanist and Ethical Union (IHEU), London, U. K, February, 2004, Page 5; the internet version can be read at: www.iheu.org

[৩০] John Patrick Michael Murphy, *Murphy's Law: Giordano Bruno,* 1998

আমেরিকাসহ দুয়েকটি দেশে খ্রিস্টান মৌলবাদীরা মাঝে মাঝে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে, স্টেমসেল-ক্লোনিং গবেষণার জন্য, স্কুলে বিবর্তনবিদ্যা পড়ানো বাতিলের দাবিতে হুঙ্কার দেয়। তবে বলা যায়, ঐসব দেশে দীর্ঘদিন ধরে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকার কারণে খ্রিস্টান মৌলবাদীদের বিষদাঁত ইতোমধ্যে ভেঙে গেছে। সেদিনও পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় জন পল বিগত দু'হাজার বছরে খ্রিস্টান জনগণ শান্তি, প্রেম, মানবাধিকারের বিরুদ্ধে যেসব পাপ করেছে, তার জন্য ঈশ্বরের মার্জনা ভিক্ষা করেছেন। পত্রিকার ভাষ্যমতে[৩১],

> "Pope John Paul-II will use the first Sunday of Lent, which falls on March-12, to seek devine forgiveness for all wrongs committed by Christians through out the past 2000 years of Christianity. This long list includes Sins against love, Peace, the rights of people."

কিন্তু ইসলামকে আমরা দেখতে পাই তার বিপরীত; আদি অবস্থানে আজও অনড়-অটল। প্রগতিশীলতার বিপক্ষে তার অবস্থান; নারী অধিকার, সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর (আদিবাসী) স্বাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা, ইহজাগতিক ধ্যান-ধারণার প্রতি রয়েছে নেতিবাচক মনোভাব। জেহাদের মাধ্যমে বিধর্মীদের-অবিশ্বাসীদের হত্যা করে গোটা বিশ্বটাকে 'দারুল-ইসলাম' বানানোর প্রচেষ্টাকে ইসলামি বিশ্বে খুবই মর্যাদার সঙ্গে দেখে। জেহাদে নিহত ইসলামি জঙ্গিরা মুসলিম-বিশ্বে খুবই সম্মানিত, সাহসী বীর হিসেবে পরিচিতি পান। ইসলাম অস্বীকার করে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত সত্যকে, সংস্কার-পরিবর্তন ইসলামে ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ। অনেকের কাছেই 'ইসলাম' কোনো কালেই অন্যান্য আট-দশটি সাধারণ ধর্মের মতো ব্যক্তিবিশেষের একান্ত ব্যক্তিগত দৈনিক পাঁচবার নির্দোষ ধর্মচর্চা-উপাসনা-প্রার্থনার নাম ছিল না, বরং এটি এক ধরনের 'আরব সাম্রাজ্যবাদের'ই নাম; মানুষের 'অজ্ঞানতা আর ভয়ের উপর দাঁড়ানো' দুর্বল অনুভূতিকে পুঁজি করে একটি কৌশলী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নাম। 'রাজনৈতিক ইসলাম' আদৌ নতুন কোনো বিষয় নয় বরং ইসলামকে বানানো হয়েছে বা বলতে পারি জন্ম হয়েছে 'ধর্মীয় পতাকা'র আবরণ ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিল করার রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে; এটা কোনো এক আল্লাহর বাণী নয়। মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মীয় 'খোলসমাত্র', যা সারা আরবে এর সামরিক ও রাজনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। যদিও গোড়াতে এটা ছিল আরব উপদ্বীপের (মক্কা-মদিনায়) রসুল মুহাম্মদ কর্তৃক নির্দেশিত-পরিচালিত; পরবর্তীতে সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়াশীল খলিফা-সাহাবি-রাজা-বাদশা-শাষকগোষ্ঠী, সেনাবাহিনী আর মোল্লাদের পূর্ণ সমর্থন-সহযোগিতায় 'প্যান-ইসলামিক' ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরব ছেড়ে পূর্বদিকে আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, ভারত, দক্ষিণ পাঞ্জাব, পশ্চিমদিকে লিবিয়া, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইরানের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী-মাওবাদী) রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক নাসরিন জাযায়েরির ভাষায় :

> "ইসলাম শোষক শ্রেণীসমূহের মতাদর্শ ও হাতিয়ার।... ইসলাম মুক্তিদাতা কোনো মতাদর্শ নয়। মধ্যপ্রাচ্যের কদর্য নিপীড়ক সমাজগুলো হলো আধা-সামন্তবাদী, আধা-উপনিবেশিক যা গড়ে উঠেছে স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল বড় পুঁজিবাদী-সামন্ত শ্রেণীগুলোর সাথে সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজশে। এই নিপীড়ক কুৎসিত সমাজগুলো থেকে ইসলামি শক্তিগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির বিশেষ কোনো ফারাক নেই।... সুদীর্ঘকাল ধরে ইসলামি শক্তিসমূহ মধ্যপ্রাচ্যে নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করেছে, তাদের আত্মত্যাগকে বরবাদ করেছে এবং ধর্মীয় মতাদর্শগত শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের অসীম শক্তিকে অপচয় করার চেষ্টা করেছে। এভাবে, ইসলামি শক্তিগুলো দুনিয়ার এ অংশে বিপ্লবকে বিলম্বিত করার পেছনে ভূমিকা রেখেছে এবং বিশ্বসাম্রাজ্যবাদকে বড় মাপের সেবা প্রদান করেছে।"[৩২]

কোরানে আল্লাহ বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম।" (Truly, the religion with Allah is Islam)। (সুরা ৩, আল-ইমরান, আয়াত ১৯)। "মুসলমানরা শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য যাদের অভ্যুত্থান হয়েছে।" (সুরা ৩, আল-ইমরান, আয়াত ১১০)। "মুসলমানরা পরস্পর ভাই-ভাই, তাই তোমাদের ভাইদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করো।" (সুরা ৪৯, হুজুরাত, আয়াত ১০)। আল্লাহর নামে প্রচারিত এ সকল ঐশী নির্দেশ অনুসারে ইসলামি হুকমত কায়েমের জন্য পনেরশ বছর আগেকার প্রফেট মুহাম্মদের সময়কাল থেকে বর্তমানে 'মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ' জুজুর ভয় দেখিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলামের পতাকা উত্তোলনের কাজ করে যাচ্ছে হাজার-হাজার ইসলামি ব্যাংক, ইসলামি বীমা, ইসলামি এনজিও, ইসলামিক এইড, ইসলামি শপিংসেন্টার, ইসলামি একাডেমি, ইসলামি রাজনৈতিক দল, ইসলামি সেনাবাহিনী (আলকায়েদা, হামাস, লস্কর তৈয়বা, জামাতুল মুজাহিদিন, জৈশে মুহাম্মদ ইত্যাদি) ইসলামি রাজনীতি, ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি। ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর জন্য রয়েছে

[৩১] The Daily Hindustan Times, 12/03/2000

[৩২] চিত্তরঞ্জন পাল ও রাজেশ দত্ত (সম্পাদনা), *যুদ্ধ ইসলাম প্রতিরোধ*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৭৪।

'ওআইসি' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা। অথচ বিশ্বের আর কোনো ধর্মের এরকম আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সংস্থা তৈরি করার প্রয়োজন হয়নি কখনো। 'জাতিসংঘ'কে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সংসদ।বক্তব্যে কিছুটা হলেও সত্যতা আছে; কারণ আমেরিকা-ব্রিটেন আর তাদের পোষা 'সারমেয়' ইসরাইল সময়ে-সময়ে হুমকি-ধামকি আর চাপ দিয়ে নিজেদের পক্ষের অনেক প্রস্তাব বিশ্বের অনেক দেশের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদ থেকে পাস করিয়ে নিতে পেরেছে। যেমন, এই সেদিনের আফগান যুদ্ধ। আবার সম্পূর্ণ অনৈতিক-অন্যায্য-অমানবিক ইরাক যুদ্ধের সময় তো আমেরিকা-ব্রিটেন জাতিসংঘের ধার ধারে নি। জাতিসংঘকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, বিশ্বের লাখ-কোটি মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নিজেদের গরজে ইরাকে যুদ্ধ বাধিয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে। এর বিচার অবশ্যই হতে হবে। ইজরাইল তো রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারের মতো ফিলিস্তিনের বুকে চেপে বসে আছে। কিন্তু 'ওআইসি'কেও ধোয়া তুলসী পাতা ভাবলে ভুল হবে। ওআইসি 'সার্ক'-এর মতো 'ধর্মনিরপেক্ষ'-'জাতিনিরপেক্ষ' আঞ্চলিক কতগুলো দেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা নয়, এটি সম্পূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সংস্থা। তাদের কাছে বিশ্ব দুইভাগে বিভক্ত : একটি ইসলামি বিশ্ব, অন্যটি অ-ইসলামি বিশ্ব। অ-ইসলামি বিশ্বকে মুসলিম বিশ্বের করায়ত্তে এনে খেলাফতি শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ওআইসি কিংবা এই ধরনের ইসলামিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য। মার্কসবাদী রাজনীতির কারণে বিশ্বের জনগণ মার্কিন-ব্রিটিশ 'সাম্রাজ্যবাদ' সম্পর্কে যতোটা ওয়াকিবহাল[⊥]; কিন্তু আরবের এই 'ধর্মবেশী সংস্কৃতি-বিধ্বংসী' সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে জনগণের মধ্যে এখনো তেমন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। অথচ কোনো মতবাদ-দর্শন-বিশ্বাস-মানসিকতা 'সাম্রাজ্যবাদী' হতে হলে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন ইসলামে তা পনেরশত বছর ধরে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। 'ইসলাম' নামক আরব সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে একসময়কার কট্টর মৌলবাদী এবং পরবর্তীতে মুক্তমনের আলোকপ্রাপ্ত পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক আনোয়ার শেখ (১৯২৮-২০০৬) তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতে খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন[৩৩] :

> "In fact, Islam is the most effective tool of imperialism; other nations, usually acquire political and cultural glory through economic power or sword and fire but Islam achieves this aim through the medium of faith-in-Muhammad, the only source of paradise, replete with beautiful virgins, pretty boys and rivers of wine, milk and honey. This lure of paradise has turned all non-Arab Muslims into moths, eager to cremate themselves on the flame of the Arabian cultural hegemony.
>
> ... Owing to its deep-rooted tendencies to benefit the Arabs at the expense of its followers belonging to the foreign lands, it is reasonable to conclude that Islam is nothing but the tool of the Arab Imperialism."

আনোয়ার শেখের বক্তব্য হয়তো অনেকের কাছে আক্রমণাত্মক-রুক্ষ মনে হতে পারে, সরল মনের মুসলমানদের হৃদয়ে চোট লাগতে পারে, অনেকে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাস সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন বদর, ওহুদ, খন্দক, কোরাইজা, আল মুস্তালিক, খাইবার, হুনাইন ইত্যাদি যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলের সম্পদ আহরণ, লুণ্ঠন করে যথেচ্ছ ভোগ করার নিরঙ্কুষ অধিকার দিয়েছেন প্রফেট মুহাম্মদ এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম। বিজিত জাতির নারীদের 'গনিমতের মাল' ঘোষণা করে 'ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসী' বানিয়ে অবাধে যৌনাচারের বৈধতা দিয়েছে কোরান শরিফ। (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৫০, ৫২; সুরা ৪, নিসা, আয়াত ২৪)। 'শান্তির ধর্ম' ইসলাম সম্পর্কে আমরা হাদিসে পাই আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা হতে বর্ণিত, প্রফেট মুহাম্মদ বলেছেন : "Know that Paradise is under the shade of swords." (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫২, নম্বর ৭৩)। আরব সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি মক্কা দখলের পর (সঠিকভাবে বলতে গেলে বদর যুদ্ধের পর থেকেই) থেকে ইসলামের ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক-জাতীয়তাবাদী দিকটি প্রকাশ্যে চলে এসেছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক? নবীজি বলে গেছেন, আরবকে ভালোবাসবে তিনটি কারণে, যথা : (১) আমি (প্রফেট মুহাম্মদ) একজন আরব, (২) কোরান শরিফ আরবি ভাষায় রচিত, (৩) বেহেস্তবাসীদের ভাষাও হবে আরবি। (দ্রষ্টব্য : মিশকাত শরিফ, ভলিউম ৩, হাদিস নম্বর ৫৭৫১)। আরবি ভাষা বিশ্বের অন্য সকল ভাষা থেকে পরম পবিত্র, অত্যন্ত সম্মানিত, আল্লাহ-রসুলের মুখের ভাষা—এরকম একটি অন্ধ

[⊥] মার্কসবাদী-লেলিনবাদীদের দৃষ্টিতে 'সাম্রাজ্যবাদ' হচ্ছে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর, যা বুর্জোয়া অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত; আর 'ইসলাম' একটি ধর্ম, যা আধা সামন্ততান্ত্রিক-গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির নির্দিষ্ট ফল হতে উদ্ভূত। তাই 'ইসলাম' ধর্মকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে ব্যাখ্যা করা কিছুটা জটিল বটে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যবাদের আর যেসব বৈশিষ্ট্য যেমন, মনোপলি ব্যবস্থা, উপনিবেশিকতাবাদ, সামরিকতন্ত্র ইত্যাদি ইসলামে প্রচণ্ডরূপে উপস্থিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে ইসলামি শক্তিগুলোও সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে বিবেচনা করে না। তারা পশ্চিমা শক্তিকে তখনই 'সাম্রাজ্যবাদী' বলে অভিহিত করে থাকে যখন এই পশ্চিমা শক্তি ইসলামি শাষকগোষ্ঠীকে স্ব-স্ব নিপীড়ক সমাজব্যবস্থা পছন্দমত চালিয়ে যাবার যথেষ্ট সুযোগ দেয় না বা সহযোগিতা করে না। (দ্রষ্টব্য : *যুদ্ধ ইসলাম প্রতিরোধ*, পৃষ্ঠা ১৫৭)।

[৩৩] Anwar Shaikh, *Islam: the Arab Imperialism*, Principality Publishers, 1998, page 4-5; the internet version can be read at: http://www.islam-watch.org/AnwarSheikh/Islam-Arab-Imperialism.htm

বিশ্বাস-ধারণা সারা বিশ্বের লক্ষ-কোটি মুসলমানদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। তাই তো (অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ ব্যতিরেকে) হাজার-হাজার মসজিদ-মাদ্রাসা-মক্তবে লক্ষ-লক্ষ মুসলমান অহর্নিশ আরবি ভাষার চর্চা করে থাকেন। মার্কিন সাম্রাজ্যাবাদীদের মতো 'ইসলামি নেশায়' বুঁদ হয়ে থাকা মুসলিম ধর্মগুরুরা তাই সারা বিশ্বের স্থানীয় সংস্কৃতি-আচার-ব্যবহার-খাদ্যাভ্যাস-জীবনযাত্রার ধরন ইত্যাদি অস্বীকার-অবজ্ঞা করে একমাত্র নবী মুহাম্মদ, খলিফা এবং সাহাবি দ্বারা নির্দেশিত-চর্চিত পনেরশত বছর আগেকার আরবের কোনো এক স্থানীয় সংস্কৃতিকে বর্তমানকালেও এসে একমাত্র অনুসরণীয়-অনুকরণীয় বলে মনে করে। সেই কবে পনেরশত বছর আগে নবী মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের বোরকা-বন্দী করে হেরেমে রেখেছিলেন বলে এখনো, কী বাংলাদেশ, কী ভারত, কী পাকিস্তান, কী মালয়েশিয়া, কী রাশিয়া-আমেরিকা-ইংল্যান্ড-সুইজারল্যান্ড-নরওয়ে-থাইল্যান্ড-চীন সবখানেই, সবদেশেই নারীদের উপর বোরখা বা হিজাব নানা উছিলায় চাপিয়ে দিতে ইসলামপন্থীরা তৎপর। অমুসলিমদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা তো ইসলামি রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য নয়; তারা নিজেদের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কোরান শরিফে সরাসরি বলা হয়েছে, কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তা গ্রহণ করা হবে না। (সুরা ৩, আল-ইমরান, আয়াত ৮৫)। আর ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হাদিসে প্রফেট মুহাম্মদ বলেছেন, "I extend to you the invitation to accept Islam. Embrace Islam and you will be safe." (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ২৫, বুক ১৯, নম্বর ৪৩৮০; বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৩, নম্বর ৩৯২)। নিরাপদ থাকার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। আর ইসলাম গ্রহণ না করলে? নিরাপদ থাকতে দেওয়া হবে না, এই তো কথা। এবার অর্থনৈতিক দিকের খুব ছোট্ট একটি পয়েন্ট নিয়ে বলি। সারা বিশ্ব থেকে প্রতি বছর কতো লোক সৌদি আরবে ওমরা এবং হজ করতে যায় কখনো হিসেব করেছেন কি? বাংলাদেশ থেকে একজন হাজি হজের সময় কত টাকা বিমানের যাতায়াত ভাড়া, বাড়ি ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, কেনাকাটাসহ সৌদি সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকে তা জানলে মোট হাজির সংখ্যার সাথে গুণ দিয়ে বের হয়ে যাবে এক বছরে শুধু হজের মাধ্যমে সৌদি আরব কত টাকা লাভ করে থাকে। তাহলে বলেন তো সৌদি সরকার কেনইবা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য অনুদান দেবে না? কেনইবা ইসলামি জঙ্গিসংগঠনগুলোকে দুধ-কলা দিয়ে পুষবে না? আখেরে তো ধর্মবণিকদেরই মুনাফা। এরপর আছে মসজিদ-মাদ্রাসা, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসাপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ইত্যাদি খাত থেকে আয়। আবার ধরুন, কোনো পণ্যের কি গুণ, সেটা বাদ দিন, শুধু নামের মধ্যে 'আরবি ভাষা' বা 'ইসলাম', 'ইসলাম' গন্ধ থাকলেই হয়েছে। পণ্য কিনলেই সওয়াব হবে এমন একটা ভাব! আসলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সাথে বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের। উভয়েই দুনিয়াতে দামামা বাজাতে পারঙ্গম। অনেকে হয়তো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হানাদারদের দ্বারা আগ্রাসী যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলবেন। পাল্টা বলা যায়, নবী মুহাম্মদ জীবিত থাকতে (প্রফেট নিজে ২৭টি বড় যুদ্ধ সংঘটিত করেন এবং ৮৫টি ছোটখাটো 'অভিযান' মানে বিভিন্ন বাণিজ্যযাত্রীর সম্পদ দখলের জন্য অতর্কিতে হামলা করেন) এবং তাঁর খলিফা-সাহাবিরা আরব ভূখণ্ডে ঠিক কতটি যুদ্ধ করেছিলেন তা ইতিহাসের অথেন্টিক গ্রন্থ থেকে জেনে নিতে অনুরোধ করছি[৩৪]। বর্তমান কালে আল্লাহর সৈনিকরা যা করে চলছেন তা নিশ্চয়ই এতো দ্রুত বিস্মৃত হননি। অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসীরা বলবেন এগুলো শান্তির জন্য! ওনারা হয়তো ভুলে যান বর্তমান প্রজন্মের মার্কিন হানাদার বাহিনীর যুদ্ধের সমর্থকরাও একই কথা বলে থাকে। ইসলামের জন্য কিংবা খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করলে সেটা প্রতিষ্ঠার শান্তি জন্য হয় আর আমেরিকা-বিট্রিশদের যুদ্ধ হচ্ছে স্রেফ ঔপনিবেশিকতাবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ - এই 'ডবল স্ট্যান্ডার্ড', ধোপে টিকবে না। এখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সাফাই গাওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা করে আমাদের চিরন্তন মুসলিম মননের দ্বৈত সত্ত্বাকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই লক্ষ্য। আরব সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয় Bat Ye'Or এর 'Eurabia' গ্রন্থটি পাঠ করলে[৩৫]। লেখক বস্তুনিষ্ঠভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ইসলাম কিভাবে 'সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জিহাদের' মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইউরোপকে অধিকার করে 'ইউরাবিয়া'তে পরিণত করে ফেলছে। একই উচ্চারণ আমরা দেখি Bruce Bawer এর While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West

[৩৪] ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য মুহম্মদের প্রথমদিককার জীবনীকারদের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে গন্য করা হয়। কারণ তাদের বর্ণনা অতিরঞ্জন এবং বিকৃতিমুক্ত। মুহম্মদের প্রথম জীবনীকার হচ্ছেন ইবনে ইসহাক। তিনি জন্মেছিলেন মুহম্মদের মদীনায় হিজরতের ৮৫ বছর পরে। তিনি মুহম্মদের যূদ্ধ এবং সংগ্রামের ইতিহাস নথিবদ্ধ করেছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম ছিলো 'সিরাত-আল-নবী' বা সংক্ষেপে 'সিরাত'। বইটি পরবর্তীতে ইবনে হিশামের ভাস্য সহযোগে ইংরেজী সহ বহুভাষায় অনুদিত হয়। এছাড়া, ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় সবচেয়ে প্রমান্য দলিল হিসেবে গন্য করা হয় ইবনে সাদের তাবাকাত, সহি বুখারি, এবং তারিখ আল্ তাবারি'র তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুককে। এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায় মুহম্মদ দস্যুদলের মত উটের কাফেলায় অতর্কিতে হানা দিয়ে বা হঠাৎ আক্রমণ করে ধণ সম্পদ লুণ্ঠন করতেন যেগুলোকে পরবর্তী কালের ইতিহাসবেত্তাদের দ্বারা 'যুদ্ধ' হিসেবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। তাবাকাত থেকে জানা যায়, মহানবী তার শেষ দশ বছরে অন্ততঃ ৭৪ টি 'হানা যুদ্ধ' (Raid) সম্পন্ন করেছিলেন। আল তাবারি নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবনে ঘটা যে ষাটটি যুদ্ধ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এর মধ্যে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া সবগুলোই ছিল আক্রমণাত্মক।

[৩৫] Eurabia: The Euro-Arab Axis, Bat Ye'Or, Fairleigh Dickinson University Press (January 31, 2005)

from Within গ্রন্থে[৩৬] - ইউরোপ যখন শীতনিদ্রায় মগ্ন, তখন কিভাবে আরব আধিপত্যবাদ পশ্চিমকে গ্রাস করে ফেলছে। ইউরোপ পর্যন্ত যাওয়ার দরকার কি, মুহম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে মুসলিম সভ্যতা যেভাবে ভারতবর্ষকে যেভাবে গ্রাস করে ফেলেছে তাকে মুসলিম আধিপত্যবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া কি বা বলা যায়? উদারপন্থি (বলা উচিৎ 'মুরতাদ') সম্রাট আকবরের শাসনামল ছাড়া বাকি কোন সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বস্তিতে বসবাস করতে পারতো তার কোন নমুনা ইতিহাসে মেলে না। বিশেষত সুলতান মাহমুদ[৩৭] এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে যেভাবে দমন নিপীড়ন চালিয়ে সাধারণ জনগনকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে, যেভাবে জিজিয়া কর আর খরজ কর আরোপ করা হয়েছে, যেভাবে মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে আর হিন্দু নারীদের যেভাবে হারেমে বন্দী করে দাসী বানানো হয়েছে তা সত্যই লজ্জাজনক[৩৮]। বিষয়টি অনেক ব্যাপক, কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধের পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আপাতত এখানেই ক্ষান্ত দিতে হচ্ছে। তবে একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, ইতিহাস সংক্রান্ত নিরপেক্ষ সমালোচনার সংস্কৃতি ইসলামী বিশ্বে এখনো গড়ে ওঠেনি। ইসলাম নিয়ে সামান্য সমালোচনা করলে, কিংবা ইসলামের অমানবিক-কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তুললেই কথায়-কথায় কাফের-মুরতাদ, ইহুদি-নাসারাদের এজেন্ট, ইসলাম ব্যাসার, ভারতের দালাল ইত্যাদি অভিধায় বিশেষত হতে হয়, এর পিছনে কোন কারণ থাকুক আর নাই থাকুক। এ কথা অনস্বীকার্য, মুসলিমরা আজ আমেরিকা-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে যতটা উচ্চকণ্ঠ, ঠিক ততটাই নীরব থাকেন নিজেদের 'জ্ঞাতিভাই' আরব সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায়।

২

বাংলাদেশের অত্যন্ত সুপরিচিত মনীষী, নির্ভিক নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ তাঁর '*গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র ও বিচিত্র-ভাবনা*' গ্রন্থে বলেছিলেন : "মানুষের অবচেতন-অস্পষ্ট জীবন চেতনার মূলে রয়েছে ভয়-বিস্ময়, ভক্তি-ভরসা ও কল্পনা। এতে বলতে গেলে জ্ঞান-বুদ্ধি যুক্তির ঠাঁই সংকীর্ণ ও নিতান্ত সামান্য।" বিধাতা, গড, আল্লাহ্ ভগবান বা ঈশ্বরকে চেনার জন্য সক্রেটিস, কোপার্নিকাস, দান্তে, ম্যাকিয়াভেলি, মার্টিন লুথার কিং, ব্রুনো, গ্যালিলিও, ডারউইন, জন স্টুয়ার্ট মিল, টমাস পেইন, রুশো, ইমানুয়েল কান্ট, কার্ল মার্কস্, অস্কার ওয়াইল্ড, মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট, সিমোন দ্যা বোভেয়ার, জ্যাঁ পল সার্ত্র, বার্ট্রান্ড রাসেল, মিশেল ফুকো কিংবা জগতের অন্য কোনো দেশের বুজুর্গ দার্শনিক-মনীষীর বই পড়ার দরকার পড়ে না। আমাদের বাংলাদেশেরই ড. আহমদ শরীফের 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র-ভাবনা', আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধানে', মোস্তফা মীরের 'উল্লেখ্য', ড. হুমায়ুন আজাদের 'আমার অবিশ্বাস', মাহমুদ শামসুল হকের 'নারী কোষ', শফিকুর রহমানের 'পার্থিব জগৎ' ও 'হিউম্যানিজম'—এই ক'টি বই-ই যথেষ্ট। উপরোল্লিখিত লেখকদের যুক্তি, তত্ত্ব-তথ্যবহুল লেখা বা তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর, তাদের দার্শনিক জিজ্ঞাসার সমাধান ধর্মে-বিশ্বাসীরা কোনোদিন দিতে পারেনি, পারবেও না মনে করি; 'বিভ্রান্তি' ছড়ানো ছাড়া। ধর্ম মানুষকে-সমাজকে-জাতিকে পেছনের দিকে টানে। যে কোনো ধর্মাবলম্বীর ধার্মিক হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো—স্বধর্মকে Superior (শ্রেষ্ঠ) আর অন্য ধর্মকে Inferior (নিকৃষ্ট) মনে করা। কোরান শরিফের ১০৯ নম্বর সুরা 'কাফেরুনে'র শেষ আয়াত 'লাকুম দ্বী-নুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন' অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার, আর বাইবেলের 'Love thy neighbours' (প্রতিবেশীকে ভালোবাসো), হিন্দুদের 'অতিথি নারায়ণ'-এর মতো কাল্পনিক-অসাড় শ্লোক-বাণী প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থেই কম-বেশি আছে। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন নেই, চর্চাও নেই। উদাহরণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না; আমাদের পাশের দেশ ভারতে হিন্দু মৌলবাদীরা প্রত্যেক বছরই যেভাবে মুসলিম, খ্রিস্টানদের পাইকারি হারে হত্যা করছে, তাদের উপাসনালয় ভেঙে-গুড়িয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশে মুসলিমরা হিন্দুদের, আহমদিয়াদের কিংবা পাহাড়ী আদিবাসীদের উপর যেভাবে অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, পরিকল্পিত গুম-সন্ত্রাস পরিচালনা করছে, বাংলাদেশে তো আহমদিয়াদের সমস্ত ধর্মীয় প্রকাশনা গত বিএনপি-জামাতের চার দলীয় জোট সরকার ২০০৪ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, পাকিস্তানে মুসলিমরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টানদের উপর যেসব সংঘবদ্ধ আক্রমণ পরিচালনা করছে, সেটা ডিঙিয়ে এখন শিয়া-সুন্নি-আহমদিয়া দ্বন্দ্ব, একে অপরের উপাসনালয়ে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে নিজেদের ঈমানের পরীক্ষা দিচ্ছে, তা দেখে কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক-কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের তথাকথিত পবিত্র ধর্মগুলোর শান্তিময় বাণীর ওপর আস্থা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর-দুঃসাধ্য বটে। তাই বলতে হয়, ধর্মই মানুষকে সময়ে-সময়ে বানায় বদমায়েশ, কাম-উন্মাদ, বর্ণবাদী, ভণ্ড, স্বার্থপর, বৈষম্যবাদী, প্রতারক, মৌলবাদী, জঙ্গি-প্রতিক্রিয়াশীল সে যে কোনো ধর্মই হোক। ধর্মে বিশ্বাসীরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন ধর্মে বিশ্বাস রেখেও কি মুক্তমনা হওয়া যায়? সোজা এবং সরাসরি উত্তর হলো, হওয়া যায় না। 'মুক্তমন' বলতে চিন্তার স্বাধীনতা বুঝায়, আর ধর্ম হলো চিন্তার

[৩৬] While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within, Bruce Bawer, Anchor (September 11, 2007)

[৩৭] Based on the records of Muslim historians, Sultan Mahmud's repeated invasions of Northern India had reduced the Hindu population by about two million as estimated by Prof. KS Lal

[৩৮] এমনকি উদার পন্থি বলে বিবেচিত সম্রাট আকবরের হারেমেও পাঁচ হাজার নারী ছিলো।

পরাধীনতা, চিন্তার দাসত্ব। দুটোর সহাবস্থান কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ধার্মিকের দেহ-মন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, অর্থবিত্ত, মান-সম্মান, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক ও মালিক একমাত্র ঈশ্বর। দু-জন মুক্তমনা নর-নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও ঘর-সংসার করতে পারে, দুজন ধর্ম বিশ্বাসী নর-নারীর মনে চাইলেও তা করতে পারে না। জীবদ্দশায় ইচ্ছা থাকলেও তাদের দেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মৃত্যুর পরে কাউকে দিতে পারে না। ভয়, এসব করতে চাইলে তাদের রেশম কোমল 'ঈমান' নষ্ট হয়ে যেতে পারে! তারওপর রয়েছে মোল্লা-মৌলভী-ইমাম-আলেম-ওলামা ইত্যাদি সমাজপতিদের রক্তচক্ষু; যা উপেক্ষা করে 'মেরুদণ্ড' খাড়া করা অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হয় না। আধুনিক যুগের শিক্ষিত, ভদ্র, বুদ্ধিমান, সহজ, সরল বিশ্বাসী মুসলমানদের অনেকে আশা করেন মোঘল সম্রাট আকবরের 'দ্বীন-ই এলাহি' ধর্ম নতুন করে আবিষ্কার করার। আরবের রাজতন্ত্র তারা মানেন না, মানতে পারেন না, ৯/১১-তে ইহুদি-খ্রিস্টানদের অকাল মৃত্যুতে তাদের প্রাণ কাঁদে, তারা হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই শ্লোগান দেন, সিলেটের শ্রীমঙ্গলের কমলগঞ্জ গ্রামের নূরজাহানের পক্ষ নিয়ে মৌলানা মান্নানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, তারা আফগাস্তিানের বৌদ্ধমূর্তি ভাঙা সমর্থন করেন না। কিন্তু একই সাথে অমুসলিম কারো মৃত্যুসংবাদ শুনে কোনো কোনো মুসলমান বলেন : 'ফি না-রি জাহান্নামা খা-লিদিনা ফি-হা আবাদা' (অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথে অনন্তকালের জন্য তোমরা ঢুকে পড়ো ভয়ঙ্কর জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে)। 'কাফের' মারা গেলে মুসলমানদের তো খুশি হওয়ারই কথা। তারা কি ভুলে গেছেন নবীজির সেই হাদিস? 'আল্ মুসলিমু আখুল মুসলিম' অর্থাৎ মুসলমান মুসলমানের ভাই। (দ্রষ্টব্য : সহি মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৮, বুক ৩২, নম্বর ৬২১৯)[৩৯]। মুসলমান হিন্দুর ভাই হবে কেন? কিংবা ইহুদি-খ্রিস্টানদের? মুসলমানদের 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' যেভাবে তাঁর জীবদ্দশায় 'রজম' (পাথর মেরে হত্যা) নামক অমানবিক-নৃশংস শরিয়ার আইনটির দ্বারা বহু ব্যাভিচারী নরনারীকে পাথর মেরে হত্যা করেছিলেন। (কোরানে ব্যভিচারের জন্য পাথর ছুড়ে হত্যা করার বিধান ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে খলিফা ওসমানের সময়কালে কোরান সম্পাদনায় এই আয়াত 'গায়েব' করে দেওয়া হয়।[৪০]) হযরত আস শাবানি হতে বর্ণিত : "আমি আব্দুল্লাহ বিন আবু আউফকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রসুল কি রজম বিধান (পাথর মেরে হত্যা) কারো উপর প্রয়োগ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সুরা নুর নাজিল হওয়ার আগে না পরে? তিনি বললেন, তা জানি না।" (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৮২, নম্বর ৮০৪)। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারি বর্ণনা করেছেন : "বনি আসলাম গোত্রের এক বিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর রসুলের কাছে চারবার স্বীকার করলো সে এক নারীর সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছে। নবীজি তাকে পাথর মেরে হত্যার আদেশ দিলেন, যেহেতু সে বিবাহিত ছিল। পাথর মারায় আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। মুসালা'য় তাকে পাথর মারা শুরু হলো। পাথরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে লোকটি দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইলো। আমরা তাকে দৌড়িয়ে আল-হারা'য় ধরে ফেললাম এবং সেখানে তাকে পাথর মেরে হত্যা করলাম। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৮২, নম্বর ৮০৫)। এই ঘটনাটি ৮১৪ নম্বর হাদিসে হযরত হুরায়রা-ও (রাঃ) একইভাবে বর্ণনা করেছেন। 'পাথর মেরে হত্যার বিধান' সম্পর্কিত হাদিস জানতে দেখুন : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৮২, নম্বর ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬)। প্রশ্ন ওঠতে পারে, ব্যাভিচারী নারী-পুরুষকে পাথর মেরে হত্যার বিধান কি কোরান সমর্থিত? এই প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আমরা আরো একটি হাদিস জেনে নেই। দীর্ঘ এ হাদিসটিতে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) খেলাফত গ্রহণকালের কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, আমরা এখানে পরিসর সীমিত রাখার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে 'রজম' (পাথর মেরে হত্যা) সম্পর্কিত অংশটুকু ইংরেজিতে তুলে দিলাম :

> Narrated Ibn `Abbas: Umar sat on the pulpit and when the callmakers for the prayer had finished their call, Umar stood up and having glorified and praised Allah as He desereved, he said, 'Now then, I am going to tell you something which Allah has written for me to say, Allah sent Mohammed with the Truth and revealed the Holy Book to him, and among what Allah revealed, was the verse of the 'Rajam' (the stoning to death of married person) who commits illegal sexual intercourse, and we did recite this Verse and understood and memorized it. Allah's Apostle did carry out the punishment of stoning and so did we after him. I am afraid that after a long time has passed, somebody will say, 'By Allah, we do not find the Verse of the Rajam in Allah's Book,' and thus they will go astray by leaving an obligation which Allah has revealed. (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৮২, নম্বর ৮১৭)।

তাহলে কোথায় সেই আয়াত? কে কবে 'আল্লাহর ওহি' কোরানের আয়াত গায়েব করে দিলেন? শোনা যায় আমাদের নবীজি মৃত্যুশয্যায় তখন 'আল্লাহর ঐ বাণী' না-কী হযরত আয়েশার বালিশের নীচে থেকে বের করে এক দাঁড়িওয়ালা ছাগল খেয়ে

[৩৯] Abu al-Hussain b. al-Hajjaj al-Qushairi Muslim, *Sahi Muslim Hadith*, translated in English by Abdul Hamid Siddiqui; the internet version can be read at : http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/muslim/index.html

[৪০] বিস্তারিত জানতে আরো দেখুন, W. H. Temple Gairdner, Iskandar 'Abdu'l-Masih, and Sali 'Abdu'l-Ahad, *The Verse of Stoning in the Bible and the Qur'an*, The Christian Literature Society, 1910; The internet version can be read at : http://www.answering-islam.org/Books/Gairdner/index.htm

ফেলেছিলো! এরপরও কোনো দরদী মুসলমান পাঠক যদি আগ্রহী হয়ে কোরানের গায়েব হয়ে যাওয়া আয়াতের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান, তবে কষ্ট করে 'শিয়া মুল্লুক' ইরানে একটু বিরতি নিবেন, হয়তো বকরিতে খাওয়া এই ধরনের আরো আয়াত এখনো ওদের কাছে থাকলেও থাকতে পারে; মাঝেমাঝে ওদের আশেপাশে থেকে তো 'রজম'-এর খবর পত্রিকা মারফত আমাদের কানে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি, নবী মুহাম্মদ (দঃ) সুরা নুর রচনা করেছিলেন, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে ব্যাভিচারিণীর বদনাম রটনার একমাস পরে। যাহোক, আপনারাই বলেন, 'হাদিস' মানলে মুসলিমদের কি সিলেটের শ্রীমঙ্গল উপজেলার মেয়ে নূরজাহানের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলে 'আল্লাহর ওহি' কোরানের আয়াতটির অবমাননা করা নয়?

এখন আমরা চলে যাই ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি মক্কা দখলের দিনে। সেদিন আবু সুফিয়ানের বংশধরের অতি আদরের অসীম ভক্তির সাথে বহু কষ্টে গড়া ৩৬০টি দেবতার মাথা ভেঙে চুরমার করা হলো তাদের চোখের সামনে (অথচ এ মূর্তিগুলোকে একসময় নবী মুহাম্মদের পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষেরা অত্যন্ত ভক্তিভরেই পূজা করতেন)। একজন সাহাবিও উঁহু করলেন না। নবীজি সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে নির্দেশ দিলেন প্রতিবেশী গোত্রের যত পৌত্তলিক উপাসনালয় আছে, তা ধ্বংস করে ফেলতে। খালিদ তরবারি উঁচিয়ে মক্কার জাজিমা গোত্রের লোকদের বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো; তারা অস্বীকার করলো, বললো 'আমরা সাবিয়েন'। এতেই নবীজির যোগ্য সেনাপতি খালিদ জাজিমা গোত্রের সকলকেই হত্যা করেন। একই বছরের (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) জুলাই মাসে নবীজি হযরত আলিকে দিয়ে তাঈ সম্প্রদায়ের এক পৌত্তলিক গোত্রের ফালস্ (Fuls) দেবতার মনুষ্যাকৃতির মূর্তি ও উপাসনালয় ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন, তাদেরকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করলেন। এ ইতিহাস কি আজকের আধুনিক মুসলিমরা ভুলে গেছেন? নাকি জেনেও স্বীকার করতে রাজি নন? নবী মুহাম্মদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, মুহাম্মদের মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে আউস গোত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আবু আমির মুহাম্মদের 'নবীত্ব'কে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি অন্যান্য গোত্রপ্রধানদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন, মুহাম্মদ ঐশী বাণীর দোহাই দিয়ে একেশ্বরবাদকে বিকৃত করেছেন। এমন কি আরবের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ী যাত্রী দলের উপর নবী মুহাম্মদের 'আক্রমণ'কে আবু আমির 'রাহাজানি', 'লুণ্ঠন' হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাঁকে 'বিপজ্জনকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আবু আমিরের অনুসারীরা মদিনার ওয়েসিসের কাছে প্রার্থনা ঘর হিসেবে একটি মসজিদ স্থাপন করেছিল; পাশাপাশি এটি দুঃস্থ ও দরিদ্রদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কোরানে উল্লেখ আছে : "(মুনাফিকদের মধ্যে) যারা ক্ষতিসাধন, সত্য প্রত্যাখ্যান ও বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল তার (আবু আমিরের) জন্য যে পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। তারা হলফ করে বলবে, 'আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এটা করেছি।' আল্লাহ সাক্ষী, নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যেবাদী।" (সুরা ৯, তওবা, আয়াত ১০৭)।* কোরানে মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের আবু আমিরের মসজিদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিলেন : "তুমি নামাজের জন্য এর মধ্যে কখনো দাঁড়াবে না...। ওদের ঘর যা ওরা তৈরি করেছে তা ওদের সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যে-পর্যন্ত না ওদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।" ইংরেজি আয়াতে আমরা পাই, "Never stand you therein...The building which they built will never cease to be a cause of hypocrisy and doubt in their hearts, unless their hearts are cut to pieces. (i.e. till they die). And Allah is All-Knowing, All-Wise." (সুরা ৯, তওবা, আয়াত ১০৮, ১১০)। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়াতে আবু আমির মারা গেলে এই প্রার্থনা-ঘরটি নবী মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে এবং পরবর্তীতে এ স্থানকে মলমূত্রের স্থান হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। বলা যায়, মূর্তি-উপাসনালয়-ভাস্কর্য ভাঙা ইসলামের সহজাত এবং তা প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই চলে আসছে। তাহলে ২০০১ সালের মার্চ মাসে আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে তালেবানদের দ্বারা বৌদ্ধদেবের মূর্তি ভাঙায় ঈমানদার মুসলমানের উল্লাসিত হওয়া উচিৎ নয় কি? নবীজির পূর্ণ জীবনটাই আল কোরান, আর কোরান তো মুসলমানদের জন্য 'A Complete Code of Life' (একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান)। এই লেখা যখন শেষ করে নিয়ে আসছি, তখন জানতে পারলাম ১৪ই অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গোলচত্বরে বাংলার চারণ কবি লালনের স্মরণে নির্মাণাধীন বাউল ভাস্কর্যটি কওমি মাদ্রাসার কয়েকশ ছাত্র ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। এরপর ২৯শে নভেম্বর তারিখে 'আঞ্জুমানে আল বাইয়্যিনাত' নামের আরেকটি মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রায় চারশ কর্মী হাতুড়ি-শাবল দিয়ে রাজধানী ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত 'বলাকা' ভাস্কর্যটিও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ, তাদের উভয়ের দাবি ভাস্কর্য ইসলাম-বিরোধী (সুরা ১৪, ইব্রাহিম, আয়াত ৩৫-৩৬); তাই বাংলাদেশ থেকে সব ভাস্কর্য-মূর্তি-ছবি নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করে ফেলার ঘোষণা দিয়েছে।

প্রায়শ মুসলমানেরা বুঝে, না-বুঝে দাবি করেন, কোরান শরিফেই লিপিবদ্ধ আছে অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ দুনিয়ার যাবতীয় সব জ্ঞান; একমাত্র এই বইয়েই আছে জগতের সকল মানুষের ইহকাল ও পরকালের সকল সমস্যার সমাধান! পনেরশত বৎসর যাবৎ বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান বইখানি সাদরে, সমাদরে, মগজে, চেতনায়, বুকে-অন্তরে ধারণ করে রাখলো। ফল কি হলো? পনেরশত বৎসর কোরান পড়ে কোন্ বিজ্ঞানী কোন্ জিনিষটা আবিষ্কার

* কোরানশরিফ : সরল বঙ্গানুবাদ, অনুবাদক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, (প্রথম প্রকাশ ২০০০), নবম প্রকাশ ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৫১।

করলেন? অথচ বিজ্ঞানের যে কোনো নতুন আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় যত দ্রুত সম্ভব বিজ্ঞানের ঐ আবিষ্কারের তথ্য ঈমানদার মুসলমানেরা কোরানের মধ্যে খোঁজ পেয়ে গেছেন! যদি অমুসলিমরা বিজ্ঞানের নতুন কোনো তথ্য-তত্ত্ব আবিষ্কার করে থাকে তবে অমুসলিমরা নাকি 'কোরান গবেষণা' করেই ঐ আবিষ্কার করেছে, এরকম একটি জোর কলরব সৃষ্টি করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, অমুসলিমদের দ্বারা বিজ্ঞানের ঐ বিষয়ে আবিষ্কারের আগে কোনো মুসলিম পণ্ডিত, আলেম-ওলামারা কিন্তু কোরানে এ বিষয়ে কি কি ইঙ্গিত দেওয়া আছে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেন না বা দেন না। কেন দেন না বা দিতে পারেন না সেটা আজকের যুগের যেকোনো যুক্তিবাদী মানুষেরা সহজেই বুঝতে পারেন বা জানেন; কারণ, এই সব 'কাব্যিক ধাঁচের ভাসাভাসা উপমাশ্রয়ী' আয়াত থেকে মোটেই বৈজ্ঞানিক তথ্যের কোনো সুবিস্তৃত বিবরণ বা ব্যাখ্যা খোঁজে পাওয়া যায় না। কোরানের আয়াত ব্যাখ্যা করার ধরনটাও সম্পূর্ণরূপে একটি কাব্যগ্রন্থ ব্যাখ্যার মতো। কাব্যগ্রন্থ যেমন বিভিন্ন যুগে নিজের মতো করে বিভিন্ন জনের যথেচ্ছ ব্যাখ্যার সুযোগ রয়ে যায়, যার ফলে একই সাথে একটি কাব্যের অনেকগুলি পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; ঠিক তেমনি কোরানের আয়াতের টীকা-ব্যাখ্যা-অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা তাই দেখতে পাই।

উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানের সাথে কোরানের আয়াতকে 'গোঁজামিল' দিয়ে মেলানোর ব্যাপারটি যদি ধরি তবে বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। কোরানের ২: ২২, ১৩: ৩, ১৫: ১৯, ১৮: ৪৭, ১৮: ৯০ প্রভৃতি সুরায় খুব পরিস্কারভাবে সমতল পৃথিবীর বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। সমতল পৃথিবীকে বুঝানোর জন্য একে বিছানার সাথে তুলনা করা হয়েছে (মাদ্দা, মাদাদনা, মাহ্‌দা, মাদাদনাহা, ফারাশনা, আল-মাহিদুন, বিসাতা, মিহাদা, দাহাহা, তাহাহা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে)। এছাড়া কোরানে যুলকার্ণাইনের কথা আছে, যিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখেছিলেন (১৮:৮৬)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আল-কোরাণের রচয়িতা ভেবেছিলেন পৃথিবী সমতল, এবং এর প্রান্ত আছে। প্রান্তের শেষে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে সত্যই সূর্য 'অস্ত যায়'। অথচ, বিজ্ঞান অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে যে, পৃথিবী সমতল নয়, পৃথিবী গোলাকার। এখন কথা হচ্ছে 'সর্বজ্ঞ' আল্লাহ কোরানের কোথাও কেন পরিস্কার করে বলতে পারলেন না যে পৃথিবী গোলাকার? এই লজ্জাকর প্রশ্ন এড়াতে গিয়ে এখন ডঃ জাকির নায়েক সহ কিছু ইসলামবাদী বিশেষজ্ঞ ইদানিং কোরানের সুরায় "দাহাহা" আবিস্কার করে বলতে শুরু করেছেন "দাহাহা" শব্দের অর্থ নাকি উট পাখির ডিম, আর আমাদের পৃথিবীটা উট পাখির ডিমের মত আকৃতির। অথচ, ইউসুফ আলি, পিকথাল এবং শাকির সহ সকলেই 'দাহাহা'কে বিস্তৃত (spread/ expanded) হিসেবেই ব্যবহার করেছেন, কেউই কোন ডিম খুঁজে পাননি। ডিমের আরবী হল 'আল বাঈজা'। অথচ মডার্ন ইসলাম বিশেষজ্ঞরা কোরাণে এখন 'ডিম'ই খুঁজে পাচ্ছেন না আবার ডিমকে 'কমলালেবুর মত গোলাকার' বানিয়ে পৃথিবীর আকারের সাথে জুড়ে দিচ্ছেন[৪১]।

অস্ট্রেলিয়া নিবাসী লেখক এবং পদার্থবিদ ড. প্রদীপ দেব মুক্তমনা সাইটে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানবিশ্বাস ও এক চিল্‌তে ইতিহাস' নামে। লেখাটি মুক্তমনার ই-বুক 'বিজ্ঞান ও ধর্ম, সঙ্ঘাত নাকি সমন্বয়'-এ সঙ্কলিত হয়েছে। লেখাটিতে প্রদীপ দেব লিখেছেন,

> যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি ধর্মবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভংগিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।
>
> এক - প্রাথমিক ভাবে কী আবিষ্কৃত হলো তা না জেনেই বলে দেয়া হয় যে এটা ধর্মবিরুদ্ধ, শয়তানের কারসাজী, এটাতে খোদা নারাজ হবেন।
>
> ২য় পর্যায়ে - যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং সবাই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করতে থাকে তখন ধর্মবিশ্বাসীরা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে যে এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সবকিছুই ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। ধর্মগ্রন্থের পাতায় পাতায় বিজ্ঞান। হুঁ হুঁ বাবা, ঐশ্বরিক গ্রন্থ হলো সকল বিজ্ঞানের উৎস!!
>
> আর তৃতীয় পর্যায় - শুরু হয় না-জায়েজ বিজ্ঞানকে ধর্ম-প্রচারে কাজে লাগানো। একটা উদাহরণ দিই - মাইক্রোফোন আবিষ্কারের পর ওটা ব্যবহার করে আজান দেয়াকে না-জায়েজ বলা হতো। (চট্টগ্রাম শহরের একটি মসজিদে মাইক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে এই সেদিনও মুসল্লীদের মধ্যে মারপিট হয়েছে।) আর এখন? বাংলাদেশের প্রতিটি শহরের হাজারো মসজিদের মাইক কী দৈনিক কী পরিমাণ শব্দ দূষণ করে তা যদি কেউ গবেষণা করে প্রকাশ করে তার জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে। কম্পিউটারে ভাগ্যগণনায় আজকাল দারুণ লাভ হয়।

[৪১] এ নিয়ে মুক্তমনার ই-বুক সংকলন 'বিজ্ঞান ও ধর্ম সঙ্ঘাত নাকি সমন্বয়' -এর চতুর্থ অধ্যায়ে বেশ কিছু ভাল লেখা সংকলিত হয়েছে। পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন।

ড. প্রদীপ দেবের উপরের উক্তিটির বাস্তব প্রয়োগ দেখা যাবে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে আধুনিক এবং শিক্ষত ধর্মবাদী ব্যক্তিবর্গের কাজকর্মে। কিছুদিন আগেও বিবর্তন তত্তকে পুরোপুরি ধর্মবিরুদ্ধ বলে ভাবা হত। বহু বই লেখা হয়েছে 'ইসলামী দৃষ্টিকোন' থেকে বিবর্তনতত্ত্বের 'অসারতা' দেখিয়ে। আমাদের দেশেই দেখবেন অনেক ইসলামি বুজুর্গব্যক্তি 'পৃথিবী উৎপত্তির বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যার' কঠোর সমালোচনা করে 'আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্টি'র কোরানের বক্তব্যের আলোকে প্রচুর বই লিখেছেন (যেমন মুহাম্মদ আঃ রহিমের বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব)। এ ছাড়া হারুন ইয়াহিয়া এবং জাকির নায়েকের নানা ধরনের বিবর্তন-বিরোধী সিডিতেও বাংলাদেশের বাজার সয়লাব। কিন্তু এখন যখন বিবর্তনের অব্যাহাত গতিকে আর সামলে রাখা যাচ্ছে না (বিশেষতঃ জেনেটিক্সের আগমনের পর বিবর্তন নিয়ে আসলে পশ্চিমের শিক্ষায়তনে কারো সন্দেহই নেই), তখন শুরু হয়েছে কোরাণে নতুন করে ধর্মগ্রন্থে 'বিবর্তন তত্ত্ব'কে খুঁজে পাওয়ার প্রক্রিয়া। মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডঃ অভিজিৎ রায় তার 'বিজ্ঞানময় কিতাব' লেখাটিতে দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছেন কিভাবে আধুনিক ধর্মবাদিরা নিরুপায় হয়ে কোরাণের ৪:১, ৭:১১, ১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রভৃতি আয়াতগুলোতে এখন বিবর্তনের আলামত খুঁজে পেতে শুরু করেছেন[৪২]। বাংলাদেশেও লেখা শুরু হয়েছে কোরআনের আলোকে 'প্রাণের প্রাগৈতিহাসিক উৎস এবং মানব মনের গুপ্ত রহস্য', 'কোরআন এবং জেনেটিক্স : সৃষ্টির এক গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত' টাইপের বই। অথচ বিজ্ঞানে এ ধরনের 'ভাসা ভাসা' জ্ঞানের কিংবা গোঁজামিল দিয়ে কোন কিছুকে ব্যাখ্যা করার কোন ব্যাপার নেই। কারণ বিজ্ঞানের যে কোনো তত্ত্বের যখন ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তখন এই তত্ত্বের প্রতিটি টার্মের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়, নির্দেশক (Indicator) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয় তত্ত্বটির পরিধি এবং অবশ্যই সেখানে 'ভাসাভাসা উপমাশ্রয়ী' কোনো বক্তব্যের রেশ থাকে না।

কোরানের আয়াতকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো অনুবাদের কারসাজি। ষষ্ঠ শতাব্দীর আরববাসীর ভাষায় কোনো শব্দের অর্থ, সংজ্ঞা, তাৎপর্য, ব্যাখ্যা যেরকম হওয়ার কথা, স্বাভাবিকভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, কোরান ঐ সময়ের রচনা বলে কোরানের সুরা-আয়াতের অর্থ, সংজ্ঞা, তাৎপর্য, ব্যাখ্যা অবশ্যই ঐ সময়কালের মধ্যে আবদ্ধ থাকার কথা; কিন্তু আমরা দেখতে পাই অসাধুতা, সুবিধাবাদিতার আশ্রয় নিয়ে (সময়ের পরিবর্তনে ফলে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংকোচন-প্রসারণ সাধিত হয়, তারও কিছুটা সুযোগ গ্রহণ করে; পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে এখানে বাংলা ভাষার বহুল ব্যবহৃত দুয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরতে পারি, যথা : 'সন্দেশ' শব্দটির মূল ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'সংবাদ' বা 'খবর' কিন্তু এখন তা আমাদের কাছে কেবল 'মিষ্টি জাতীয় কিছু'; আদিতে 'তেল' বলতে শুধু তিলের নির্যাস বোঝালেও বর্তমানে এই শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে সর্ষের তেল, নারকেল তেল, সয়াবিন তেল, ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন তেল ইত্যাদি সবকিছুকে বোঝায়; আবার 'মৃগ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে সকল প্রকার পশু কিন্তু বর্তমানে এই শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটেছে। এখন 'মৃগ' বলতে বোঝায় কেবল হরিণ।) কিংবা অসচেতনতার কারণেও অনেক সময় অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দের-বাক্যের এমন কি অক্ষরেরও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরির প্রয়াস চালানো হয়, যাতে বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণ করা যায়। বলে রাখা ভালো, অনুবাদের মাধ্যমে 'বিজ্ঞানসম্মত' প্রমাণের জন্য যে চাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে, তার সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূর্বের অনুবাদগুলোতে ব্যবহৃত শব্দ-বাক্যগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংস্কার করে, তার স্থলে বর্তমানকালের বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত শব্দ-পরিভাষা-টার্ম ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যাতে নতুন শব্দ-পরিভাষা-টার্মের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে আপাত মিল দেখানো সহজ হয়। কোরানে আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের 'আবিষ্কার' এর একটি চমৎকার উদাহরণ! যাহোক, মজার বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান আজ যেসব বিষয়ে এখনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি, যেমন বিজ্ঞানের শুধুমাত্র একটি শাখা 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' সম্পর্কে বলা যায় পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা (জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনো শুধু মহাকাশের বিশালায়তনের মধ্যে বহির্জগতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার গাণিতিক সম্ভাবনার কথা বলছেন), কিংবা থাকলে সেই প্রাণের স্বরূপ কি, অথবা মহাবিশ্বের সঠিক আয়তন, আকৃতি কেমন, ডার্কম্যাটারের অস্তিত্ব, আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে, তবে এখনো এ বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য আমাদের হাতে নেই। আশ্চর্যের বিষয়, ইসলামের আলেম-ওলামা থেকে সাধারণ মুসলিমরাও এ বিষয়ে চুপচাপ; তাদের কেউই বলছেন না, কোরান-হাদিসের কোথায় এ বিষয়ে কি বলা আছে? অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে আমরা আশঙ্কা করতে পারি আগামীতে যখনই জ্যোতির্বিজ্ঞান এ বিষয়গুলি নিয়ে তার গবেষণালব্ধ ফলাফল ঘোষণা করবে অমনি বিজ্ঞানের বক্তব্যকে আজ থেকে প্রায় পনেরশত বছর আগে 'উপমাশ্রয়ী-কাব্যিক ঢঙে লেখা' কোরান-হাদিসের আয়াতগুলিকে 'অনুবাদের চাতুরী আর গোঁজামিলের মাধ্যমে' বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লেগে যাবেন ইসলামের বুজুর্গব্যক্তিগণ; কারণ ইতোমধ্যে আমরা তো দেখেছি, বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কারের নমুনা সাচ্চা ঈমানদারেরা এরই মধ্যে কোরান-হাদিসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই ধরনের 'দুই নম্বরি' কাজ করেছেন। শুধু মুসলমান কেন, এই ধরনের চরিত্র প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায়, যারা ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে মেলাতে চান, গুলাতে চান। একটা সময় ছিল, ধর্মগুলো বিজ্ঞানের কণ্ঠ চেপে ধরেছিল, ওগুলো প্রচলিত বিশ্বাস-প্রথাবিরোধী-ঈশ্বরদ্রোহী বলে, অথচ আজ ধর্মগুলো

[৪২] বিজ্ঞানময় কিতাব, অভিজিৎ রায়, 'বিজ্ঞান ও ধর্ম সঙ্ঘাত নাকি সমন্বয়' এর চতুর্থ অধ্যায়, মুক্তমনা।

নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই বিজ্ঞানের কাঁধে চড়ে বসতে চাচ্ছে 'সিন্দাবাদের ভূতের' মতো; 'ধর্ম' আর 'ঈশ্বর' বিশ্বাসের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান! কিন্তু লক্ষণীয় ধর্ম-ধুরন্ধের কাছে এখনো ঐশীবাণীর পরিপন্থি কোনো যুক্তি-বিজ্ঞানের আবেদন নেই। আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি, ধর্ম-ধুরন্ধের দল যতোই বলুক, 'বিজ্ঞান'-'যুক্তি' আছে বলেই তারা ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাস করে থাকে, আসলে তা নয় বরং অন্ধভাবে ধর্মগ্রন্থকে 'ঐশীবাণী' হিসেবে বিশ্বাস করে বলেই যুক্তি, বিজ্ঞান নানা জায়গা থেকে জুটিয়ে আনে, গোঁজামিল দিয়ে মেলাবার চেষ্টা করে। এরপরও মুসলমানগণ কোরান না পড়ে, না বুঝে অন্ধভাবে চোখ বুজে কখনো বলে—বৈজ্ঞানিকরা নতুন এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না, যার সূত্র বা ইঙ্গিত আগে থেকেই কোরানে দেয়া হয় নাই। আবার কোনো তথ্য প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়ে বলে—কোরানে বৈজ্ঞানিক সূত্র খোঁজা অর্থহীন কারণ কোরান বিজ্ঞান শেখাতে আসেনি; এসেছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান শেখাতে! Stephen Hawkins-এর Pre History of Time পড়ে যারা বিগব্যাং-এর ব্যাখ্যা আল্লাহর সৃষ্টির বাণী 'কুন ফা-ইয়াকুন' (সুরা ৩৬, ইয়াসিন, আয়াত ৮২) মনে করেন, যারা 'ওয়া আরছালা আলাইহীম, তোয়াইরান আবাবীল' (সুরা ১০৫, ফিল, আয়াত ৩) পড়ে আবাবিল পাখির পায়ের মধ্যে আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপের সূত্র খোঁজে পান, তাদের সাথে বিতর্ক করা আসলে অর্থহীন!

কোরান ও বিগব্যাং

ইদানিং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ধর্মবাদীরা এবং 'স্কলার'রা কোরানের মধ্যে বিগ ব্যাং সহ সকল আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজে পান। কোরানে বিগ-ব্যাং থাকার আলামত হিসেবে তারা হাজির করেন নীচের আয়াতটিকে -

> 'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' (আম্বিয়া ২১:৩০)

কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কোন আলামত আছে? এর উত্তর দিতে গিয়ে মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অভিজিৎ রায় একটি সুলিখিত প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানময় কিতাব' এ বলেন -

'মহাবিজ্ঞানময় কিতাব-বিশেষজ্ঞ' এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগ-ব্যাং এর গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কোন আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই আয়াত আর তার পরবর্তী আয়াতগুলের দিকে তাকানো যাক -

> 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' (আম্বিয়া ২১:৩০)
>
> 'এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে।' (আম্বিয়া ২১:৩১)
>
> 'এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ' (আম্বিয়া ২১:৩২)
>
> 'আল্লাহই উর্ধ্ব দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন' (রা'দ ১৩:২)

এই আয়াতগুলি আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্কে আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে 'স্তম্ভ বিহীন' ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বত মালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোন কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় 'আকাশ ভেংগে পড়ার' হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি করলেন? আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির উপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কি করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' - এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগ-ব্যাং) এর প্রমান হয়, তবে কোথায়

এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? 'বিগ-ব্যাং' শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায় রয়েছে সেই বিখ্যাত 'ব্যাং' (বিস্ফোরণ)-এর ইঙ্গিত?

উপরন্তু, পদার্থবিজ্ঞানে 'বিগ ব্যাং' স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগ-ব্যাং এর প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে। উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে 'মিশে থাকার' (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যার কোন অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে বলছে উভয়কে 'পৃথক করে' (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে আবারও যার কোন অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা মূলতঃ 'হযবরল' ছাড়া আর কিছুই নয়, বিগ ব্যাং তো অনেক পরের কথা।

কাজেই কতগুলি অর্থহীন শব্দমালা -'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' কখনই বৈজ্ঞানিকভাবে 'বিগ ব্যাং'কে প্রকাশ করে না । কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির চারটি বল- শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মধ্যাকর্ষণ বল 'একীভূত শক্তি' (super force) হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কিভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে? কি ভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি? উত্তর নেই।

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং আঁদ্রে লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে, আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা। এ ধারনায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।

কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাংই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাং-এর আগে কি ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে। আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই 'উত্তপ্ত বিগ ব্যাং' - যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব । আঁদ্রে লিন্ডের কথায় :

> '১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাং-এর অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং-ই বরং ইনফ্লেশনারী মডেলের অংশবিশেষ।'

এখন কথা হচ্ছে, বিগব্যাং এর মডেল কখনো ভুল প্রকাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত / পরিশোধিত হলে কি হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাং-এর সাথে 'সঙ্গতিপূর্ণ' আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল'-এই আপ্তবাক্যের কি হবে? এই ধরণের আশংকা থেকেই কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরানের আয়াতের সাথে মিশাতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন ,

> 'বিগব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কি হবে?

> তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?'
>
> খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি 'বিগ ব্যাং' প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে 'অভ্রান্ত' হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে?
>
> (উৎসঃ বিজ্ঞানময় কিতাব, অভিজিৎ রায়, 'বিজ্ঞান ও ধর্ম, সংঘাত নাকি সমন্বয়, মুক্তমনা ই-বুক)

ইসলাম ধর্মের সব থেকে সম্মানিত কেতাব কোরান শরিফ। ইসলামিক থিওলজি মতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে নবী-রসুল হযরত মুহাম্মদের ওপর নাজিল হওয়া কেতাব সম্পর্কে মুসলমানদের 'সম্মান ও পবিত্রতার' ধারণাকে প্রাচ্য গবেষক আলফ্রেড গিয়োম অল্প কথায় বর্ণনা করেছেন এভাবে[৪৩] : "It is the holy of holies. It must never rest beneath other books, but always on top of the, one must never drink or smoke when it is being read aloud, and it must be listened to in silence. It is a talisman against disease and disaster." এতো সম্মানিত ও ভালোবাসার গ্রন্থ মুসলমানদের জন্য ব্যক্ত করে, "নিশ্চয়ই এ কোরান বিশ্বাসীদের জন্য একটি সঠিক নির্দেশনামা, আর যারা ভাল কাজ করে, তাদের জন্য ঘোষণা করে পরকালে মহাপুরস্কার।" (সুরা ১৭, বনি ইসরাইল, আয়াত ৯)। এখানে 'বিশ্বাস' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? অন্য ধর্মগ্রন্থানুসারীরা যারা ভাল কাজ করে এবং বিশ্বাস করে তাদের ধর্মগ্রন্থ সত্য, তাদের নবী সত্য, তারা কি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত লোক? বিশ্বাসী তাদেরকেই বলা হয়েছে যারা মুহাম্মদের (দঃ) দলভুক্ত। মহাপুরস্কারের লোভ দেখানো হয়েছে, মানুষকে নিজ দলভুক্ত করে সঙ্গবদ্ধ করার লক্ষ্যে। সুরা বনি ইসরাইলের ১০নং আয়াতে বলা হয়েছে : "তাদের জন্য সতর্কবাণী যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আর তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি ভয়ঙ্কর শাস্তি।" ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয় দেখানোর মানেটা কি? জগতের কিছু মানুষ পরকালে বিশ্বাস না করুক, মুহাম্মদ (দঃ) ও আল্লাহকে অমান্য করুক, সেটা তো আল্লাহরই কাম্য। মানুষ সৃষ্টির আগেই আল্লাহ নরক সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি, আল্লাহর নরক সৃষ্টির কারণই প্রমাণ করে তিনি নিশ্চয়ই চান না, সকল মানুষ বেহেস্তি হউক। সুরা বাকারার ৯৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে সুস্পষ্ট কোরানের আয়াতসমূহ পাঠিয়েছি (যাতে রয়েছে ইহুদি ও তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ)। কোরানের আয়তসমূহে যারা বিশ্বাস করে না তারাই অবাধ্য, দুর্বৃত্ত"; বুঝা গেল—ভাল মানুষ হওয়ার শর্তই হলো কোরানে ঈমান আনতে হবে, নবী মুহাম্মদের দলে আসতে হবে, অন্যথায় সকল সততা, সকল মহৎ কাজ, সবই ব্যর্থ। এই আয়াতের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে, যারা কোরানের আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে তারা নবী মুহাম্মদের বেহেস্তি দল, আর যারা বিশ্বাস করে না তারা অবাধ্য-দুর্বৃত্ত, নরকে শাস্তি প্রাপ্যের দল। নবীর জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় এসে মুহাম্মদ (দঃ) যখন দেখলেন কিছু লোককে কোনোভাবেই বিশ্বাস করানো সম্ভব হচ্ছে না যে, তিনি 'নবী' ও তাঁর 'কোরান' একখানি ধর্মগ্রন্থ, তখন 'আল্লাহ'র নাম দিয়ে বললেন : "ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ কখনই তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম মেনে নাও। তাদেরকে বলো, আল্লাহর হেদায়েতই (ইসলামি আদর্শ) একমাত্র হেদায়েত, আর তোমার কাছে যা নাজেল হয়েছে তার পরেও তুমি যদি ইহুদি বা খ্রিস্টানদের ধর্ম অনুসরণ করো, তাহলে তোমাকে সাহায্য বা রক্ষা করার কেউ থাকবে না।" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ১২০)। সুরা বাকারার ১৪৫নং আয়াতে আল্লাহ (মুহাম্মদ?) আরও বলেন,

> "আর যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে (ইহুদি, খ্রিস্টান), তাদের কাছে যদিও তুমি সকল আয়াত (প্রমাণ-নিদর্শন) নিয়ে আসো, তবুও তারা তোমার পথ মানবে না, আর তুমিও তাদের পথ অনুসরণ করতে পারো না। আবার তাদের কেউ কেউ পরস্পরের অনুসারী নয়। আর তোমার কাছে জ্ঞানের যা কিছু এসেছে তারপরেও তুমি যদি তাদের পথ অনুসরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই হবে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

এই আয়াতের ইংরেজি করা হয়েছে এভাবে :

[৪৩] Alfred Guillaume, *Islam*, Harmondsworth, 1978, Page 74.

> And even if you were to bring to the people of the Scripture (Jews and Christians) all the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, sings, revelations etc.), they would not follow your Qiblah (prayer direction), nor are you going to follow their Qiblah (prayer direction). And they will not follow each other's Qiblah (prayer direction). Verily, if you follow their desires after that which you have received of knowledge (from Allah), then indeed you will be one of the Zalimun (polytheists, wrong-doers etc.)

উপরের এই আয়াতের শেষের লাইন ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন একটি নতুন এবং মজার বিষয় লুকানো আছে। আমরা প্রায়শই দেখি, কোনো স্বামীর যদি স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ হয় যে তার স্ত্রী অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে, কিংবা স্বামীর অনুপস্থিতে সে বাপের বাড়ি চলে যাবে, তখন স্বামী তার স্ত্রীকে তিরস্কার করে বলতে পারে : "তুমি যদি তোমার বাপের বাড়ি যাও আমি তোমাকে তালাক দেবো।" আল্লাহর কী সন্দেহ হয়েছিল মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর অবাধ্য হয়ে যাচ্ছেন যে তাকে বলতে হলো, "তুমি যদি তাদের পথ অনুসরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই তুমিও হবে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত?" আসলে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ মুহাম্মদকে এমন কথা বলেননি, বরং নব্য মুসলিমদের মধ্যে ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতি তীব্র ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে নবীজিই এমন শক্তকথা লিখিয়েছেন। সুরা বাকারার ১৯১নং আয়াতে মুহাম্মদ আরো বলেন,

> "তাদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদের দেখা পাও, আর তাদেরকে তাড়িয়ে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে তাড়িয়েছিল, আর উৎপীড়ন হত্যার চেয়ে নিকৃষ্ট। আর মাসজিদুল হারাম মক্কার আশেপাশে তাদেরকে হত্যা করো না যদি না তারা তোমাদেরকে সেখানে হত্যা করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদেরকে সেখানে আক্রমণ করে, তোমরা তাদেরকে খুন করো। এটাই অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য।"

এই আয়াতে আল্লাহ অথবা মুহাম্মদ (দঃ) যাদেরকে খুন করার কথা বলছেন এবং খুন করেছেন, এদের অবিশ্বাসী দাবি করা হলেও তারা তো আসলেই নাস্তিক-নিরীশ্বরবাদী বা অবিশ্বাসী ছিল না; তাদের বেশিরভাগই ছিল ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অন্য বহু-ঈশ্বরবাদী, সর্বপ্রাণবাদী ধর্মাবলম্বী। মক্কায় থাকতে মুহাম্মদ (দঃ) একদিকে বলেন : 'লাকুম দ্বী-নুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন' অর্থাৎ, তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আর আমার ধর্ম আমার, 'লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন' অর্থাৎ, ধর্মে জবরদস্তি নেই, অন্যদিকে আবার মদিনাতে এসে বলেন : "যুদ্ধ তোমাদের জন্যে ফরজ (বাধ্যতামূলক) করা হলো যদিও তোমরা তা পছন্দ করো না। হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করো তা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক, আর তোমরা যা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ২১৬)। এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, মানুষ (আরবের তৎকালীন জনসাধারণ, এমন কী সদ্য যারা মুহাম্মদ (দঃ) প্রচারিত ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলো) যুদ্ধ করতে অপারগ ছিলো, অথচ কোরান উৎসাহ দিচ্ছে যুদ্ধের। পশ্চিমাবিশ্ব আজকে দুনিয়াজুড়ে ইসলামি-মৌলবাদীদের সন্ত্রাসী তাণ্ডবের যে উৎস চিহ্নিত করেছে তার কি সামান্য হলেও যৌক্তিকতা রয়েছে, নাকি নাকি পুরো বিষয়টি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা, ইহুদি-নাসারাদের চক্রান্ত বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে?

ইসলামে সত্যই কি জোর জবরদস্তি নেই?

ইসলামকে পরমতসহিষ্ণু একটি মানবিক ধর্ম প্রমাণ করার জন্য সাধারণতঃ বিশ্বাসীরা নীচের কতকগুলো আয়াত পবিত্র কোরান শরীফ থেকে হাজির করেন।

১) ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই (২:২৫৬)।
২) তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার (১০৯:৬)
৩) পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে ইত্যাদি।

কিন্তু ইতিহাস বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানি এই গুটিকয় পরমতসহিষ্ণু আয়াতগুলো সবই নাজিল হয়েছিলো মক্কায়, যখন মুহম্মদ শক্তি সামর্থ্যে অনেক দুর্বল ছিলেন, এবং নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুগ্রহের উপর অনেকটাই নিভ্রশীল ছিলেন। তখন 'ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই' কিংবা ' তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার' বলা ছাড়া আসলে তার জন্য কোন উপায়ও ছিলো না। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর

যখন তাঁর বাহুবল আর সৈন্যবল অনেক বেড়ে গেল তখন কিন্তু পরমতসহিষ্ণু আয়াতের স্থলে আল্লাহ'র তরফ থেকে একে একে নাজিল হতে লাগল হিংসা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা উদ্রেককারী আয়াত। মানবতা গেল হাওয়ায় মিলিয়ে। পাঠকদের সুবিধার জন্য মক্কা এবং মদিনায় নাজিলকৃত আয়াতগুলোর কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। মদীনায় নাজিল হওয়া কোরানের নির্দেশ থেকে আমরা পাই :

যেখানেই মুশরিক/ অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা কর (২:১৯১, ৯:৫)।
তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, কঠোর ব্যবহার কর (৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যাও (৮:৬৫)।

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে থাকে, হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি (৫:৩৩) ।

কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর (৪৭: ৪)।

বিধর্মীদের উপর জিজিয়া কর আরোপ কর (৯:২৯)।

মুশরিকেরা 'অপবিত্র' (৯:২৮), এদের স্থান স্থান দোজখে (৫:১০) ।

তোমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় (২:১৯৩)।

তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না (৫:৫১)।

ইহুদীরা বানর এবং শুকরের সমতুল্য (২:৬৫, ৫: ৬০, ৭:১৬৬)।

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হলেও (২:২১৬)।

তাদের (অবিশ্বাসীদের) মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্'র পথে হিজরত করে চলে আসে। অত:পর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর (৪:৮৯)।

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্'র রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্'র কাছে (৯:২০)।

আমি তাদেরকে (অবিশ্বসীদের) আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে (৪:৫৬)।

যারা আল্লাহ্'র রাস্তায় নিহত হয়,তাদের মৃত বলো না (২: ১৫৪)।

ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (৩:৮৫)। ইত্যাদি।

মুহম্মদ নিজেই মদীনায় নাজিল হওয়া উপরোক্ত আয়াতগুলোর সার্থকতা দিতে গিয়ে ৬২৪ খ্রীস্টাব্দে বনি কুয়ানুকা, ৬২৫ খ্রীস্টাব্দে বনি নাদির আর ৬২৭ খ্রীস্টাব্দে বনি কুরাইজার ইহুদী ট্রাইবকে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেন। বনি কুয়ানুকার ইহুদীদের সাতশ জনকে এক সকালের মধ্যে হত্যা করতে সচেষ্ট হন[৪৪], আর বনি কুরাইজার প্রায়

[44] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p545.

আটশ থেকে নয়শ লোককে আক্ষরিক অর্থেই 'কচুকাটা' করেন, এমনকি তারা আত্মসমর্পণ করার পরও[৪৫]। হত্যার ভয়াবহতা এতোই বেশি ছিলো যে, ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর মতো লেখিকা, যিনি মুসলিম সমাজের পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হিসবে গন্য হন, তিনি পর্যন্ত মুহম্মদের কর্মকান্ডকে নাৎসী ভয়াবহতার সাথে তুলনা করেছেন[৪৬]। খাইবার দখলের পর মুহম্মদ (দঃ) সাফিয়া নামের ১৭ বছরের সুন্দরী ইহুদী নারীকে অধিগ্রহণ করেন, এবং তা করেন তার বাবা, মা, ভাই বোন এবং আত্মীয় স্বজনকে হত্যার পরপরই। রায়হানাকে অধিগ্রহণ করেন বনি কুরাইজা দখলের পর। তার এই কাজকর্ম কোন 'শান্তির' বাণী বয়ে আনে না, বরং কোরানের 'পরমত সহিষ্ণুতা'র যে আলামত হাজির করার চেষ্টা করেন মুসলিম স্কলারেরা, তাকে প্রতিনিয়ত যেন ব্যাঙ্গ করে।

বহু ইসলামী স্কলার মনে করেন যে, মদীনায় নাজিল হওয়া পরবর্তী আয়াতগুলো আসলে আগেকার শান্তিময় আয়াতকে বাতিল করে দেয়। মদীনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সহী বুখারি এবং কোরানের অনুবাদক ডঃ মুহম্মদ খান পরিস্কার করেই বলেন[৪৭] -

> 'আগে বিধর্মীদের সাথে লড়াই নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো, কিন্তু পরে সেটা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়।'

জালালুদ্দিন সুতি (Jalaluddin Suyuti) আরো পরিস্কার করে বলেন -

> 'মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর- ৯:৫ এই আয়াতের মাধ্যমে আগেকার সকল পরমতসহিষ্ণু নির্দেশকে বাতিল করা হয়েছে।'

অন্যান্য ইসলামিক স্কলারেরাও (Ibn Hazm al-Andalusi, Ga'far ar-Razi, Rabi' Ibn 'Ons, 'Abil-'Aliyah, Abd ar-Rahman Ibn Zayd Ibn 'Aslam) একই মত প্রকাশ করে বলেন-

> "Slay the idolaters wherever you find them (9:5) cancelled those few earlier verses that called for tolerance in Quran and were revealed when Islam was weak".

আমরা দেখি বর্ণবাদী-বৈষম্যবাদী বক্তব্যের প্রচণ্ড উপস্থিতি রয়েছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ এবং হাদিস শরিফের নানা জায়গায়। যেমন কোরান বলছে : "আর মুশরিক নারীকে বিয়ে করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঈমান এনেছে, অবশ্যই একজন ক্রীতদাসী ঈমানদার নারী একজন স্বাধীন নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। আর (তোমাদের মহিলাগণকে) বিয়ে দিও না মুশরিকদের সাথে, যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে, নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার গোলাম, স্বাধীন মুশরিকের চেয়ে ভাল যদিও সে তোমাদেরকে তাজ্জব করে দেয়। এইসব আমন্ত্রণ করে দোজখের প্রতি আর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় আহ্বান করেন পরিত্রাণ ও বেহেস্তের

---

[45] Tabari writes, 'The messenger of God went out into the marketplace of Medina and had trenches dug in it; then he sent for them and had them beheaded in those trenches. They were brought out to him in groups. Among them were the enemy of God, Huyayy b. Akhtab, and Ka'b b. Asad, the head of the tribe. They numbered 600 or 700—the largest estimate says they were between 800 and 900. As they were being taken in groups to the Messenger of God, they said to Ka'b b. Asad, "Ka'b, what do you understand. Do you not see that the summoner does not discharge [anyone] and that those of you who are taken away do not come back? By God, it is death!" the affair continued until the Messenger of God had finished with them.' (Tabari, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir, "The Victory of Islam", vol viii, pp.35-36)

[46] K. Armstrong Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991, London, p. 207.

[47] ***Dr. M. Khan, the translator of Sahih Bukhari*** *and the Quran into English wrote: "Allah revealed in Sura Bara'at (Repentance, IX) the order to discard (all) obligations (covenants, etc), and commanded the Muslims to fight against all the Pagans as well as against the people of the Scriptures (Jews and Christians) if they do not embrace Islam, till they pay the Jizia (a tax levied on the Jews and Christians) with willing submission and feel themselves subdued (as it is revealed in (9*:29*). So the Muslims were not permitted to abandon "the fighting" against them (Pagans, Jews and Christians) and to reconcile with them and to suspend hostilities against them for an unlimited period while they are STRONG and have the ability to fight against them. So at first "the fighting" was forbidden, then it was permitted, and after that it was made obligatory "[Introduction to English translation of Sahih Bukhari, p.xxiv.]*

দিকে এবং তিনি তাঁর নির্দেশনাবলী মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট করে দেন, যেন তারা বুঝতে পারে।" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ২২১)। ইংরেজিতে বলা হয়েছে :

> "And do not marry Al-Mushrikat (idolatresses etc.) till they believe (worship Allah Alone). And indeed a slave woman who believes is better than a (free) Mushrikah (idolatress etc.), even though she pleases you. And given not (your daughters) in marriage to Al-Mushrikun till they believe (in Allah Alone) and verily, a believing slave is better than a (free) Mushrik (idolater etc.), even though he pleases you. Those (Al-Mushrikun) invite you to the Fire, but Allah invites (you) to Paradise and Forgiveness by His Leave, and makes His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations etc) clear to mankind that they may remember."

হাদিস শরিফে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করছেন, "আল্লাহর রসুল (দঃ) বলেছেন, ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের পাকা সাদা চুলে রঙ দেয় না, সুতরাং তোমরা তার উল্টোটা করবে অর্থাৎ তোমাদের পাকা সাদা চুলে ও দাড়িতে রঙ দেবে।" (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৬, নম্বর ৬৬৮)। শাদ্দাদ ইবনে আউস হতে বর্ণিত, নবী মুহাম্মদ বলেছেন : "Act the reverse of the Jews in your prayer, for they do not pray in boots and shoes." অর্থাৎ ইহুদিরা যা করে তার উল্টো করো প্রার্থনাতে, কারণ তারা বুট বা জুতা পায়ে প্রার্থনা করে না। (দ্রষ্টব্য : *A Dictionary of Islam*, Page 470)। সমতুল্য সাম্প্রদায়িক সবক আর কি হতে পারে? ঘৃণা, অপমান, হিংসা, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি নিয়ে কি মানুষের মন জয় করা যায় কিংবা মানবকল্যাণের কোনো কাজে আসে? বলতে পারি সম্পূর্ণ কোরানই রাজনৈতিক স্বার্থে রচিত। তাহলে বিশ্বাসীর মধ্য থেকে প্রশ্ন ওঠবে বেহেস্ত, দোজখ, মহাপুরস্কার, ভয়ঙ্কর শাস্তি, তকদির, ফেরেস্তা, শয়তান এগুলো কি মিথ্যা? হ্যাঁ, এগুলো হলো সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়ানোর লক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাজনৈতিক স্বার্থের ওপর মিথ্যার আবরণ। অভিযোগ রয়েছে এ বইখানিতে (কোরান) পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করে কোনো মুসলমান, অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে, জগতের কোনো অমুসলিমকে ভালোবাসতে পারে না। জানি, এ বক্তব্যের সাথে মুসলিম-অমুসলিম অনেকেই দ্বিমত পোষণ করবেন; বলবেন, মুসলমানদের মধ্যে কি সহনশীল, মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তি নেই? তবে এর উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই আছেন এবং আমার-আপনার চারপাশে অনেক-অনেক আছেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তাদের অমসুলিমদের প্রতি সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, প্রেম-ভালোবাসা, মৈত্রী ইত্যাদি তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে কিংবা ছোটবেলা থেকে অমুসলিমদের সাথে পাশাপাশি থাকার কারণে, সামাজিকীকরণের সময় নিজেদের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বোধ-বুদ্ধি-ধারণা-নীতি-নৈতিকতা সৃষ্টির ফলে আর ধর্মগ্রন্থের তথাকথিত ঐশ্বরিক নির্দেশ থেকে কিছুটা উদাসীন থাকার কারণে তৈরি হয়েছে এবং অবশ্যই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে উৎসাহিত হয়ে নয়। জেনে, বুঝে যারা বলেন 'ইসলাম' মানবতার ধর্ম, বিশ্ব-শান্তির ধর্ম, কোরান সাম্য-মৈত্রীর বাণী বহন করে, তাঁরা অবশ্যই ভান করেন, মিথ্যা বলেন, প্রতারণা করেন, অথবা সম্পূর্ণ না-জেনে নিজের মনগড়া ভালো-ভালো কথাগুলোকে ইসলামের কথা বলে চালিয়ে দেন। শুধু ইসলাম কেন, পৃথিবীর কোনো ধর্মই (হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান ইত্যাদি) মানবতার আসেনি, বিশ্বশান্তির জন্য তৈরি হয়নি; নিজেদের আখের গোছানো আর স্ব ধর্মীয়মতাদর্শের নিরঙ্কুশ বিজয়টাই একমাত্র লক্ষ্য (ধর্মীয় বাণীগুলিই তার প্রমাণ)। ধর্ম প্রসারের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি-মানবতা প্রতিষ্ঠা একটি বোগাস ধারণা। এই অজুহাত শুধু মুসলমানরাই দেয় এমন নয়, প্রায় কম-বেশি সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এরকম ছদ্ম-সহৃদয়তা লক্ষ্য করা যায়।

কোরান না হয় অন্য ধর্মাবলম্বীদের ও ধর্মগ্রন্থের নিন্দা-সমালোচনা করলো, তাদের সত্যতা অস্বীকার করলো। কিন্তু স্ব-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এতো মতভেদ, মারামারি, খুনোখুনি কেন? এই যে শিয়া, সুন্নি, আহমদিয়া, ওয়াহাবি, হানিফি, হাম্বলি, মালিকি, খারেজি, রাফেজি ইত্যাদি স্বগোত্রে, স্বজাতিতে, স্বধর্মে এই মতভেদ, দ্বন্দ্ব, মারামারি, সংঘর্ষ, হানাহানি, খুনোখুনির কারণ কি ধর্মগ্রন্থ বোঝার ভুল, ধর্মগ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা, নাকি এর কারণ একদম গোড়াতেই, স্বয়ং ধর্মগ্রন্থের রচয়িতাগণ, ধর্ম প্রবর্তক? মুসলমানদের দাবি মতো পৃথিবীর 'শেষ ধর্ম' ইসলাম তার পূর্ববর্তী সবগুলো ধর্মকে স্পষ্ট ভাষায় বাতিল ঘোষণা করেছে। কোরান স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছে আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম (৩:১৯); এবং মুসলমানরা মৃত্যুর পরে (পাপ মোচনের পর) চিরদিনের জন্য বেহেস্তে যাবে আর অমুসলিমরা চিরদিনের জন্য দোজখে যাবে (২:৩৯)।[৪৮] সুতরাং যে ধর্মগুলো আল্লাহকর্তৃক বাতিল,

[৪৮] আল্লাহ কোরানে বেশ কয়েকবারই দাবি করেছেন : "তিনি যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।" (সুরা ৩৯, জুমার, আয়াত ২৩)। "আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম।" (সুরা ৩২, সিজদা, আয়াত ১৩)। "কাউকে পছন্দ করলেই তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না; তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন।" (সুরা ২৮, কাসাস, আয়াত ৫৬)। তাহেল বুঝা যাচ্ছে, মানুষের চিন্তা আর কর্মের স্বাধীনতা সরাসরি অস্বীকার করা হচ্ছে এ সকল আয়াতে। প্রশ্ন দেখা দেয়, (এক) এই দুনিয়াতে যেসব মানুষ অপরাধী, তারা সকলেই নিজের দোষে নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছেতেই এ অপরাধ করেছে; অবশ্য যদি 'আল্লাহ' বলে কোনো সৃষ্টিকর্তা থেকে থাকেন। (দুই) আল্লাহ চাইলেই যদি সব মানুষ সৎপথে চলে আসতো, তবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল-পথপ্রদর্শক-বার্তাবাহক আরবভূমিতে পাঠানোর কি দরকার ছিল? হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার কি কোনো দরকার আছে? ইরানি স্কলার Ali Dasti তাঁর বিখ্যাত

পরিত্যক্ত, ভ্রান্তিপূর্ণ, বর্জনীয়, অগ্রহণযোগ্য, অচল হয়ে গেছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করার কোনো যুক্তি নেই। নতুনের প্রতিই মানুষ আগ্রহী হয়, নতুনকেই গ্রহণ করে কিংবা বর্জন করে; নতুনকে নিয়েই হয় গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলোচনা-সমালোচনা। কিন্তু লক্ষণীয়, কেউ ইসলাম বা কোরান নিয়ে সামান্য যৌক্তিক আলোচনা-সমালোচনা করলেই তাঁকে কথায়-কথায় ইসলাম-ব্যাসার, ইসলাম-বিদ্বেষী, কাফের, মুরতাদ, ফ্যানাটিক, ইহুদি-নাসারাদের দালাল ঘোষণা করা হয়। আসলে এই ধর্মান্ধরা হয় ইসলাম সম্পর্কে সত্যকে গ্রহণ করতে, জানতে-জানাতে ভয় পান, নয়তো সত্যকে ঘৃণা করেন। আজকাল আমাদের দেশের আধা-সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লোক উদারতার সাথে দাবি করেন, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান স্বকালের সামাজিক পরিবেশ, ইতিহাস ও বাস্তবতার নিরিখে সমাজ পরিবর্তন বা সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে লিখিত। যদিও তাঁরা মনে করেন কোরানসহ কোনো ধর্মগ্রন্থই ঈশ্বর (আল্লাহ, ভগবান, গড ইত্যাদি) কর্তৃক প্রণীত নয়। আবার কিছু লোক, আল্লাহ ও আল্লাহর মনোনীত রসুল ও তাঁর লিখিত ধর্মগ্রন্থকে সুকৌশলে নিষ্কলঙ্ক, নির্ভুল প্রমাণ করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এবং সকল কলঙ্ক ধর্মানুসারীদের ওপর চাপিয়ে দেন। তাঁরা এ কাজটি করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীবাহক প্রফেট মুহাম্মদ, কোরানকে জগতের তাবৎ মুসলমান থেকে পৃথক করে নিয়েছেন নতুন প্রণীত দুটি ঘৃণিত নাম 'মৌলবাদ' ও 'রাজনৈতিক ইসলাম' ব্যবহার করে; অর্থাৎ পৃথিবীতে ইসলামের নামে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, খুনোখুনি, অমঙ্গল, অকল্যাণ হয়েছে এবং হচ্ছে, তার সবগুলো হয় কোরানের অপব্যাখ্যাকারী ঐ মৌলবাদী ও রাজনৈতিক ইসলামের দ্বারা! আল্লাহ, প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁদের কোরান সর্বদাই নমস্য, নিষ্কলঙ্ক, নির্ভুল, নির্ভেজাল! তাঁদের ভাষায় হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলি, মোয়াবিয়া, ইমাম আবু হানিফাসহ আজকের পৃথিবীর আলেম, ওলামা, মশায়েখ, হাফিজ, মোহাদ্দিস সবাই মৌলবাদী ও রাজনৈতিক ইসলামের সমর্থক। এ হলো আল্লাহ, প্রফেট মুহাম্মদ, কোরানকে সত্য ও নির্ভুল প্রমাণ করার অনেক পুরানো ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ইসলামের 'মৌলবাদ' ও 'রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি' ব্যতীত কোরান রচনার ও প্রয়োগের উদ্দেশ্য নিষ্ফল অর্থহীন; তার জ্বলন্ত প্রমাণ স্বয়ং মুহাম্মদ, কোরানের আয়াত এবং হাদিস। আমরা আস্তে-আস্তে এ বিষয়ে মূল আলোচনায় যাব; উদ্ঘাটন-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো 'ইসলাম' নামক আরবের 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের আসল চেহারা। আদ্যোপান্ত স্ববিরোধী-প্রাগৈতিহাসিক-অবৈজ্ঞানিক-উত্তেজক বক্তব্যে ভরপুর কোরান-হাদিস স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বিভ্রান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আসছে যুগ-যুগ ধরে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) নিজেই তাঁর অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আমি জীবিত থাকতেই যদি তোমাদের মধ্যে এই মতভেদ, আমার পরে তোমাদের কি অবস্থা হবে?" অবস্থা কী হয়েছে আজকের মুসলিমবিশ্ব হাড়ে-হাড়ে জানে, আফসোস প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং দেখে যেতেন পারেননি! মজার ব্যাপার আজকাল প্রকৃত ইসলাম, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসায় পাওয়া যায় না। কোরান-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাকারী ও মুহাম্মদ (দঃ)-কে প্রকৃতভাবে চেনার মতো কোনো আলেম, মৌলানা, হাফেজ, ক্বারী, মোহাদ্দিস, মুফাস্সিরিন মনে হচ্ছে এ জগতে অবশিষ্ট নেই। কোরান শরিফ, আল্লাহ ও মুহাম্মদ (দঃ)-কে হেফাজত করার পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন 'মডার্ন' ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা কতিপয় শিক্ষিত তথাকথিত 'মডারেট' মুসলিম। (ওনাদের আবার ইসলাম নিয়ে একেকজনের একেক মত, একেক ব্যাখ্যা। এতো মত আর ব্যাখ্যার নীচে চাপা পড়ে আমাদের মতো আম পাবলিকের অবস্থা কেরোসিন!) কিন্তু তাঁদের মডার্ন ইসলামের অস্তিত্ব শুধুমাত্র কাগজে-কলমে, পত্রিকার পাতা আর ইন্টারনেটের ওয়েব ব্লগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সমাজে এর কোনো অস্তিত্ব বা বাস্তব প্রতিফলন নেই। আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে অর্ধশত ইসলামি দলের নাম শুনে অবাক হওয়ার কি আছে? হয়তো আগামীতে এই তালিকা একশো ছাড়িয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই! পনেরশত বছর আগে প্রফেট মুহাম্মদ তো বলেই গেছেন : "কেয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদী তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে মাত্র একদল হবে বেহেস্তি।" (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ৩, নম্বর ৪৫৮০)[৪৯]। আর এই ঘোষণার পর সকলেই যে নিজেদেরকে জান্নাতি দলের দাবি করবে এবং জাহান্নামি বাকি বাহাত্তর দলের সাথে খুন-খারাবি, ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা ধারণা করতে পারি, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রফেট মুহাম্মদ ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরে 'স্ববিরোধী' বক্তব্যে ভরপুর কোরান ও কোরানের অনুসারীদের সম্পর্কে বলতে পেরেছিলেন : "ইখ্তিলাফু উম্মতি রাহ্মাতুন্" অর্থাৎ মতবিরোধ-মতানৈক্য আমার উম্মতের জন্যে আশীর্বাদ! নবী চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা আলি (রাঃ) ইসলামের প্রথম খলিফা হবেন; কিন্তু তাঁর আশাপূর্ণ হয়নি। হয়েছিলেন তাঁর সর্বকণিষ্ঠ এবং প্রিয় পত্নী আয়েশার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ)। নবী মুহাম্মদ জীবিত থাকতে একবার মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'গাদির আল-খুম' নামক একটি ঝরণার (কেউ কেউ বলেন 'কূপ') কাছে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন : "আমি যার প্রভু, হযরত আলিও তার প্রভু।"[৫০] এই ঘোষণার দিনটি স্মরণে রেখে শিয়া সম্প্রদায় এখনো আনন্দোৎসব

'*Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*' গ্রন্থে বলেন : "These verses, and the inability of the prophets to change mankind radically, make nonsense of the efforts of the theologians to prove the general necessity of prophethood."

[৪৯] Sulaiman Ibn al-Ash'as al-Sijistani, *Abu Dawud Hadith*, translated in English by Prof Ahmad Hasan; the internet version can be read at: http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/abudawud

[৫০] কোনো কোনো মুসলিম পণ্ডিত-বুজুর্গব্যক্তিগণ তাঁদের তফসিরে (Tafsir Neshapuri, Tafsir Durr-al-Manthur, Tafsir Kabir) বলেছেন : "The Prophet had already been ordered to proclaim Ali his successor, but he had postponed the announcement for some suitable occasion to avoid misappreciation." (দ্রষ্টব্য : Saiyid Safdar Hosain, *The Early History of Islam*, Low Price Publications, Delhi,

করে থাকে। (দ্রষ্টব্য : *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৪৬০, ৪৭২)। এমন কি নবী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তাঁর উত্তরসূরি কে হবে তা লিখে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন আল-খাত্তাবের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৭০, নম্বর ৫৭৩; সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৯২, নম্বর ৪৬৮)। ইসলামের ইতিহাসে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে লড়াই, ফ্যাসাদ, দাঙ্গা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের যাত্রা শুরু তো মহানবী মুহাম্মদের মৃত্যুর সাথে-সাথেই খলিফা কে হবেন তা নিয়ে; প্রথম খলিফা নির্বাচন নিয়ে স্বয়ং মুহাম্মদের (দঃ) নিকট আত্মীয়-স্বজনরাই স্বজাতি মুসলমানদের জন্যে প্রথম 'বিষবৃক্ষ' রোপন করেন। নবীজির রচিত কোরান প্রিয় স্ত্রী আয়েশা ও জামাতা আলির জন্যে মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি। হজরত মুয়াবিয়া ও হজরত আলির (রাঃ) মধ্যকার শত্রুতা নিরসন করতে পারেনি; পারেনি হাসান, হোসেনকে মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের হাত থেকে রক্ষা করতে। ওহাবি, শিয়া, সুন্নি, শরিয়ত, মারিফত, তরিকত, হানিফি, মালিকি, হাম্বলি, শাফেয়ি, জামাতি, জমিয়তি, কাদিয়ানী, তাবলীগি সবকিছুই আমাদের দয়াল নবী মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর কোরান-হাদিসের সৃষ্টি। একই বটবৃক্ষের বহু শাখা-প্রশাখামাত্র। বাংলার সেই পুরানো প্রবাদ নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে, "বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়।"

৩

প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার নামই বিজ্ঞান, আর কোনো প্রশ্ন না করে বিশ্বাস করার (মেনে নেওয়া) নামই ধর্ম। আজকাল দেখছি কতিপয় শিক্ষিত মানুষও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছেন। বিজ্ঞান জানা আছে বলেই মানুষ জলে চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করতে পারে। আগুন ছাড়া, পাতিলের জলে চাল ঢেলে একলক্ষ চব্বিশ হাজার বার 'বিসমিল্লাহ' বলে জলে ফুঁ দিয়ে, কিংবা সারা রাত ফরজ-নফল নামাজ পড়লেও চাল কি একটাও ফুটবে? নিশ্চয়ই ফুটবে না[৫১]। তারপরও যখন তথাকথিত 'শিক্ষিত' লোকেরা বলেন, বিজ্ঞান কেন মহাবিজ্ঞান দিয়েও একটা ভাতও ফুটানো যাবে না, যদি আল্লাহর হুকুম না হয়, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কার কাছে পাওয়া যাবে? আমাদের বাংলাদেশের চারণ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বুর প্রশ্ন রেখেছিলেন : "মুসলমানের দুই স্কন্ধে দুইজন ফেরেস্তা পাপ-পূণ্যের ধারাবিবরণী লিখতে, কাগজ-কলম হাতে, মানুষের ঠিক কতো বছর বয়সে তাদের ওপর সওয়ার হন, মানুষ কখন টের পায় এরা এসেছেন?" পৃথিবীতে কতো বড় বড় মহাজ্ঞানী মুসলমান আছেন, কেউ মুখ খোলে আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্নগুলোর একটিরও জবাব দিতে এগিয়ে আসলেন না। আজকাল পৃথিবীর কোথাও একটি বোমা পড়লে ইসলাম ও মুসলমানের নাম চলে আসে কেন? কেন মুসলমানদের মধ্যে এত মতভেদ, এত দল? প্রত্যেক দলই নিজেকে প্রকৃত মুসলমান ও অন্যসব দলকে নকল বা অমুসলিম বলে কেন? এতোগুলো 'কেন'-এর উত্তর শুধুমাত্র তারাই জানতে পারবেন, যারা ভাববাদী, কনসেপ্চুয়েল আইডিওলজি, স্টেরিওটাইপ্ড-এটিচিউড ও সকল প্রকার কল্পনাপ্রসূত বিশ্বাস মুক্ত হয়ে সততার সাথে নিরপেক্ষভাবে কোরান শরিফ এবং ইসলামের ইতিহাস পড়বেন। সকল মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। এ অত্যন্ত কঠিন কাজ। দাড়িওয়ালা-টুপিওয়ালা লম্বা জুব্বা-পরা পুরুষ অথবা আপাদমস্তক বোরকা দিয়ে ঢাকা হিজাব-পরা নারী দেখে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ তার কনসেপ্চুয়েল আইডিয়ওলজির মাধ্যমে কল্পনা করে, এরা অবশ্যই পাক-পবিত্র নিষ্পাপ মানুষ। এদের পকেটে বোমা থাকতে পারে, তা ভাববাদীদের জন্য বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

ইসলাম আজ সারা পৃথিবীর মানুষের আলোচ্য বিষয়। সকলের মুখেই দুটো প্রশ্ন : (১) ইসলাম মানে শান্তি না সন্ত্রাস, (২) কে আসল আর কে নকল মুসলমান? সন্দেহভরা মনে মানুষ দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টায়, না-জানি আজ পৃথিবীর কোথায় কোন নবদম্পতির বিয়ের আসরে, কোন আদালত প্রাঙ্গনে, কোন জজের মাথায় 'ইসলামি বোমা' পড়লো। প্রতিটি বোমা যত বিকট আওয়াজে পড়ে, সাথে সাথে আরো বিকট আওয়াজে প্রতিধ্বনি ওঠে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না, বোমাবাজরা কোরানের

(First Published 1933), 2006, page 235)। কেউ কেউ হযরত আলির প্রফেটের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়নের ব্যাপারে কোরানের ৯৪নং সুরা ইনশারহ্'র ১-৮নং আয়াতের দিকে নির্দেশ করেন। যদিও সুরাটিতে হযরত আলিকে সরাসরি প্রফেট মুহাম্মদের পরবর্তী নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, শুধুমাত্র নবীকে ভারমুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে।

[৫১] ব্রিটিশ উপনিবেশিককালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৬৬) একটি গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা 'প্রার্থনার ফলাফল যে অশ্বডিম্ব' তা দেখিয়ে দিয়েছেন। শোনা যায়, একদা এই মনীষীকে তাঁর ছাত্ররা 'প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, উত্তর দেন কৃষিজীবী পরিশ্রমের মাধ্যমে শষ্য লাভ করে, কিন্তু জগদীশ্বরের কাছে শুধুমাত্র প্রার্থনা দ্বারা কোন কৃষকের কস্মিনকালেও শষ্য লাভ হয় নাই। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর দার্শনিক বক্তব্যের পক্ষ্যে একটি গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করেন, সমীকরণটি হচ্ছে এরকম :

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শষ্য

অতএব, প্রার্থনা = ০

অর্থাৎ প্রার্থনা দ্বারা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। (দ্রষ্টব্য : মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৫)।

অপব্যাখ্যাকারী ইসলামের শত্রু। পবিত্র কোরান স্পষ্ট করে বলে : "এ বিশ্বের একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ। আল্লাহর আইন ব্যতীত কারো আইন পৃথিবীতে থাকতে পারে না। কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা গ্রহণ করা হবে না।" (সুরা ৪৮, ফাত্হ্, আয়াত ৭, ১৪; সুরা ২৫, ফুরকান, আয়াত ২; সুরা ৩, আল-ইমরান, আয়াত ৮৫)। এ হলো মিশন স্টেটমেন্ট অব ইসলাম। পৃথিবীর সকল দেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নে, আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর আইন কায়েম করতে যারা জেহাদ করে, তারা 'ওরাসাতুল আম্বিয়া' বা রসুলগণের প্রতিনিধি। যে মিশন নিয়ে জগতে নবী মুহাম্মদের আগমন, নবীর অবর্তমানে সেই মিশন চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ৫০টি ইসলামি দলসহ পৃথিবীর অন্যান্য জেহাদি সংগঠন। এ সকল ওলামায়ে হাক্কানি কামেল আলেমগণ বাংলাদেশের মসজিদে, হাজার হাজার মুসল্লিদের ইমামতি করে, শতশত মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ তালেবে ইল্‌ম তৈরি করে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন। এরা কেউই সিকি দামের চুনোপুটি অশিক্ষিত কাঠমোল্লা নয়। তাঁদের অনেকেই হাটহাজারি, দেওবন্দ, পাকিস্তান, মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি ও মদিনা ইসলামি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, এমনকি শিক্ষকও। এঁদেরকে যারা সন্ত্রাসী, জঙ্গি, মৌলবাদী বলেন, তাদেরকে নবী মুহাম্মদের (দঃ) ভাষায় বলা হয় 'মুনাফিক'।

আমরা যখন আল-কোরানের সমালোচনা করি তখন কেউ কেউ বলেন, আমরা নাকি ৯/১১-এর আগে অর্থাৎ ২০০১ সালের আগে ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একথা সত্য যে, কতিপয় মুসলমান সন্ত্রাসী কর্তৃক ঘটিত ৯/১১ এবং এর পরবর্তী ধারাবাহিকভাবে নৃশংস ঘটনার পর বিশ্বের বিরাট সংখ্যক অমুসলিম সাধারণ মানুষের চোখ খুলে গেছে, বাধ্য হয়েছে কোরান খুলে দেখতে, সন্ত্রাসের উৎস অনুসন্ধানে নেমেছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত মৌলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মৌদুদির উর্দু ভাষায় লেখা '*তাফহীমুল কোরআন*' অবলম্বনে নিচে শানে-নুজুলসহ কোরানের দুটো সুরার (সুরা *আনফাল* ও সুরা *তওবা*) অনুবাদ দেয়া হলো।[৫২] আমার বিশ্বাস সারা বিশ্বজুড়ে ইসলামি রাজনীতি-বোমাবাজী-হত্যা-সন্ত্রাস পবিত্র জেহাদ না সন্ত্রাস, এবং বর্তমান পৃথিবীর 'ত্রাস' আলকায়েদা, হরকাতুল জেহাদ, জামাতে ইসলামি, জামাতুল মুজাহিদিন, হামাস, লস্করে তয়েবা, জৈশে মুহাম্মদ ইত্যাদি ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসের দালিলিক উৎস কোনগুলি—এসকল প্রশ্নের উত্তর নির্মোহভাবে জানতে চাইলে কোরান শরিফের এ দুটো সুরা পাঠই যথেষ্ট। আগেই বলেছি শুধুমাত্র তারাই কোরান শরিফ পাঠে এর উত্তর পাবেন, যারা ভাববাদী, স্টেরিওটাইপ্‌ড-এটিচিউড ও সকল প্রকার কল্পনা প্রসূত বিশ্বাসমুক্ত হয়ে, সততার সাথে, নির্মোহ-নিরপেক্ষভাবে কোরান পড়বেন।

প্রথম সুরাটির নাম 'সুরা আনফাল' (সুরা নম্বর ৮); অপরটির নাম 'সুরা তওবা' (সুরা নম্বর ৯)। প্রফেট মুহাম্মদ 'সুরা আনফাল' প্রকাশ করেন হিজরী দ্বিতীয় সনে, তাঁর ও কোরায়েশদের মধ্যকার সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর। আর 'সুরা তওবা' বলেছিলেন নবম হিজরীতে, কিছু অংশ 'হুদাইবিয়া' সন্ধির প্রাক্কালে, কিছু অংশ 'তাবুক' যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে আর কিছু অংশ 'তাবুক' যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। উল্লেখিত সুরা দু'টির শানে-নুজুল বা পটভূমি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে দেখা যাক সুরাগুলোতে প্রধানত কি বলা হয়েছে। আমি এখানে প্রথমে '*তাফহীমুল কোরআন*' (পৃষ্ঠা ১১৮-১২৭) থেকে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মৌদুদি কর্তৃক বর্ণীত সুরা আনফালের 'শানে-নুজুল'-এর সারাংশ ঈষৎ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করে এই সুরার আয়াতগুলি, বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য আয়াতগুলি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করছি এবং আয়াতের নিচে এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব মন্তব্য বা প্রশ্ন পেশ করছি :

> 'সুরা আনফাল' হিজরি দ্বিতীয় সালে কাফের ও মুসলমানদের মধ্যকার সর্বপ্রথম যুদ্ধ, 'যুদ্ধে-বদর'-এর পরে অবতীর্ণ হয়। ইসলামের দ্বাদশ বর্ষে মদিনা থেকে হজের মৌসুমে পচাত্তরজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল রাতের অন্ধকারে নবী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেননি বরং নবী করিম (দঃ) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণকে মদিনায় আশ্রয় দিবেন বলে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। আল্লাহর নবী (দঃ) এমন সুবর্ণ সুযোগটি দু-হাত বাড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করে নিলেন। আল্লাহর রসুল (দঃ) তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতঃ একদিন মদিনাতেই আরব দেশের 'প্রথম ইসলামের রাজধানী' প্রতিষ্ঠিত করেন।
>
> মদিনায় আসার পর মুসলমানদেরকে সঙ্গবদ্ধ করা ও মদিনার সম্ভ্রান্ত ইহুদিদের সাথে সমঝোতার প্রাথমিক কাজগুলো সেরেই মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম সিরিয়া ও মক্কার মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমে বাণিজ্যপথ ও লোহিত সাগর মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের সাথে শান্তিচুক্তি বা মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ছোট ছোট গোত্র যারা সমুদ্র উপকূল ও পাহাড়ি এলাকায় বাস করতেন তাদের সাথে তাবলীগের মাধ্যমে (মিশনারি কাজ) জোটবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ নেন। উভয় কাজেই নবী (দঃ) পূর্ণ সফলকাম হন। তারপর এই বাণিজ্যপথ ধরে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের প্রতি হুশিয়ারিস্বরূপ ছোট ছোট দলের অভিযান প্রেরণ করতে থাকেন। একটি অভিযানে নবীজি (দঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রথম হিজরিতে চারটি অভিযানের প্রথম অভিযান হামজা, দ্বিতীয় অভিযান উবায়দা বিন হারিস, তৃতীয়

[৫২] বাংলাভাষীরা পাঠ করতে পারেন : সাইয়্যেদ আবুল আলা মৌদুদি, (অনুবাদ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম), *তাফহীমুল কোরআন*, নবম পারা, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৬৮। আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.tafheemulquran.org

অভিযান সা'দ বিন আবি ওক্কাসের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। চতুর্থ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসুল (দঃ)। দ্বিতীয় হিজরীতে আরও দুটি অভিযান সেখানে পাঠানো হয়।

দ্বিতীয় হিজরির শা'বান মাসে আবু সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে কোরায়েশদের বিরাট এক ব্যবসায়ীদল সিরিয়া থেকে ৫০ হাজার ডলার মূল্যের বাণিজ্য-সামগ্রী নিয়ে মক্কা ফেরার পথে মদিনার অভ্যন্তরে এমন একটি এলাকায় এসে উপস্থিত হয় যেখানে আক্রমণ করা মদিনাবাসীর জন্যে খুবই সহজ। আবু সুফিয়ান তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করলেন মুসলমানগণ তাদেরকে আক্রমণ করবে। তার ভয় হলো, মাত্র ৩০/৪০জন লোকের হেফাজতে বিরাট মূল্যের মালপত্র নিয়ে মদিনা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আবু সুফিয়ান সাহায্যের জন্যে মক্কায় একজন লোক পাঠালেন। লোকটি মক্কায় পৌঁছে চিৎকার করে ঘোষণা করলো : "মক্কাবাসী, তোমাদের বণিকদল মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। মুহাম্মদ তার দলবল নিয়ে বণিকদলের নিকবর্তী হয়ে যাচ্ছে। যদি তোমরা অতিশীঘ্র বেরিয়ে না পড়ো, আমি জানি না তোমরা তোমাদের মালপত্র উদ্ধার করতে পারবে কি-না।" এই সংবাদে কোরায়েশগণ ভীষণ উত্তেজিত হলেন। তাদের বড় বড় নেতাগণ তাৎক্ষণিক যুদ্ধ-প্রস্তুতির ডাক দিলেন। আনুমানিক ১০০০ সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তারা মদিনাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। তাদের উদ্দেশ্য শুধু বণিকদলকে উদ্ধার করাই নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যাতে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয় সে লক্ষ্যে মদিনায় তাদের বিপরীত নতুন শক্তির উত্থান চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া আর মদিনার বাণিজ্যপথ কোরায়েশদের জন্যে চির উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখা।

আল্লাহর রসুল (দঃ) যিনি সব সময়ই দেশের সার্বিক অবস্থার ওপর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ভাবলেন এবার সময় এসে গেছে চূড়ান্ত ফয়সালার। আর এখনই শক্ত-কঠিন সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার সেই উৎকৃষ্ট সময়। অন্যথায় নতুন ইসলামের উদিত আলো পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবে, ইসলাম আর কোনোদিন মাথা তোলে দাঁড়াতে পারবে না। কোরায়েশগণ যদি মদিনা দখল করে নেয় তাহলে হয়তো দুনিয়া থেকে মুসলমান জাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি কোরায়েশগণ মদিনা দখল না করে শুধু তাদের বাণিজ্য-কাফেলাকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, আর মুসলমানগণ বসে-বসে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন, তাও হবে মুসলমানদের জন্যে চরম অপমান। কারণ এভাবে সকল কাফের, মুশরিক, ইহুদিসহ সারা আরববিশ্বে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর মদিনার মুনাফিকেরা প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা শুরু করে দেবে। তখন মুসলমানদের জান-মাল, বাড়ি-ঘর, মান-সম্মানের কোন নিরাপত্তা তো থাকবেই না, মুহাজিরিনদের জন্যে মদিনায় বাস করাও হয়ে যাবে অসম্ভব। সেই সুযোগে কোরায়েশগণ আধিপত্য করবে সারা আরব জগতে। আল্লাহর রসুল (দঃ) এ সকল দিক বিবেচনা করেই অস্ত্রের মাধ্যমে কোরায়েশদের মোকাবিলা করার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। মাত্র তিনশজন অথবা তার চেয়ে সামান্য বেশি লোক যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এলেন। সমরাস্ত্র বলতে তাদের কাছে যা ছিল তা যুদ্ধের জন্যে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। খুবই অল্প লোক ছিলেন যারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। বেশিরভাগ লোক এতই ভীত ছিলেন যে তারা ধরে নিয়েছিলেন, এভাবে যুদ্ধে যাওয়া, জেনে শুনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিজেকে তোলে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আবার কিছু লোক এমনও ছিলেন যে তারা বুঝতেই পারেননি, ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ যে ইসলামের জন্যে পরিবার পরিজন ত্যাগ করা, জান-মাল ও সহায়-সম্পত্তি বিসর্জন দেয়া। এমনকি তারা এও বলেছিলেন যে, ধর্মের জন্যে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত অপরিণামদর্শী, অযৌক্তিক ও অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর রসুল (দঃ) ও সত্যিকার বিশ্বাসীগণ এ সংকটময় মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি। রমজান মাসের ১৭ তারিখ বদর প্রান্তে দুইদল মুখোমুখি হলেন।

বদরের যুদ্ধে মক্কার মুহাজিরিনগণকে এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয় আপন পরিবার ও প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে। তলোয়ার ধরতে হয়েছিল, বাবার বিরুদ্ধে পুত্র, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই, চাচার বিরুদ্ধে ভাতিজা, ভাগিনার বিরুদ্ধে মামাকে। অন্যদিকে মদিনার আনসারদের জন্যেও এ যুদ্ধ ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। এ পর্যন্ত তারা শুধু মক্কার শক্তিশালী কোরায়েশদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুহাজিরিনগণকে মদিনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু এবার মদিনাবাসী কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন। মুসলমানদের অল্প জনবল ও দুর্বল অস্ত্রের মুখে মহাশক্তিশালী কোরায়েশগণ পর্যদুস্ত হয়ে যায়। কোরায়েশদের শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজন নেতাসহ ৭০জন লোক এ যুদ্ধে নিহত ও ৭০জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের প্রচুর সমরাস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম মুসলমানদের হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের এ চূড়ান্ত বিজয়, ইসলামকে এক বিরাট শক্তি হিসেবে বিশ্বের সামনে পরিচয় করিয়ে

দেয়। তাই তো একজন পশ্চিমা গবেষক পণ্ডিত বদরের যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করেন : "বদর যুদ্ধ পূর্ববর্তী ইসলাম ছিল শুধুমাত্র রাষ্ট্রের একটি ধর্ম, বদর-যুদ্ধের পর রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম নয় বরং ইসলাম স্বয়ং রাষ্ট্র হয়ে যায়।"

এ হলো সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মৌদুদি কর্তৃক বর্ণীত সুরা আনফালের শানে নুজুল। এবার দেখা যাক সুরা আনফালের উল্লেখযোগ্য আয়াতগুলি (সাথে আমার নিজস্ব মন্তব্য ও প্রশ্ন) :

১. "তারা তোমাকে যুদ্ধেলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, 'যুদ্ধেলব্ধ সম্পদ' আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তার রসুলকে মান্য করো যদি তোমরা মুমিন হও।"

প্রশ্ন করা তো এই সুরার প্রথম আয়াতেই নিষিদ্ধ করা হয়ে গেল! ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। 'নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও' বিশেষ করে মদিনার সেই সকল নব্য মুসলমানদেরকেই বলা হয়েছে যারা মুহাম্মদকে (দঃ) সত্যি সত্যি আল্লাহর রসুল মনে করে মদিনায় আশ্রয় দিয়েছিল এবং নিজেদের জান-মাল, পরিবার-পরিজনদের মমতা ত্যাগ করে মুহাম্মদের কথায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। পরে যুদ্ধেলব্ধ সম্পদের ভাগ না পেয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেছিল। এই সুরা আনফালে মুহাম্মদ (দঃ) বারবার 'আল্লাহ' শব্দটির সাথে 'রসুল' শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে মানুষ তার (মুহাম্মদের) আদেশ-নির্দেশ যুক্তি-তর্কবিহীনভাবে আল্লাহরই আদেশ মনে করে এবং অন্ধভাবে তা পালন করে। 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ' তো আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের', কথাটি যদি আল্লাহর হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রথম মানব হজরত আদম (দঃ) থেকে হজরত ঈসা (দঃ) পর্যন্ত কত যুগ কত শতাব্দী অতিবাহিত হলো আল্লাহর অথবা আল্লাহর কোন নবীর কোনো দিন পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন হলো না কেন?

৭. "আর স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদের সাথে দুটি দলের একটির ব্যাপারে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা চেয়েছিলে যে দলের হাতে অস্ত্র ছিল না তা তোমাদের হউক। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন সত্যকে স্বীয় কালামের দ্বারা সত্যে পরিণত করতে আর কাফেরদের শিকড় কেটে দিতে।"

আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন যুদ্ধের আগে, বলা হচ্ছে কেন যুদ্ধের পরে? শুভঙ্করের ফাঁকি তাই না! এই আয়াত বা বাক্য পড়ে পৃথিবীর কোনো ভাষাবিদ কি বুঝতে সক্ষম হবে যে উল্লেখিত দল দুটি কে বা কারা ছিল কিংবা যাদের হাতে অস্ত্র ছিল না তারা কারা ছিল, তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা কি দখল করতে চেয়েছিল? শেষ পর্যন্ত অস্ত্রহীন দলের কি হলো? যে সকল মানুষ মুহাম্মদের (দঃ) সামনে উপস্থিত ছিল অথবা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে স্বচক্ষে, তারা ব্যতীত পৃথিবীর কোনো মুসলমান কোরান পড়ে কি বুঝতে পারবে এর পেছনের ঘটনাটা কি? যে কথাগুলো মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর গোটাকয়েক অনুসারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যা অন্য কোনো মানুষের বোধগম্য নয়, সেই কথাগুলো সারা জগতের মানুষের জন্যে আল্লাহর চিরন্তন বাণী বলে মানুষ মেনে নেবে কেন? মুহাম্মদ (দঃ) ভালভাবেই জানতেন কোথায়-কিভাবে আক্রমণ করলে কি হবে। আর মদিনায় এসে আল্লাহ কাফের বা অবিশ্বাসীদেরকে স্বমূলে উৎখাত বা শিকড় কর্তন করবেন কেন? তারা তো স্বেচ্ছায় অবিশ্বাসী হয়নি। অবিশ্বাসী হয়ে তো তারা আল্লারই ইচ্ছা পূরণ করেছে; কারণ মক্কায় থাকতে আল্লাহ বলেছিলেন : "তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষ একসঙ্গে বিশ্বাস করতো। তুমি কি তবে মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়? আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই। আর যারা বোঝে না আল্লাহ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করবেন।" (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ৯৯-১০০)। আল্লাহর ইচ্ছা নেই কেন, পৃথিবীর মানুষ একসঙ্গে তাঁকে বিশ্বাস করুক? 'তুমি কি তবে মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে' এ তো দেখি কুমিরের কান্না! জবরদস্তির চূড়ান্ত অবস্থাই তো যুদ্ধ।

১২. "স্মরণ করো তোমার প্রভুকে, ফেরেস্তাদেরকে প্রেরণা দিলেন—আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আছি, কাজেই যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করো, আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, সুতরাং আঘাত হানো তাদের গর্দানে এবং তাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হাতের আঙুল) কেটে ফেলো।"

কী সর্বনাশা কথা! আল্লাহ মানুষকে মানুষ খুন করতে হুকুম দিলেন! ফেরেস্তারাও খুনের দায়িত্বে নিয়োজিত হলো। যুদ্ধে ফেরেস্তার সশস্ত্র বাহিনী মুহাম্মদ (দঃ) ব্যতীত কেউ দেখেছিল বলে তো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনি মক্কায় রচিত সুরা 'ফিল'-এর বর্ণনানুযায়ী বাদশাহ্ আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যের ওপর আকাশ থেকে আবাবিল পাখির পাথর বর্ষণ কেউ দেখেছিল বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলে না। অবশ্য আবরাহার মক্কা আক্রমণের

তারিখ নিয়ে আরবের ইতিহাসে বহু মত-পার্থক্য আছে। ঐতিহাসিকদের মতে আবরাহা মক্কা আক্রমণ করেছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের কমপক্ষে এক যুগ পূর্বে। মুসলিম ইতিহাসবিদগণ মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের সময়টাকে মহিমান্বিত করার লক্ষ্যে ইতিহাস বিকৃতি করেছেন। বদর যুদ্ধের পূর্বে কোনো কালে কোনো নবী-পয়গম্বর সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে কোরানের কোথাও লেখা নেই। সেই আবাবিল পাখিরা কোথায় গেল? আল্লাহ নমরুদকে শাস্তি দিলেন মশার দ্বারা, বাদশাহ্ ফেরাউনকে মারলেন সাগরের জলে ডুবিয়ে, আরও কত শত জনপদ কত সম্প্রদায় ধ্বংস করলেন নিজ হাতে। হাজার হাজার বছর ধ্বংস লীলায় ব্যস্ত আল্লাহর হাত কি এতই ক্লান্ত যে মানুষ খুনের দায়িত্ব এবার মানুষের হাতেই তোলে দিলেন!!

১৩. "যেহেতু তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের অবাধ্য হয়েছে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করেছে তাই তাদের জন্যে এই শাস্তি। আর যে কেউ আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করে—আল্লাহ তবে শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।"

'শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর' মক্কায় থাকতে এ কথাটি মুহাম্মদ বহুবার বলেছেন এবং অনেক উপমা উদাহরণও দিয়েছেন। কিন্তু বিগত ১২ বৎসর যাবত বাস্তবে শাস্তি ভোগ করেছেন শুধু মুসলমানরাই স্বদেশে এবং বিদেশে। আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করে মানুষ কামনাও করেছে, ওপর থেকে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর শাস্তি আসুক। কিন্তু আল্লাহ অপারগতা দেখালেন। কেন? প্লাবন, মশা, আবাবিল, ঝড়, বৃষ্টি, মহামারি সবকিছু পড়ে রইলো মক্কায় রচিত কল্পকাহিনী হয়ে। মদিনায় এসে শাস্তিদানের হাতিয়ার হিসেবে আল্লাহ 'রসুলের' হাতে তোলে দিলেন তীর-বর্শা আর শাণিত তলোয়ার!

১৭. "সুতরাং তোমরা তাদেরকে খুন করোনি বরং আল্লাহই খুন করেছেন, আর তুমি ছোঁড়ে মারোনি বরং ছোঁড়ে মেরেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ যেন তিনি ঈমানদারগণকে দিতে পারেন উত্তম পুরস্কার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।"

হায়! হায়! সর্বনাশ। এ কি বিশ্বপতি আল্লাহর কথা? মহান আল্লাহ তারই সৃষ্টির সাথে যুদ্ধ করতে সুদূর আকাশের ঠিকানা থেকে নেমে আসলেন বদর প্রান্থে? একদিকে (কোরানের মতে, ক্ষিপ্তবেগে বেরিয়ে আসা না-পাক 'নুতফা' থেকে সৃষ্টি) ছয়শ জন মাটির মানুষ, অপরদিকে আল্লাহরই নূরের তৈরি নবী মুহাম্মদ (দঃ) যার উছিলায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সেই সাথে নূরের তৈরি এক হাজার আর্মি ফেরেস্তা নিয়ে তলোয়ার বর্শা হাতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা? পায়ের নিচে পড়া পিপীলিকার সাথে বন্য হাতির লড়াই না হয় মেনে নেয়া যায় কিন্তু এ যে সকল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ। বিশ্ব-প্রভুর কি শোচনীয় অপমান! আল্লাহর যদি কাফের মারার ইচ্ছে হতো তিনি নিশ্চয়ই বলতে পাতেন 'মর', ব্যস ওরা সব মরে সাফ হয়ে যেত। তাই না?!

২০. "ওহে, যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের আদেশ পালন করো এবং আদেশ শুনার পর তার থেকে ফিরে যেও না।"

যুদ্ধে মানুষের অনীহা? ওরা ভাবতেই পারেনি মুসলমান হয়ে যুদ্ধ করতে হবে গোত্রের বিরুদ্ধে গোত্রকে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে, বাবার বিরুদ্ধে সন্তানকে।

২৪. "ওহে, যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসুলের আদেশ পালন করো যখন তোমাদেরকে সে কাজের প্রতি ডাকা হয় যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। আর জেনে রেখো আল্লাহ্ মানুষ ও তার মনের অন্তরায় হয়ে যান, নিঃসন্দেহে তার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।"

২৬. "স্মরণ করো তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, দুর্বল অবস্থায় পড়ে রয়েছিলে দেশে, ভীত সন্ত্রস্ত ছিলে যেন লোকেরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিলেন, স্বীয় সাহায্যে তোমাদিগকে শক্তি দিলেন এবং উত্তম জীবিকা দিলেন যেন তোমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারো।"

কথাগুলো নির্দিষ্টভাবে সেই সকল কোরায়েশদেরকে বলা হচ্ছে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুহাম্মদের (দঃ) সাথে ও পরে মদিনায় এসেছিল এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মক্কার শরণার্থীগণ মদিনায় এসে দুই বৎসরের মাথায় উত্তম জীবিকার সন্ধান পেলেন কিভাবে? কি এমন ধন নিয়ে তারা মদিনায় এলেন? জীবিকার উৎস কি ব্যবসা-বাণিজ্য না কি কৃষিকাজ? বাস্তব ইতিহাসে তো এমন কোনো উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে কি যুদ্ধলব্ধ সম্পদই আল্লাহর দেয়া উত্তম রিজেক? ১২ বছর যাবত আবিসনিয়া রাজ্যে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের দুর্গতি আল্লাহ দেখলেন না? সে দেশে আল্লাহর উত্তম জীবিকা নেই? আর প্রিয় মানুষদেরকে আল্লাহ কেনই বা বিদেশে আশ্রয়ের ঠিকানা দিবেন? বদরের মাঠে একহাজার আর্মি ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করতে পারলেন, মক্কায়

পারলেন না? মদিনাতে খাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারলেন, আর আবিসিনিয়াতে পারলেন না? বুঝতে কি কারো কিছু বাকি থাকে? (স্বীয় সাহায্যে কোনো কিছু করলেই আল্লাহর নাম, আর না করতে পারলে আল্লাহর অভিশাপ। বাপরে বাপ!) মাত্র বাহান্ন বছর পূর্বে আবরাহার ষাটহাজার সৈন্যকে সামান্য পাখি দিয়ে পরাজিত করে তিনশত ষাট দেবতার ঘর মক্কা বাঁচাতে পারলেন আর তার প্রিয় নবী ও বান্দাদেরকে আল্লাহ স্বদেশে রাখতে পারলেন না?

৩০. "আর স্মরণ করো অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, তারা তোমাকে আটক করবে, অথবা হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে। তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহর পরিকল্পনাই শ্রেষ্ঠ।"

বাহ্! মানুষের সাথে আল্লাহ প্রতিযোগিতা করেন, কে কার চেয়ে ভাল পরিকল্পনা করতে পারে। পলায়নের পরিকল্পনার মধ্যে আবার বাহাদুরির কি আছে?

৩১. "যখন তাদের কাছে আমার বাণী পড়ে শুনানো হয়, তারা বলে—আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি, আমরাও এর মতো বলতে পারি। এ তো পুরনো উপকথা বৈ কিছু নয়।"

দুর্মুখদের কেমন স্পর্ধা! আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে চ্যালেঞ্জ করে। এদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া উচিৎ। আল্লাহ তো শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

৩২. "আর স্মরণ করো তারা বলেছিল—হে আল্লাহ এই যদি তোমার সত্য ধর্ম হয়, যদি কোরান সত্য হয় তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দাও।"

এতো সব মর্মন্তুদ শাস্তির কাহিনী শুনেও তারা আল্লাহর গজব কামনা করে? এদের সাহস তো কম নয়!

৩৩. "আল্লাহ কখনো তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে আছেন, আর তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

কি আজব ব্যাপার! মক্কায় শাস্তি দেয়া যায় না, মদিনায় দেয়া যায়। সরাসরি স্ববিরোধী কথা! বদরের যুদ্ধে কাফেরদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিলেন, না আশীর্বাদ করলেন? যুদ্ধ চলাকালে মুহাম্মদ তাদের মাঝে ছিলেন, না কি পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন?

৩৪. "আর তাদের এমন কীই-বা বলার আছে যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, যখন তারা মসজিদ-উল-হারাম (কাবা ঘরে) যেতে বাধা দেয়? অথচ তাদের সে অধিকার নেই, তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়। এর তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে শুধু পরহেজগারগণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"

উপরোক্ত ৩৩ আর ৩৪ নম্বর আয়াত দুটো কি পরস্পর বিরোধী নয়? ৩৬০ দেবতার ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হবে মুসলমান, তাও মুহাম্মদের জন্মের ৫২ বছর পর?

৩৫. "কাবা ঘরের নিকটে তাদের নামাজ বলতে শুধু শিস বাজানো আর হাততালি দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এবার অবিশ্বাসী হওয়ার স্বাদ গ্রহণ করো।"

হাততালি দেয়া আর শিস বাজানোর ধর্মই তো মুহাম্মদের মা আমিনা, বাবা আব্দুল্লাহ, চাচা আবু তালিবের ধর্ম ছিল। সেই ধর্মানুসারেই তো বিয়ে করলেন মুহাম্মদ এবং নিজের মেয়ে রোকেয়া ও কলসুমের বিয়েও দিয়েছিলেন আপন চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে। তাদের ধর্মে তারা হাততালি দিলে, শিস বাজালে মুসলমানদের কি আসে যায়? মক্কায় থাকাকালে সুরা 'কাফেরুন'-এ আল্লাহ বললেন : "তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আমার ধর্ম আমার জন্যে।" তাহলে মদিনায় এসে অন্য ধর্মের সমালোচনা কেন? আল্লাহ নিজেই যদি অন্য ধর্মকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন তাহলে মুসলমানদের কি করা উচিৎ?

৪১. "আর যদি তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহতে ও আমার বাণীতে যা আমি অবতীর্ণ করেছি রসুলের ওপর ফুরকানের (বদরের যুদ্ধের) দিনে, যেদিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল, তাহলে জেনে রাখো, যুদ্ধে যা কিছু সম্পদ তোমরা লাভ করো তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর তথা রসুলের ও রসুলের নিকটাত্মীয়ের আর এতিম গরিব ও পথচারীদের জন্যে। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান।"

এতোক্ষণে পাওয়া গেলো মালের ভাগের হিসাব! মালের ভাগের হিসাবে রসুলের নিকটাত্মীয়েরা খুশি হলেও মদিনার মানুষ এ নিয়ে প্রশ্ন তোলতেই পারে। মাল পেয়েও কি তাদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ বাড়বে? আপন

গোত্রের সাথে গলা কাটাকাটি। এই যুদ্ধে কোরায়েশবংশের হজরত আবু সুফিয়ানের দুই পুত্র অর্থাৎ হজরত মোয়াবিয়ার দুই ভাই খুন হয়েছিলেন। কিছুটা অনুশোচনা কোরায়েশদেরও হতেই পারে।

৬৫. "হে প্রিয় নবী, মুসলমানগণকে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি (Diehard) থাকে তবে তারা দু'শ জনকে পরাজিত করবে, আর যদি এক'শ জন থাকে তবে এক হাজার জনকে পরাজিত করবে, কারণ কাফেরেরা জ্ঞানহীন।"

আনুপাতিক হিসাবটা দেখি ঠিকই আছে!

৬৬. "এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, তিনি জানেন তোমাদের মাঝে দুর্বলতা আছে। কাজেই যদি তোমাদের মধ্যে এক'শ জন (Diehard) থাকে তবে তারা দু'শ জনকে পরাজিত করবে, আর যদি এক হাজার জন থাকে তবে তারা আল্লাহর হুকুমে দুই হাজার জনকে পরাজিত করবে। আর আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথী।"

উপরের ৬৫নং আয়াত অনুযায়ী ২০জন মুসলমান = ২০০জন কাফের, আর ১০০জন মুসলমান = ১০০০জন কাফের, অর্থাৎ ১জন মুসলমান = ১০জন কাফের। আর পরের আয়াত অনুযায়ী ১০০জন মুসলমান = ২০০জন কাফের, আর ১০০০জন মুসলমান = ২০০০জন কাফের, অর্থাৎ ১জন মুসলমান = ২জন কাফের। বিষয়টা কী বুঝলাম না? শুভঙ্করের ফাঁকি, না অঙ্কে গণ্ডগোল? আচ্ছা, অতিরিক্ত শক্তি ও মালতো পাওয়া গেলো এবার যুদ্ধে বন্দীদের কি করা যায়?

৬৭. "নবীর জন্যে বন্দীদেরকে রাখা সঙ্গত নয় যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে, তোমরা চাও ইহকাল আর আল্লাহ চান পরকাল। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।" আয়াতটির ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে "It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allah desires (for you) the Hereafter. And Allah is All-Mighty, All-Wise."

এই মুহূর্তে কোনো বিনিময় মূল্যে বন্দীদেরকে ছেড়ে দিলে মুসলমানগণই বিশ্বাস করতেন না যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পদ নয় বরং আল্লাহর নির্দেশ।

৬৮. "বিষয়টা যদি আগে থেকেই আল্লাহর কাছ থেকে অনুমোদিত না থাকতো তাহলে তোমরা (যুদ্ধে) যে সম্পদ অর্জন করেছিলে তার জন্যে তোমাদের ওপর শাস্তি এসে যেতো।"

৬৯. "সুতরাং ভোগ করো যুদ্ধে যা অর্জন করেছো পরিচ্ছন্ন হালাল বস্তু হিসেবে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান।"

খাও দাও, ফুর্তি করো কোন্ গাছের ফল জিজ্ঞেস করো না। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করতে মানুষ কি দ্বিধাগ্রস্থ ছিল?

৭০. "হে নবী, তোমার হাতে যারা বন্দী রয়েছে তাদেরকে বলে দাও যে আল্লাহ যদি জানতে পারেন তোমাদের মনে ভাল কিছু চিন্তা আছে তাহলে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"

ধর্মের বাণিজ্যকরণ? কৌশলে বশ্যতা মেনে নেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি? জগতের কোনো মানুষ কি বলতে পারেন একজন যুদ্ধ বন্দীর কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কি ফেরত দেবার আছে? যুদ্ধে সন্তান হারানো মাকে সন্তান দেয়া যাবে, কিংবা সন্তানকে বাবা ? মানবতা নিয়ে মুহাম্মদের কি হীন তামাশা!

৭১. "আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, এর আগে তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করেছে সুতরাং (তোমাকে) তাদের ওপরে প্রাধান্য দিলেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত ও সুকৌশলী।"

কথাটি যে মুহাম্মদের তাতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত ও সু-কৌশলী আল্লাহ সন্দেহসূচক শব্দ 'যদি' ব্যবহার করতে পারেন না। কাফেররা কি করবে, না করবে আল্লাহ যদি আগে থেকে না জানতেন, তাহলে বদরের যুদ্ধসহ যে সকল যুদ্ধ এখনো ঘটেনি তার বিবরণ হাজার বছর আগে কোরানে লিখে লাওহে মাহফুজে স্বযত্নে রাখলেন কিভাবে? কোরানে আল্লাহ বহুবার বলেছেন যে তিনি কাফেরদের মনে কি আছে তা ভালোভাবেই জানেন। এই সুরারই ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : "আর প্রস্তুত রাখবে (মুসলমানগণকে) সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে যা কিছু তোমাদের আছে, তেজী যুদ্ধের ঘোড়া দিয়ে, আর তার দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে

> আল্লাহর শত্রুদের তথা তোমাদের শত্রুদের এবং অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। আর যা কিছু তোমরা আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) ব্যয় করবে তা তোমরা পরিপূর্ণ ফিরে পাবে আর তোমাদের ওপর অবিচার করা হবে না।" এখানেও একটি হাস্যকর ইংরেজি অনুবাদ তোলে দিতে হলো :"And make ready against them all you can of power, including steeds of war (tanks, planes, missiles, artillery etc.) to threaten the enemy of Allah and your enemy, and others besides whom, you may not know but whom Allah does know. And whatever you shall spend in the Cause of Allah shall be repaid unto you, and you shall not be treated unjustly."
>
> Tanks, Planes, Missiles, Artillery এগুলো কোরানে না হাদিসে পাওয়া যায়? 'ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না।' এরা কারা? সারা পৃথিবী দুই ভাগ হয়ে গেলো, একদিকে পৃথিবীর সকল মানুষ অন্যদিকে মুসলমান। সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল আরববাসী আর আজ আল্লাহর সৈন্যদের পদভারে সারা বিশ্বই ভীত-সন্ত্রস্ত। কি বলেন?

এবার দেখা যাক পরবর্তী সুরা, সুরার নাম '*তওবা*'। আশ্চর্যজনকভাবে কোরানে '*তওবা*'ই একমাত্র সুরা যার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়া হয় না। কেন হয় না, তা নিয়ে তফসিরকারকদের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন এটি স্বতন্ত্র সুরা আবার কেউবা বলেন এটি সুরা *আনফালেরই* অংশ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো মুহাম্মদ (দঃ) এই সুরা লিখিয়েছিলেন নবম হিজরিতে অর্থাৎ সুরা *আনফাল* রচনার সাত বৎসর পরে। এই সাত বছরে ধূলিধূসর বালুকাময় মরুভূমিতে আরও অনেক যুদ্ধ হলো, বদরের পরে ওহুদের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে, হুনাইনের যুদ্ধে, মুতা'র যুদ্ধে শতশত মানুষের গলা কাটাকাটি হলো, অনেক অনেক কথা মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নামে কোরানে লেখালেন, এতো সব বাদ দিয়ে সুরা 'আনফাল'-এর পরপরই সুরা 'তওবা' চলে আসলো কি করে? কোরানের প্রথম সুরা 'ফাতিহা' নয়, সুরা 'বাকারা'ও নয়। হাতের কাছে কোরানখানি এমনভাবে উপস্থাপন কারা-কিভাবে-কেন করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বোধকরি হজরত উসমানের (রাঃ) কোরান সংকলন কমিটির প্রধান মদিনার খাজরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী জায়েদ বিন থাবিত (প্রফেট মুহাম্মদের সেক্রেটারি), এবং বাকি সদস্যবৃন্দ যথা (কোরায়েশ বংশের) আব্দুল্লাহ ইবনে আল-জুবায়ের, সাদ বিন আল-আস, আব্দুর রহমান বিন আল-হারিথ বিন হিশাম ছাড়া আর কেউ জানে না। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৬, নম্বর ৭০৯)। প্রফেট মুহাম্মদ স্বয়ং কোরান শরিফ সংকলন করেননি বা করতে পারেননি, তাঁর সে সময়ও ছিল না।* তবে হাদিসে আছে তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, (মাসরুক হতে বর্ণিত) চারজন ব্যক্তি হতে যেন কোরানের আয়াত সংগ্রহ করা হয়, তারা হলেন প্রফেটের সেক্রেটারি ওবেই বিন ক্বাব, প্রফেটের ব্যক্তিগত ভৃত্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ, সালিম, মুয়াদ বিন জবল। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬১, নম্বর ৫২১)।

এবার আমরা মৌলানা আবুল আ'লা মৌদুদির '*তাফহীমুল কোরআন*' (উর্দু ভার্সন) থেকে 'সুরা *তওবা*'র শানে-নুজুলের সারাংশ তুলে দিচ্ছি :

> সুরাটি তিনটি পর্যায়ে নাজিল হয়। ১ থেকে ৩৭ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজিল হয় নবম হিজরির জিলকদ মাসে অথবা এর নিকটবর্তী সময়ে, যখন মুহাম্মদ (দঃ) ইসলামের নতুন আইন সম্পর্কে মুশরিকগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে একদল হজযাত্রীকে মক্কায় প্রেরণ করেন। ৩৮ থেকে ৭২ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজিল হয় একই বৎসরের রজব মাসে অথবা এর সামান্য পূর্বে, যখন মুহাম্মদ তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ আয়াতগুলোতে মুসলমানদের জন্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আবশ্যিক প্রয়োজন বলে বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং মুশরকিদের (যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে অথচ ধর্মের জন্যে যুদ্ধ করতে রাজি নয়) তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ তারা ইসলামের জন্যে তাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের মায়াত্যাগ করতে রাজি ছিল না। ৭৩ থেকে ১২৯ পর্যন্ত আয়াতগুলো নবীজি (দঃ) 'তাবুক' যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর নাজিল হয়। এখানে মুনাফিকদের জন্যে রয়েছে ইসলাম বিরোধী ভূমিকার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও হুশিয়ারি বাণী এবং স্বার্থপর ভীরু-কাপুরুষ মুসলমান যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদের জন্যে নিন্দা।

* জায়েদ বিন থাবিত হতে বর্ণিত, "(৬৩৪ সালের দিকে) আবু বকরের শাসনামলে (আরেকজন স্বঘোষিত 'প্রফেট' মুসাইলামা'র বিরুদ্ধে) ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক কোরানের হাফেজ ও সাহাবি মারা গেলে (প্রায় ৩৯ জন) উদ্বিগ্ন ওমর বিন আল খাত্তাব খলিফা আবু বকরকে বললেন, যুদ্ধের ময়দানে যেভাবে হাফেজ-কাতিবরা মারা যাচ্ছেন, তাতে একসময় কোরান শরিফের মেটিরিয়েল দুনিয়া থেকে হারিয়ে যাবে। আপনি এখনই ঘোষণা দিন কোরান সংগ্রহ করতে। আবু বকর বললেন, 'আমরা কিভাবে তা করতে পারি, যা আল্লাহর নবীই নিজে করে যাননি।' ওমর বললেন, আল্লাহই ভালো জানেন এ ব্যাপারে।" ওমরের পরামর্শটা জায়েদ বিন থাবিতের বেশ পছন্দ হল। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬১, নম্বর ৫০৯)।

এই সুরায় বিশেষভাবে 'হুদায়বিয়া সন্ধি' এর পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে দুটি প্রধান ঘটনার একটি ছিল কোরায়েশদের সাথে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ, অপরটি রোমানদের সাথে তাবুকের যুদ্ধ। নবীজির (দঃ) হিজরতের পর থেকে 'হুদায়বিয়া সন্ধি'র সময় পর্যন্ত ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মুসলমানগণ আরবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জয় করে সেখানে এক নতুন সভ্য, শান্তিপূর্ণ, শক্তিশালী সংগঠিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি নবীজির (দঃ) জন্যে ইসলাম বিস্তারে বর্ধিত সুযোগ এনে দেয়। বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে তাবলীগি দল প্রেরণ করে ইসলাম প্রচারের কাজ চলতে থাকে। সন্ধির দুই বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের শক্তি ও সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেলো যে মক্কার কোরায়েশগণ ভাবতে লাগলেন, এই সন্ধির মাধ্যমে মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তারা দুই বৎসরের মাথায় এসে সন্ধি ভঙ্গ করে, সকল শক্তি দিয়ে শেষবারের মতো ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে চাইলেন। কিন্তু আল্লাহর রসুল (দঃ) তাদেরকে সে সুযোগ দিলেন না। কোরায়েশগণ যথেষ্ট শক্তি ও সৈন্য জোগাড় করার আগেই নবীজি (দঃ) অষ্টম হিজরির রমজান মাসে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে অতর্কিতভাবে মক্কা আক্রমণ করেন। কোরায়েশগণ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যদিও কাফেরদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, তারপরও মক্কা ও তায়েফের পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি গোত্রের বিদ্রোহীগণ সমেবতভাবে, অপ্রতিরোদ্ধ শক্তিশালী ইসলামকে ধ্বংস করার শেষ চেষ্টা করে। তাদের সাথে হুনাইন নামক স্থানে, অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসের ছয় তারিখ (২৭ জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে) মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও কাফেরগণ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। হুনাইন যুদ্ধে কাফেরদের পরাজয়, সমস্ত আরব বিশ্বকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার পথ সুগম করে দেয়।

'হুদায়বিয়ার সন্ধি' চলাকালীন সময়ে আল্লাহর রসুল (দঃ) ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আরব দেশের বিভিন্ন এলাকায় দলে দলে লোক পাঠাতে থাকেন। এমনি একটি দল সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে, রোমান বাদশাহর অধীনস্থ খ্রিস্টানবসতি এলাকায় প্রেরণ করা হয়। সেখানকার লোক মুসলমানদের ১৫জন সদস্যকে হত্যা করে ফেলে। আরেকটি দল ইরাকের বসরায় পৌঁছুলে সেখানকার খ্রিস্টান গভর্নর শুরহাবিল বিন আমর, মুসলিম দলের নেতা হরিস বিন্ ওমরকে (যিনি রসুলের) রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন) হত্যা করে। আল্লাহর রসুল (দঃ) ভাবলেন, এখনই রোম সাম্রাজ্য-সংলগ্ন এলাকায় মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে নবীজি (দঃ) হিজরি ৮ সালের জমাদি-উল্ উলা মাসে ৩ হাজার সৈন্য সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করেন। সুরহাবিল এক লক্ষ সৈন্য তার ভাইয়ের নেতৃত্বে মুতা'র দিকে পাঠিয়েছিলেন। রোমান সৈন্যদল মুতা'য় পৌঁছার আগেই সংবাদ আসলো শুরহাবিল বিন্ আমর মুসলমানদের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন। রোম-সম্রাট উপলব্ধি করতে পারলেন রোমসহ সারা আরব বিশ্বই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। তিনি 'মুতা' যুদ্ধের চরম অসম্মানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পরবর্তী বৎসরেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আল্লাহর রসুল (দঃ) যিনি প্রতিমুহূর্তের ঘটনাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, রোমান সম্রাটের পরিকল্পনা যথাসময়ে নবীজি টের পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। রসুল (দঃ) প্রবল শক্তিশালী রোমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁর সৈন্যগণকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। অন্যান্য সময়ে আক্রমণের কৌশল হিসেবে সাধারণত আল্লাহর রসুল (দঃ) কার ওপর, কোথায়, কখন, আক্রমণ করা হবে তা প্রকাশ করতেন না, এমন কি মদিনা ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও তা গোপন রাখতেন। নবীজি (দঃ) জানেন এ যুদ্ধের ফলাফলই নির্ধারণ করবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামি বিপ্লব এ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে তার ধারবাহিকতা বজায় রেখে গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে পারবে কি না। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি রোমানদের সাথে যুদ্ধের গুরুত্ব বিবেচনা করেই এবার রসুল (দঃ) সরাসরি খোলাখুলিভাবে তাঁর ৩০ হাজার সৈন্যকে সিরিয়াভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন। সিরিয়ার পথে তাবুক নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানগণ দেখলেন যে, রোমান সম্রাট তার মিত্রবাহিনীসহ সকল সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং এখানে যুদ্ধ করার মতো প্রতিপক্ষ কেউ নেই। উল্লেখ্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনায় এমন ধারণা দিয়ে থাকেন যে, রোম সম্রাট কখনো আরব সীমান্তে কোনো সৈন্য মোতায়েন করেননি, তা সত্য নয়। আসল ঘটনা ছিল, রোমান সৈন্য ও তাদের মিত্রবাহিনী আক্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়ার আগেই মুসলমাগণকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত দেখে তারা পিছুটান হতে বাধ্য হয়েছিল। তারা জানেন 'মুতা' যুদ্ধে মাত্র ৩ হাজার মুসলমানদের হাতে শুরহাবিলের ১ লক্ষ সৈন্যের কি শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল, আর এখানে ৩০ হাজার সৈন্য, তাও স্বয়ং রসুল (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না, নবীজি (দঃ) সিরিয়ার দিকে আর অগ্রসর না হয়ে তাবুকেই ২০ দিনের জন্য থেমে গেলেন। তাবুকে অবস্থানকালে নবীজি (দঃ) ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নেয়ার জন্যে আরব ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গোত্রের অধিবাসীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ফলস্বরূপ যে সকল ছোট ছোট প্রাদেশিক এলাকা রোম সম্রাটের অধীনস্ত ছিল তাদের অনেকেই

ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে মদিনায় কর পাঠাতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায়। তাবুক অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব বিশ্বের সকল কাফের, বিশেষ করে মদিনার মুনাফিক যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আবার ইসলাম ত্যাগ করেছিল এবং নিজস্ব আলাদা মসজিদ তৈরি করে, ইসলামের অনিষ্ট সাধনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের পুনর্গঠিত হওয়ার সকল আশা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এভাবে ইসলাম রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জগতে আল্লাহর রসুল (দঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন অর্থাৎ বিশ্বে মুসলমানদের জন্যে সুনির্দিষ্ট ইসলামি রাষ্ট্র (দারুল ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা, তাতে পুরোপুরি সফলকাম হন।

এখন যেহেতু সমস্ত আরবের প্রশাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে এসে গেছে, আর ইসলামের শত্রুদের বিদ্রোহ করার সমূহ শক্তি ধ্বংস করা হয়ে গেছে, সেহেতু সময় এসেছে, রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ ইসলামি রূপ দিতে নতুন আইন ঘোষণা করার। যে সকল নতুন আইন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন নিয়ে সুরা তাওবাহ'তে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে : ১-৩ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে কাফের মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার সন্ধি বা চুক্তি হতে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (দঃ) মুক্তি হয়ে গেলেন। ৪ মাস বিরতির পর কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সকল সন্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কাফেরদের পুরনো জীবন-পদ্ধতির শেকড় চিরদিনের জন্যে উপড়ে ফেলতে, এ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল, যাতে আরবকে ইসলামের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলতে কাফেরগণ ভবিষ্যতে কোন দিন বাঁধার সৃষ্টি করতে না পারে। ১২-১৮ আয়াতের মাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, কাবা ঘরের ওপর কাফেরদের কোনো অভিভাবকত্ব থাকতে পারে না, কাবা ঘর শুধু মুসলমানদের হাতে থাকবে। মুশরিকদেরকে পবিত্র ঘরের নিকটে আসতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তাদের পুরানো সকল বিশ্বাস প্রথা-পদ্ধতি ও কুসংস্কারের চির-বিলুপ্তি ঘটে। আরবের বাহিরেও ইসলামের প্রভাব বিস্তারে মুসলমানগণকে অস্ত্রের মাধ্যমে অমুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করে স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি স্বরূপ অমুসলিমদেরকে কর প্রদানে বাধ্য করতে ২৯নং আয়াতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এবার মুনাফিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। যেহেতু মুনাফিকদের সমর্থনে বাহির থেকে কোনো সাহায্য আসার আর ভয় নেই, সেহেতু এখন থেকে তাদেরকে প্রকাশ্যে কাফের বলে গণ্য করার জন্যে মুসলমানগণকে ৭৩-৭৪ নম্বর আয়াতে প্রেরণা দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নবী পাক (দঃ) সোয়ালিমের ঘর, যে ঘরে বসে মুনাফিকগণ শলা-পরামর্শ করতো, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এবার তাবুক থেকে ফিরে এসে তাদের তৈরি সেই মসজিদটিও ভেঙে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেন। দুর্বলচিত্তের মুসলমানদেরকে, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল, তাদেরকে অন্তরের সকল সংসয়-সন্দেহ দূর করে, সারা পৃথিবীর অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যে নিজেদেরকে মানসিকভাবে গড়ে তোলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ৮১ থেকে ৯৬ আয়াতগুলোতে। আর পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, কেউ যদি পুনরায় তাদের মতো ভবিষ্যতে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে, তাদের জীবন, অর্থ-সম্পদ, সময় ও শক্তি দিয়ে জেহাদ করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে না।"

জনাব মৌলানা মৌদুদি কর্তৃক বর্ণীত উপরোক্ত সুরা দুটো সুরা *আনফাল* ও *তওবা*'র পটভূমি বা শানে-নুজুলের ওপর কোনো মন্তব্য না করে[⇓] দেখা যাক কোরানে সুরা *তওবা*তে কি বলা হয়েছে, তবে এখানে বলে রাখি পূর্বের মতোই সবগুলো আয়াত এখানে উপস্থাপন করা হবে না, বরং প্রবন্ধের পরিসর যথাসম্ভব সীমিত রাখার স্বার্থে এবং পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আয়াত ধারাবাহিকভাবে এখানে উপস্থাপন করা হলো :

১. "আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের তরফ থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করা হলো সেই সকল মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে।"

হঠাৎ করে আউজুবিল্লাহ নেই, বিসমিল্লাহ নেই গরম গরম রেড ওয়ার্নিং! কিসের চুক্তি? সারা আরববিশ্বে সন্ত্রাসের প্রলয় ঘটিয়ে, নিরপরাধ মানুষকে ঘর-ছাড়া করে, অবাধে নারী-পুরুষ জবাই করে, অগণিত শিশু হত্যা করে, ঘর-বাড়ি, গাছ-বৃক্ষ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে, ন্যূনতম মানবিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে,

[⇓] নিরপেক্ষ পাঠক অবশ্যই বুঝতে পারছেন জনাব মৌলানা মৌদুদির বক্তব্য কি পরিমাণ একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট। ইসলাম ধর্ম ও নবীজির গুণগানে তিনি যেমন অন্ধভাবেই মুখরিত, উচ্ছ্বসিত, দুর্বলতা প্রকাশ্য, সেইরূপ তিনি আরবের ভিন্ন ধর্মের (বিশেষ করে পৌত্তলিক ধর্ম) প্রতি খড়গহস্ত, অসহিষ্ণু।

এখন বুঝি মনে পড়লো হোদাইবিয়ায় সন্ধির কথা? হোদাইবিয়ায় সন্ধি ছিল মক্কা আক্রমণের পূর্ব-পরিকল্পিত নীল-নক্সা। এই আয়াতটি মক্কা আক্রমণ করার আগে উচ্চারণ করলে মানাতো ভাল!

২. "সুতরাং চার মাস স্বাধীনভাবে চলাফেরা করো। আর মনে রেখো, তোমরা আল্লাহর হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।"

আয়াতটি কি এরকম হওয়া উচিৎ ছিল না : "আর মনে রেখো, তোমরা আমার হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আমি নিশ্চয়ই কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকি।" কারণ কোরান তো আল্লাহর কথা!

৩. "আর এই মহান হজের দিনে মানুষদের প্রতি আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত আর তাঁর রসুলও। অবশ্য তোমরা যদি তওবা করো তা হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। অন্যথায় জেনে রেখো আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের মুক্তি নেই। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও।"

'আল্লাহ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত'—এই কথার মানেটা কি? আল্লাহকে কি মানুষের মতো জবাবদিহি করতে হয়? কার কাছে করতে হয়? কোনো দায়-বদ্ধতায় কি আল্লাহ কখনো দস্তখত করেছিলেন? হ্যাঁ, হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে (দশ বছরের শান্তি চুক্তি) দস্তখত করেছিলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। হজরত আলির লেখা সেই সন্ধিপত্রে আল্লাহর নামটিও লেখা ছিল কিন্তু মুহাম্মদ বিনা দ্বিধায় নিজের হাতে নামটি মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। আবু তালিব, আবু জেহেল তো কোনোদিন মাথানত করেননি, তারা তাদের আল্লাহর জন্যে জীবন দিয়ে গেছেন। আল্লাহর নামের হীন অপমান সহ্য করতে পারেননি হজরত আবু বকর, আলি, ওমর ও উপস্থিত মুসলমানগণ। সেদিন ক্ষুব্ধ ওমর, হজরত আবু বকরকে প্রশ্ন করেছিলেন—উনি সত্যিই কি আল্লাহর নবী?[৫৩]

৪. "তবে যে সকল মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, যারা তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।"

এই ধর্মপরায়ণগণ অনেক আগেই সকল চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কায়, তায়েফে, হুনায়ইনে, মুতায়, শতশত নারী-শিশুকে বন্দী করে খুন করেছিলেন এবং অমুসলিম মহিলাদেরকে তিন রাতের জন্যে কাম-উন্মাদ মুসলমানদের তৃষ্ণা নিবারণে বেশ্যা বানিয়েছিলেন। চুক্তির মেয়াদ কত দিন? চার মাস না দশ বৎসর?

৫. "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে, মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদেরকে পাও, তাদেরকে বন্দী করো আর ঘেরাও করো চতুর্দিক থেকে। আর ওঁত পেতে বসে থেকো প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ পড়ে এবং যাকাত (কর) আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

কে বলে ইসলামে জবরদস্তি নেই? কোন্ মূর্খ দাবি করে ইসলাম 'অস্ত্রের' মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে কেউ কি মুসলমান থাকতে পারে? উপরের আয়াত অনুযায়ী মুসলমান না হয়ে অমুসলিম কেউ মুসলিম দেশে বাস করার কি কোনো পথ খোলা আছে?

৬. "আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে এবং তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্যে যে এদের কোনো জ্ঞান নেই।"

কল্পনা করা যায় দুষ্ট রাজনীতি একজন পিতৃহীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন মানুষকে কেমন আত্মম্ভরী করে তোলে? মানবিক জ্ঞান কতটুকু নীচে নামলে একজন মানুষ বলতে পারে—'আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দেবে এ জন্যে যে তাদের কোনো জ্ঞান নেই'। 'তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে'। আর যদি সে মুহাম্মদের আল্লাহ ছাড়া তার নিজের আল্লাহর কালাম শুনে, তাহলে? তাহলে তার জন্যে তো ওঁৎ পাতানোই আছে, তাই না?

[৫৩] Dr Ali Muhammad As-Sallaabee, Faisal Shafeeq (translator), *The Noble Life of The Prophet*, vol 3, Dar-us-salam Publishers, 2005, Page 1535.

৭. "মুশরিকদের (অমুসলিম) সাথে কিরূপে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের চুক্তি বলবৎ থাকবে, তবে তাদের ছাড়া যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে মসজিদ-উল-হারামের নিকটে? সুতরাং যতক্ষণ তারা তোমাদের প্রতি সরল থাকে তোমরাও ততক্ষণ তাদের প্রতি সরল থেকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।"

আল্লাহ যদি জানেন ওদের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকবে না, তাহলে চুক্তিতে সই করলেন কেন? মানুষ চুক্তি ভঙ্গ করলো, তাই আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলও মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চুক্তি ভঙ্গ করলেন। মক্কা আক্রমণ করলেন, তারপর আরও কয়েকটি যুদ্ধে বেশকিছু এলাকা দখল করলেন, প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করলেন। মানুষ সরল হলে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলও সরল, মানুষ যুদ্ধ করলে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলও মানুষের সাথে যুদ্ধ করেন। মানুষ ঠাট্টা করলে, মশকরা করলে, আল্লাহও ঠাট্টা মশকরা করেন, মানুষ মতলব-পরিকল্পনা করলে আল্লাহও মতলব-পরিকল্পনা করেন। এ আল্লাহ তো জীবন্ত এক মানুষ ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না!

৮. "কেমন করে? (তাদের সাথে চুক্তি সম্ভব) তারা তো তোমাদের ওপর জয়ী হলে তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই ফাছিক (দুষ্কৃতিকারী)।"

এই কথাগুলো চুক্তিতে সই করার পূর্বে না বলে তাবুক থেকে ফিরে এসে বলা হচ্ছে কেন? এই যে কথায় কথায় তারা মুশরিক, ফাছিক, কাফের, মুনাফিক বলা হচ্ছে এগুলো মুসলমানদের মনে অমুসলিমদের প্রতি চিরদিন ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্যে নয় কি? কোরান কি গালি শিক্ষার বই?

৯. "তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অল্পমূল্যে বিক্রয় করে অতঃপর লোকদেরকে নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করছে তা অতি নিকৃষ্ট।"

তাহলে, আল্লাহর আয়াত দ্বারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফেরানোর মতো কথাও কোরানে আছে? কি সেই আয়াতগুলো ছিল? সেগুলো মক্কায় না মদিনায় রচিত? এগুলো কি এখনো কোরান শরিফে রয়ে গেছে?

১০. "তারা মুমিনদের সাথে আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেয় না। আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।"

১১. "অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে আর জাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই। আর আমরা নির্দেশাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানীদের জন্যে।"

যারা মুখ দিয়ে তওবা করে, শরীর দিয়ে নামাজ কায়েম করে, আর অর্থ দিয়ে জাকাত আদায় করে তারা ধর্মীয় ভাই হয়ে গেলো। এরপর যদি যুদ্ধে না যায় তাহলে সেই ভাই মানুফিক হয়ে যায়, তাই না? জ্ঞানীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনার কি প্রয়োজন আছে? নামাজ কায়েম করার পদ্ধতির বিশদভাবে বর্ণনাটা কোথায়? এই জ্ঞানীরাই তো বিশদভাবে বর্ণনা পড়ে নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি করেছে, আজও করছে এবং আখেরে তারাই ৭২ দলে ভাগ হবেন। শ্রমজীবী মূর্খদের হাতে সেদিনও বর্শা-তলোয়ার ছিল না, আজও বোমা-গ্রেনেড নেই!

১২. "আর যদি তারা চুক্তি (শপথ) ভঙ্গ করে আর তোমাদের ধর্ম দিয়ে বিদ্রুপ করে তাহলে কাফের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো, এদের শপথের কোনো মূল্য নেই যে তারা বিরত থাকবে (দুষ্কর্ম করা থেকে)।"

তাদের অন্তর সম্বন্ধে এতো জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ 'যদি' শব্দ ব্যবহার করলেন? ডাল মে কুছ কালা হ্যায়! পরধর্ম নিয়ে এতো বিদ্রুপ-তাচ্ছিল্য মুহাম্মদের কোরান ছাড়া আর কোনো ধর্মগ্রন্থে আছে?

১৩. "তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসুলকে বহিস্কারের সংকল্প করেছিল? তারাই আগে তোমাদেরকে আক্রমণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ তোমাদের অধিকতর ভয়ের যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।"

মাটির মানুষের কাছে আকাশের প্রতাপশালী আল্লাহর (না মুহাম্মদের?) কেমন করুণ মিনতি। বদর থেকে যুদ্ধ করে আর্মি ফেরেস্তারা কি মরে মরে সাফ হয়ে গেলেন, না কি সকলেই পেনশনে চলে গিয়েছিলেন?

১৪. "তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন আর মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।"

১৫. "আর মুসলমানদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী।"

১৬. "তোমরা কি মনে করো তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন, তোমরা কে যুদ্ধ করেছো এবং কে আল্লাহ ও তার রসুল ও মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছো? তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিবহাল ।"

কে যুদ্ধে গিয়েছিল আর কে যায় নাই তা জানার জন্যে কিছুটা সময় লাগবে বৈকি । গুপ্তচর মারফত নবীজি জেনে গেলে সাথে-সাথে আল্লাহও জেনে যাবেন । এই তো আল্লাহর বক্তব্য, তাই না? আর এরা ভালোভাবেই জেনে গেছে মুহাম্মদের পদতলে মাথা নোয়ানো ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই ।

১৭. "মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ দেখাশুনা করার তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরির সাক্ষ্য দিচ্ছে । তাদের সকল কাজ (আমল) ব্যর্থ হবে এবং তারা চিরদিন আগুনের ভেতর বসবাস করবে ।"

প্রফেট মুহাম্মদ মক্কা দখলের আগ পর্যন্ত আল্লাহ মুশরিকগণকে কতদিন পর্যন্ত কথিত 'আল্লাহর মসজিদ' ৩৬০ দেবতার ঘর মসজিদ-উল-হারাম (কাবা ঘর) দেখাশুনার দায়িত্বে রেখেছিলেন?

১৮. "নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহর মসজিদ দেখাশুনা করবে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে আর পরকালেও আর নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না । অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়তপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।"

'অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়তপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'—আল্লাহরও তাহলে মানুষের মতো আশা-নিরাশা আছে? কথাটা নিশ্চয়ই আল্লাহর নয় বরং রসুল মুহাম্মদের?

১৯. "তোমরা কি হাজিদেরকে পানি সরবরাহ ও মসজিদ-উল-হারাম রক্ষণাবেক্ষণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর ও পরকালে, আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে? এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালিমদের হেদায়ত করেন না ।"

নবী ভুলে গেছেন কোরানের কথাগুলো হওয়ার কথা সরাসরি আল্লাহর, তিনি মাধ্যমমাত্র! কিন্তু বাক্যগুলো স্পষ্টই প্রমাণ করে বক্তা আল্লাহ নয় বরং স্বয়ং মুহাম্মদ । আল্লাহর কাছে সুফিবাদের কোনো মূল্য নেই; আছে সন্ত্রাসের অপরিসীম পুরস্কার ।

২০. "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং নিজের জীবন ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আর তারাই সফলকাম ।"

জান আর মাল দিলে মর্যাদা ছাড়া আর কি কি পাওয়া যাবে?

২১. "তাদের আল্লাহ তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন—স্বীয় দয়া ও সন্তোষের আর বেহেস্তের, সেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী শান্তি ।"

মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পর আর কি করতে হয়?

২৩. "হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসকে ভালোবাসে । আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ।"

শুধু জন্মদাতা পিতা আর সহোদর ভাই ত্যাগ করলেই হবে?

২৪. "বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো, তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহ ও তার রসুল ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করো, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেকদলকে হেদায়ত করেন না ।"

সাধে কি আর মায়ের মমতা, বাবার আদর, সন্তানের মায়া, বোনের স্নেহ, স্ত্রীর ভালোবাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জেহাদিরা বোমা হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়?

২৫. "আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের যুদ্ধেও যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল এবং তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল । অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গিয়েছিলে ।"

কি আশ্চর্য! সাহাবিগণ বেহেস্তের দরজা থেকে পালিয়ে গেলেন? বড় কমজোর ছিল তাদের ঈমান ।

২৬. "তারপর আল্লাহ নাজিল করেন সান্ত্বনা তার রসুল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন এক সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি । আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের, আর এটি হলো তাদের কর্মফল ।"

একজন মুমিন সমান দশজন কাফের নয়? আগের সুরা আনফালে তো তাই বলা হল? এতো সৈনিক থাকা সত্ত্বেও আকাশ থেকে ফেরেস্তা আর্মি নামাতে হলো? শুধু ফেরেস্তা আর্মি দিয়ে যুদ্ধ হয় না?

২৮. "হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র । সুতরাং এ বছরের পরে যেন তারা পবিত্র মসজিদের নিকটে না আসে । আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশঙ্কা করো তাহলে আল্লাহ চাইলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন ।"

'আল্লাহ চাইলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন'—এটা আল্লাহর কথা হতে পারে না ।

২৯. "তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কেতাবের (তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কেতাব অনুসারী) ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আর নিষেধ করে না যা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল নিষেধ করেছেন এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না করজোড়ে জিজিয়া (কর) প্রদান করেছে ও আনুগত্য মেনে নেয় ।"

তাদের যেহেতু কেতাব আছে সুতরাং তাদের আল্লাহ আছেন, নবী আছেন, আখেরাতও আছে । হঠাৎ করে তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের নতুন ধর্মকে সত্যধর্ম বলে গ্রহণ করবে কেন? করজোড়ে কর প্রদান করে আনুগত্য মেনে নেয়ার সাথে ধর্মের সম্পর্কটা কি?

৩০. "ইহুদিরা বলে উজায়র আল্লাহর পুত্র আর খ্রিষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র । এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা । এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে । আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, তারা কেমন সত্য থেকে বিমুখ হয় ।"

আবারও পর-ধর্মের সমালোচনা-বিদ্রোপ করা? আল্লাহ কি অন্য কোনো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন : 'আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন' নাকি এর আড়ালে মুহাম্মদ লুকানো? মুহাম্মদের পিতা-মাতা কোন্ ধর্মের ছিলেন? মুহাম্মদের সাথে বিয়ের সময় বিবি খাদিজা কি খ্রিস্টান ছিলেন না? খাদিজার সাথে কি বিয়ে ইসলাম ধর্মের রীতি মেনে হয়েছিল? তখন কেন খাদিজাকে ইসলাম ধর্মের রীতি ব্যতীত বিয়ে করেছিলেন তিনি? কোন্ ধর্মানুসারে মুহাম্মদ তাঁর দুই মেয়ে রোকেয়া ও কলসুমকে আবু লাহাবের দুই পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন? তাদের তালাকও কোন্ ধর্মানুসারে হয়েছিল? কোথায় ছিলেন তখন তাঁর আল্লাহ? সম্ভবত শীতনিদ্রায় ।

৩৩. "তিনিই সেইজন যিনি আপন রসুলকে পাঠিয়েছেন হেদায়ত ও সত্যধর্ম দিয়ে, যেন এই ধর্মকে সকল ধর্মের ওপরে প্রধান্য দিতে পারেন । যদিও মুশরিকগণ তা অপ্রীতিকর মনে করে ।"

অন্য ধর্মের ওপর নিজের ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার করা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়?

৩৮. "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে তোমাদেরকে বের হবার জন্যে বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধরো । তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আখেরাতের তুলনায় খুবই অল্প ।"

কোথাকার বাক্য কোথায় এনে বসানো হয়েছে; বাক্যটি এই সুরার প্রথমে থাকার কথা । আর কতো যুদ্ধ? মানুষ একটু অব্যহতি চায় ।

৩৯. "যদি তোমরা বের না হও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভীষণ শাস্তি দেবেন আর অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না । আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান ।"

রসুল মুহাম্মদ ভুলে গেছেন বাক্যের প্রথমে 'কুল' (বলো) শব্দ না বসালে কথা যে তাঁর নিজের হয়ে যাবে! এতোদিন আল্লাহর প্রিয় হয়ে থেকেও এরা আল্লাহর ক্ষতি করবেন তা কল্পনা করাও তো গুনাহ । যাক আল্লাহর ইচ্ছে, তাঁর সব কিছুই কল্পনা করার অধিকার আছে ।

৪০. "যদি তোমরা তাঁকে (রসুলকে) সাহায্য না করো তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেরেরা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল । তিনি ছিলেন দু'জনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে

ছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আপনাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন এক বাহিনী পাঠালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের মাথা নত করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

এই বাক্যে বক্তা আল্লাহ না মুহাম্মদ না জিব্রাইল? এঁদের হলোটা কি? এতো কাকুতি মিনতি করা হচ্ছে, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতিও দেখানো হচ্ছে, সর্বোপরি তারা জানেন, তারা আছেন যতো, আকাশ থেকে আসবেন ততো এবং মহা পরাক্রমশালী স্বয়ং আল্লাহও তাদের পক্ষে, তবুও যেন ওরা নড়তে চায় না। তাদের কি হুনাইনের সেই ভয়ানক জঙ্গলের কথা মনে পড়েছে, না কি রোমানদের ভয়ে তারা ভীত! আর আল্লাহই বা কষ্ট করে বারবার সাদা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে ধরাতলে নেমে আসেন কেন? কিছু সময়ের জন্যে সুপারম্যান আজরাইলকে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়।

৪১. "তোমরা বের হয়ে পড়ো অল্প অথবা প্রচুর সরঞ্জাম নিয়ে (যা কিছু আছে তাই নিয়ে) আর জেহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের প্রাণ ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে খুবই উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো।"

মদিনার নতুন মুসলমানদের বুদ্ধিসুদ্ধি মক্কার জেহাদি ভাইদের তুলনায় একটু কমই। এমনিতেই যুদ্ধে যেতে চায় না আর গেলেও যুদ্ধে পাওয়া মালের ওপর ভাগ বসাতে চায়। এরা তখন বুঝবে যখন মুনাফিকের খাতায় নাম উঠবে!

৪২. "যদি (এ যুদ্ধে) আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো আর যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যেতো, কিন্তু দুর্গম পথ তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হলো। তারা তোমার কাছে কসম খেয়ে বলবে—আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছে আর আল্লাহ জানেন এরা মিথ্যেবাদী।"

মহাশক্তিশালী রোম সম্রাটের সাথে যুদ্ধ। নগদ মালের সম্ভাবনাও নেই। খামোখা জানের ওপর রিস্ক নিতে কি সকলে চায়?

৪৩. (হে নবী) "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদেরকে অব্যহতি দিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো কে সত্য বলছে আর জেনে নিতেন কে মিথ্যেবাদী?"

'আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদেরকে অব্যহতি দিলেন'—কে বলছেন কথাটা? মুহাম্মদের কোনো গুপ্তচর, কোনো সাহাবি? ক্ষমা তাকেই করা হয় যে অপরাধ করে। আল্লাহর অনুমতি না নিয়ে মুহাম্মদ কাজটা করলেন কি!

৬৬. "অজুহাত দেখিও না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছো ঈমান আনার পরও। তোমাদের কিছু লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, অবশ্য কিছু লোককে আজাবও দেব কারণ তারা ছিল অপরাধী।"

কোন দুঃখে ঈমান আনার পরও নব্য মুসলমানগণ কাফের হয়ে গেল? মক্কার কোরায়েশদের আচরণ, মুহাম্মদ ও তাঁর ইসলামের 'রাজনৈতিক' মুখোশপরা সন্ত্রাসী চেহারা চিনতে ভুল করেছিল?

৭৯. "যারা বিদ্রুপ করে সেই সকল মুসলমানদের প্রতি যারা মুক্ত মনে দান খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই নিজের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ছাড়া। অতঃপর তারা ওদের প্রতি ঠাট্টা করে, আল্লাহও তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।"

যে আল্লাহ বারবার বলেন তার কাছে আছে অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার, মানুষের সকল ধন তারই দেয়া, সেই আল্লাহ যখন মানুষের কাছে কর্জ চান, ভিক্ষে চান, বিজনেস করেন, মানুষ একটু কনফিউজড হবেই! মদিনার মানুষ মুসলমান হলো, কিন্তু তাদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ছাড়া কিছুই নেই, আর মক্কার শরণার্থীদের কিছুদিন আগেও কিছুই ছিল না অথচ এখন দুই হাতে দান-খয়রাত করতে পারে, বিষয়টায় ভাববার হেতু আছে। মুসলমানরা তো আর মাটি খুঁড়ে কোনো গুপ্তধন পান নাই? চুপিচুপি প্রশ্ন করি লুণ্ঠন, ডাকাতি, সন্ত্রাস, হত্যা ইত্যাদি ছাড়া কি ঐ সময় দ্রুত পয়সা বানানোর কোনো সুযোগ ছিল? যাহোক, আল্লাহও তাদের প্রতি ঠাট্টা করে নিয়েছেন। সমানে সমান হয়ে গেছে আর দুঃখ নেই!

৮০. "তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো, যদি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবু আল্লাহ ওদের ক্ষমা করবেন না। তা এ জন্যে যে তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ নাফরমানদেরকে পথ দেখান না।"

আল্লাহর রাগ উঠে গেছে সুতরাং মুহাম্মদ ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তা কবুল হবে না। তবে যদি একাত্তরবার করেন, ভেবে দেখবেন কি মহান আল্লাহতায়ালা?

৮১. "(তাবুক অভিযানে) পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দবোধ করেছে, আর তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে এই গরমের দিনে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও জাহান্নামের আগুন অনেক বেশি উত্তপ্ত যদি তারা বুঝতে পারতো।"

৮২. "অতএব তারা সামান্য হেসে নিক। তাদের কৃতকর্মের বদলে অনেক বেশি কাঁদবে।"

তারা হাসলো আর আল্লাহ হাসলেন না, এ কেমন কথা?

৮৩. "কাজেই আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন (তাবুক থেকে) তাদের কোন দলের মাঝে আর তারা তোমার সাথে বেরুবার অনুমতি চায় তুমি বলো—তোমরা কোনো সময়ই আর আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। নিশ্চয়ই তোমরা তো প্রথমবারে পেছনে থেকেছ। সুতরাং পেছনে থাকার দলেই থেকো।"

'আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন'—কথাটা যেন কোনো মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত মনে হচ্ছে।

৮৪. "তাদের কারো মৃত্যু হলে তুমি তাদের জন্যে নামাজ পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, আর রাসুলের প্রতিও, আর তারা মরেছেও নাফরমান অবস্থায়।"

যুদ্ধ না করার অর্থ বুঝি আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা? এরা কি মুসলমান ছিল?

৯৪. "তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা তোমার কাছে এসে ছলনা করবে, তুমি বলো ছলনা করো না আমি কখনো তোমাদের কথা শুনবো না, আল্লাহ আমাকে তোমাদের সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এখন থেকে আল্লাহই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন আর তার রসুলও। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে সেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিষয়ে অবগত সত্তার কাছে। তিনিই তোমাদের বলে দেবেন তোমরা যা করেছিলে।"

আজ যদি কোনো জ্যোতিষী 'ভবিষ্যৎবাণী' লেখে এভাবে : "বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে, রাজাকার-আলবদরের দল সংসদে যাবে"—এমন জ্যোতিষীকে আপাদমস্তক পাগল ছাড়া আর কি বলা যায়?

৯৫. "যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা আল্লাহর কসম খাবে, যেন তুমি তাদের উপেক্ষা করো, সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহে এরা নাপাক এবং এদের গন্তব্যস্থল হলো জাহান্নাম।"

হাটকোর্ট থেকে জামিন পেলে কি হবে, সুপ্রিম কোর্টে আপিল হয়ে গেছে, ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই! 'ভবিষ্যতকাল' দিয়ে বলা বাক্যগুলো, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর প্রকাশ করা হচ্ছে কেন?

১০২. "কোন কোন লোক আছে যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা এক ভাল কাজের সাথে অপর মন্দ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আবারো বলতে হচ্ছে : 'আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন'—কথাটা কি আল্লাহর?

১০৩. "তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (দান) গ্রহণ করো যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের জন্যে সান্ত্বনা স্বরূপ। আসলে আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।"

সর্বনাশ, বলেন কি! এরই মধ্যে কালো টাকা সাদা হয়ে গেলো? তবুও শুকরিয়া টাকার গন্ধ পেয়ে আল্লাহ যে মাইন্ড চেইঞ্জ করেছেন। এবার তো আল্লাহর গুস্বা কিছুটা শীতল হয়েছে। তা দোয়া কতবার করতে হবে বললেন না তো? ৭০ বার না ৭১ বার?

১০৭. "যারা জিদের বশে মসজিদ নির্মাণ করেছে, তাদের ঘাটি স্বরূপ, কুফরির তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, পূর্ব থেকে যুদ্ধ করে আসছে আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে, তারা কসম খেয়ে বলবে—আমরা যা করেছি মঙ্গলের জন্যে করেছি। অথচ আল্লাহ সাক্ষী যে তারা সবাই মিথ্যুক।"

কোর্ট নেই, কাছারি নেই, সাক্ষী হাজির। আবার কেউ সাক্ষীকে দেখেও না।

১১১. "আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে তাদের জন্যে রয়েছে বেহেস্ত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায় অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল, কোরানে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে নিজ ওয়াদাতে সত্যনিষ্ট আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করো তোমাদের সওদার জন্যে যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটি হচ্ছে মহাসাফল্য।"

নিঃসন্দেহে এখানে বক্তা আমাদের দয়াল নবী মুহাম্মদ। 'অতএব তোমরা আনন্দ করো তোমাদের সওদার জন্যে যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ।'—এই 'তাঁর' ব্যক্তিটি কে? বাক্যটি বোধহয় এভাবে হওয়া উচিৎ ছিল : 'অতএব তোমরা আনন্দ করো তোমাদের সওদার জন্যে যা তোমরা আমার সাথে করেছ।' জানমাল নগদ, দৃশ্যমান ও বাস্তব কিন্তু বেহেস্ত বাকি, অদৃশ্য ও কল্পনা, এ কেমন বিজনেস?

১২৩. "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক, আর জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকিনদের সাথে আছেন।"

এ আয়াত অনুসরণ করেই, সারা পৃথিবী জুড়ে 'ঈমানদারগণ' (জেহাদি) কাফের নিধনে লিপ্ত আছেন এবং এ যুদ্ধ অনাদিকাল পর্যন্ত চলবে। আর কোরান শরিফই শিক্ষা দেয়া হয় বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি সেন্টার, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উপরের দুটি সুরার অধিকাংশ আয়াত পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনা করা পর এটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কোরান ইজ নট এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ; এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে অন্যান্য তথাকথিত 'ধর্মগ্রন্থের' (তৌরাত শরিফ, ইঞ্জিল শরিফ, বেদ, গীতা ইত্যাদি) মতো 'ছেলে-ভুলানো' গুটিদুয়েক সুন্দর-সুন্দর কথাবার্তার পাশাপাশি প্রচুর আগ্রাসী-উত্তেজক বক্তব্য আছে, যা বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য অনুসরণীয় হতে পারে না। স্থান-কাল-বিষয়কে অস্বীকার করে 'ঐশী নির্দেশ' ভেবে দেড়হাজার বছরের পুরানো নিয়মনীতি-আদর্শকে ধরে রাখতে গেলে, একবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় অনুকরণ করতে গেলে, আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার, বিজ্ঞানমনস্কতা ইত্যাদি প্রগতিশীল সমাজচেতনার সাথে সাংঘর্ষিক হতে বাধ্য। আর এ বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি আমাদের সম্মানিত জনসাধারণ থেকে শুরু করে ধর্মতত্ত্ববিদ, রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারবেন ততই মঙ্গল।

৪

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে কোন ধর্মগুরু কিংবা ভন্ড পীরের চালাকির-কৌশল যখন জনসাধারণের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়, তখন সে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে বল প্রয়োগ করে। বল প্রয়োগ করে ব্যর্থ হলে তার ধ্বংস অনিবার্য, সফল হলে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন একজন নবী, পয়গম্বর, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বা ভগবান হিশেবে। পৃথিবীতে সম্ভবত একমাত্র বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত প্রায় সকল ধর্মই এই পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (দঃ) মক্কায় থাকাকালীন চল্লিশ বছর বয়সে এসে যখন নিজেকে একেশ্বরবাদী আল্লাহর প্রেরিত 'নবী' বলে ঘোষণা দিলেন, লোকেরা তাঁর কথায় সন্দেহ করলো; এবং সন্দেহ করাটাই স্বাভাবিক ছিল। প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) নিজের নাম না দিয়ে একখানি বই (কোরান শরিফ) লেখালেন স্থানীয় কিছু অনুগত-গুণগ্রাহী সাহিত্যিক দ্বারা, কিন্তু তৎকালীন আরবের জনসাধারণকে বললেন, কথাগুলো আল্লাহ নাকি লিখে রেখেছিলেন তার (আল্লাহর) বাসস্থান 'লাওহে মাহফুজে'; কোরানে বলা হল : বাল্ হুয়া কোরআনুম মাজিদ, ফি লাওহিম মাহফুজ; অর্থাৎ "বস্তুত এ হচ্ছে সম্মানিত কোরান। (যা আছে) সুরক্ষিত ফলকে লেখা।"; ইউসুফ আলি অনূদিত ইংরেজি কোরান শরিফে বলা হয়েছে : Day, this is a Glorious Qur'an, (Inscribed) in a Tablet Preserved! (সুরা ৮৫, বুরুজ, আয়াত ২১-২২)।

লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে আল্লাহ কি নিজের হাতে লিখেছিলেন? কোরানে আল্লাহ বলেন : ফি ছুহুফিম মুকাররামাহ। মারফুআতিম মুতাহ্হারাহ...। (It) is a book held (greatly) in honor, Exalted (in dignity) kept pure and holy, (Written) by the hands of scribes, honorable and Pious and Just. (সুরা ৮০, আ'বাসা, আয়াত ১৩-১৬)।

সুতরাং বুঝা গেলো, কোরান শরিফের দাবি মতো লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে ফেরেস্তাদের পবিত্র হাতে লেখা বইখানি (কোরান) নির্ভুল ও সন্দেহাতীত! প্রশ্ন হলো (আপাত ধরে নিচ্ছি) অতীতে লেখা বইখানি বর্তমান ঘটনার সাক্ষী হয় কিভাবে? ধরা যাক ২০০৪ সালের ২২ আগস্টের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় খবর বেরুলো : "গতকাল (২১ আগস্ট) বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের জনসভায় সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় আই.ভি. রহমানসহ অনেক মানুষ নিহত হয়েছেন আর শতশত মানুষ আহত হয়েছেন।" কেউ যদি বলে, পত্রিকায় খবরের হুবহু ঐ লাইনটি দশবছর পূর্বে আরেকটি পত্রিকা অফিসে দেখেছে, তখন কোনো অন্ধলোকও কি ঐ ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করবে? পাগল ছাড়া আর কি ভাবতে পারে ঐ লোকটিকে। এটা কি সম্ভব যে বদর, ওহুদ, মু'তা, খাইবার যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ, অথবা মুহাম্মদের পালক পুত্র জায়েদ তার স্ত্রী জয়নাবকে তালাক দেবেন তারপর মুহাম্মদ জয়নাবকে বিয়ে করবেন, এ সবগুলোই পূর্ব পরিকল্পিত এবং লাওহে মাহফুজে লেখা ছিল?

মক্কার মানুষেরা দেখলো মুহাম্মদ (দঃ) তাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের কথাই ভিন্নভাবে কবিতার গদ্যছন্দে বলছেন। প্রফেট মুহাম্মদকে মক্কার লোকেরা 'কবি' হিসেবে চিহ্নিত করলে[৫৪], জবাব এলো : "আমি রসুলকে কাব্যরচনা করতে শেখাইনি, আর এ তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরান।" (সুরা ৩৬, ইয়াসিন, আয়াত ৬৯)। কোন কাজটি শোভনীয় না হয়েও 'স্বার্থ হাসিলের' জন্য করা যায়, আজকালকার লোকেরা যেমন ভালো বুঝে, তেমনি ষষ্ঠ শতাব্দীর লোকেরা বুঝতে পারতো। ওরা এতো অনুর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী ছিল না বলেই মনে হয়। লোকেরা যখন তাঁকে প্রশ্ন করতো, প্রমাণ চাইতো, 'সুস্পষ্ট কোরানের' ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতো তিনি কৌশলে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে, প্রশ্ন এড়িয়ে প্রত্যেকবারই উত্তরের বদলে নিয়ে আসতেন নরকের আজগুবি সব ভয়ঙ্কর কাহিনী, হুমকি, হুঁশিয়ারি, আর দেখাতেন স্বর্গের সীমাহীন আরাম-বিলাস, অবাধ নারী সম্ভোগের প্রলোভন। কোরানে বলা হল : 'আর তুমি যখন তাদেরকে দেখবে আমার বাণীসমূহ নিয়ে নিরর্থক তর্ক করছে, তখন তুমি তাদের থেকে দূরে সরে যাবে যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে মনে পড়ার পরে বসে থেকো না অন্যায়কারীদের সাথে'। (সুরা ৬, আনআম, আয়াত ৬৮)।

শয়তান মুহাম্মদকে ভুলাতো, না তিনি নিজেই ভুলে যেতেন; স্মরণশক্তি যতই প্রখর হউক না কেন, রক্তমাংসের মানুষতো! শুনা-কথা ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। হাদিসেও নবীর ভুলে যাওয়ার প্রমাণ আছে। নবী স্বীকার করছেন, তিনি 'আল্লাহ হতে নাজিলকৃত' কোরানের অনেক সুরার অনেক আয়াত ভুলে গেছেন। হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত এরকম একটি হাদিস হচ্ছে : আল্লাহর রসুল

[৫৪] প্রফেটকে 'কবি' হিসেবে সন্দেহ করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল মক্কাবাসীর। আরবের কবিদের যে স্বভাব ও আচরণ প্রচলিত ছিল নবীর বেশভূষায়ও তা সময়ে সময়ে প্রকাশ পেত। তিনি কবিদের মত তাঁর মাথা চাদর (বারদা) দিয়ে ঢেকে রাখতেন যখন কথিত 'প্রত্যাদেশ' আসতো। আবার ঐ সময়ে প্রত্যেক খ্যাতিমান পেশাদার কবির অনুগত বা ভাড়াটে অনেক আবৃত্তিকার (রাবী) থাকতো, যারা কবিতা লিখে রাখতো, মুখস্ত রাখতো, ঘনঘন পুনরাবৃত্তি করতো। যেমন ইসলামপূর্ব আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েস নিজে একসময় অন্য এক কবির 'রাবী'র দায়িত্ব পালন করেছিলেন, পরে নিজের জন্য অনেক রাবী নিয়োগ করেন। আরেক খ্যাতনামা কবি ধু-রামা (মৃত ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে) নিজে লিখতে-পড়তে জানতেন না, কিন্তু তাঁর নিয়োগকৃত রাবীরা মুখে-মুখে কবিতা শুনে মুখস্থ করে নিতেন। আমাদের নবীরও কোরান লিখে রাখার জন্য ৪০-৪২ জন কাতিবসহ আয়াত মুখস্ত রাখার জন্য অনেক হাফেজ ছিলেন, বলা যায় তাঁরা 'রাবী'র দায়িত্ব পালন করতেন। এই কাতিব-হাফেজদের মধ্যে আরবের অত্যন্ত পরিচিত ও খ্যাতনামা কয়েকজন 'কবি' মুহাম্মদকে সহযোগিতা করতেন, সেটা আজকের যুগের কোনো ইসলামি বুজুর্গ ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবেন না। উদাহরণ হিসেবে আমরা দু-এক জনের নাম উল্লেখ করতে পারি : ইসলামপূর্ব আরবের একেশ্বরবাদী (হানিফ) জায়েদ বিন আমর বিন নওফল (দ্বিতীয় খলিফা ওমরের চাচা), আরবের শ্রেষ্ঠ সাতজন কবির অন্যতম লাবিদ বিন রাবিয়া ইবনে জাফর আল-আমিরি, মদিনার খাজরাজ গোত্রের পেশাদার কবিয়াল বংশের লোক হাসান বিন থাবিত, ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অভিজ্ঞ জাবের প্রমুখ। (আগ্রহী পাঠকেরা নবীজির কোরান রচনায় সহায়তাকারী বা প্রভাব বিস্তারকারী আরবের বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তির প্রভাব সম্পর্কে জানতে পাঠ করুন : Abul Kasem, Who Authored the Qur'an?—an Enquiry, http://www.mukto-mona.com/Articles/kasem/quran_origin.htm)। তাছাড়া মক্কার সুরাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এগুলি মাপা শব্দে গ্রন্থিত ও গদ্য ছন্দে সজ্জিত; এর ধ্বনি, দ্যোতনা এবং অভ্যন্তরীণ ছন্দ যে কোনো সুন্দর কবিতার মতোই মানুষের মনকে মাতিয়ে দেয়। ৮১ নং সুরা তাক্‌ভিরের ১-১৪ নং আয়াত এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়া মক্কার অনেকগুলি সুরা শুরু হয়েছে ডুমুর, জলপাই, সিনাই পর্বতের নামে (৯৫:১-২), গ্রহ-নক্ষত্র, রাত্রির (৮১:১৫-১৬), রাশিচক্রবিশিষ্ট আকাশের, দিনের (৮৫:১-২) ইত্যাদির 'শপথ' দিয়ে যা আরবের তৎকালীন কবিদের কবিতার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট; পাশাপাশি তৎকালীন কবি ও জাদুকরের ন্যায় অনেক সুরাতেও শত্রু বা বিরোধিতাকারীদের প্রত্যক্ষভাবে অভিশাপ ও অমঙ্গল কামনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, পৃষ্ঠা ৮২, ১৮০)। তবে মদিনার বৃহৎ সাইজের সুরাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এগুলি অত্যন্ত সচেতনভাবে রচনা করা হয়েছে, মক্কার সুরার মতো আবেগময় সুর-ছন্দ-ধ্বনি মাধুর্য এখানে নেই, বরং আইনকানুন ঘোষণা, মতবাদ, অপরাধ, শাস্তি ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে ভর্তি। মক্কা-মদিনার সুরাগুলির পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, 'গায়েবি' কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান না করে মক্কার একজন ব্যবসায়ী প্লাস সংগঠক থেকে মদিনাতে গিয়ে নেতা থেকে শাসক হয়ে ওঠার জীবনধারার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে পেয়ে যাবেন এই প্রশ্নের উত্তর। যদিও নবীজি মক্কায় থাকতে কোরানকে 'কাব্য'গ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি দিতে কোরানের অনেক আয়াতে বারেবারে জোরগলায় অস্বীকার করেছেন। আর মদিনাতে এসে বিরোধিতাকারী কবিদের ভালোভাবেই শায়েস্তা করলেন। হাদিসে পাই নবীজি কবিতার নিন্দা করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন, 'পেট ভরা কবিতার চেয়ে পেট ভরা পুঁজ অনেক ভালো।' (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৭৩, নম্বর ১৭৫, ১৭৬)।

শুনতে পেলেন রাত্রিবেলা একজন ব্যক্তি কোরান পাঠ করছে। নবীজি বলে ওঠলেন, আল্লাহ হয়তো ঐ লোকটিকে ক্ষমা করে দিবেন কারণ সে কিছু কিছু সুরার আয়াত মনে রেখেছে যা আমি নিজেই ভুলে গেছি। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬১, নম্বর ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬২)। যাহোক, সন্দিহান লোকেরা যখন ধরে ফেললো মুহাম্মদ একটি ঘটনা ভিন্ন সময়ে দুইভাবে বলছেন; তখন তারা এই দ্বিচারিতা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করলো, তখন আল্লাহ (?) এসে কভার-আপ দিলেন : "যে সকল আয়াত আমি মনসুখ করি অথবা ভুলিয়ে দেই, আমি এর পরিবর্তে আরও ভালো অথবা অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি।" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ১০৬)।*

আল্লাহর পাঠানো একটা আয়াতের চেয়ে আরেকটা আয়াত ভাল হয় কিভাবে? আল্লাহর তাহলে মুহাম্মদকে নিয়ে পরিকল্পনায় মস্ত ঘাটতি রয়ে গিয়েছিল! ভুলে যাওয়া আয়াতগুলো বর্তমানের কোরান শরিফে কি লেখা হয় নাই? এখন কোথায় আছে? যতদূর জানা যায়, ভুলে যাওয়া আয়াতগুলোও মুহাম্মদের অনুগামী মানুষেরা লিখে রেখেছিল, কিন্তু ধ্বংস করা হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর বিশ বছর পরে খলিফা ওসমানের সময় কোরানকে 'রাষ্ট্রীয়ভাবে' সম্পাদনা করতে গিয়ে।

যাহোক, প্রশ্ন তো অবশ্যই উঠবে। আরবের জনসাধারণের অবাক হওয়ারই তো কথা। প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে একজন নবী পৃথিবীতে ছিলেন বলে তাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, কিন্তু নবী যে কেমন লোক হয়, স্বচক্ষে কেউ কোনোদিন দেখে নাই। তাদেরই মাঝের একজন এতো দিন ধরে পূর্বপুরুষদের পৌত্তলিক ধর্ম ঘটা করে অনুসরণ-পালন করে হঠাৎই বলা শুরু করলেন, তিনি একেশ্বরবাদী আল্লাহর প্রেরিত এক অসাধারণ মানুষ, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেন! এটা কি করে সম্ভব হয়? কোরানে আল্লাহ বললেন : "এ কি অবাক হওয়ার ব্যাপার যে তাদেরই একজন মানুষকে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছি এই বলে—তুমি মানুষকে সতর্ক করো...।" (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ২)। "বলো, আল্লাহ যদি না-চাইতেন, তবে আমি তোমাদের কাছে এ পাঠ করতাম না আর আল্লাহও তোমাদের কাছে এ পাঠাতেন না। আমি তো তোমাদেরই মাঝে এক জীবন কাটিয়েছি।" (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ১০)।

আওয়া আজিবতুম আন-জাআকুম জিকরুম মিররাবিকুম...। অর্থাৎ "তোমরা কি অবাক হচ্ছো যে তোমাদের কাছে সংবাদ এসেছে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন মানুষের মাধ্যমে?" (সুরা ৭, আ'রাফ, আয়াত ৬৯)।

মানুষের সন্দেহ ঘুঁছে না। মুহাম্মদ সুরা 'আল আরাফ'-এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে নিয়ে এলেন আদ, সামুদ, মুসা, ফেরাউন, শোয়াইব, লুত, ও নুহ সম্প্রদায়ের কাহিনী; প্রমাণ করতে চাইলেন তাকে (মুহাম্মদকে) নবী বলে না মানলে তাদেরকেও আল্লাহ শাস্তি দেবেন যেমন শাস্তি দিয়েছিলেন ঐ সব সম্প্রদায়ের লোকদের ঝড়, তুফান, বজ্রপাত, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প দিয়ে।

হাজার-হাজার বছর পরে, আল্লাহর মনোনীত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর পরে কেন আল্লাহ এই গ্রন্থখনি পাঠালেন? এর পূর্বে কষ্ট করে এতোখানি গ্রন্থ লিখে জগতে প্রেরণ করা কি আল্লাহর 'গ্রেট মিসটেক' ছিল না? আল্লাহ কি এতোই অপরিণামদর্শী দুর্বল ও শক্তিহীন যে তার লেখা বইগুলোকে মানুষ বিকৃত করলো, অথচ তিনি তা আগে জানতেন না? একটা কপি নষ্ট হয়েছে তো কি হলো, আরেকটা কপি পাঠিয়ে দিলেই তো হতো! নতুন করে আরেকটা বই লেখার কি প্রয়োজন ছিল? সন্দিহান মানুষের প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ (দঃ) বললেন—'জালিকাল কিতাবু লারাইবাফিহ্'; অর্থাৎ এই সেই বই, যে বইয়ে কোনো সন্দেহ নেই (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ২)। যদিও বাক্যটি 'আল্লাহর বাণী' হিসেবে মুহাম্মদের মুখ থেকে সর্বপ্রথম বের হয়নি; কোরানে এনে বসিয়েছেন মুহাম্মদের অন্ধবিশ্বাসী কয়েকজন লোক, তার মৃত্যুর প্রায় বিশ বৎসর পরে। অন্ধভাবে তাঁকে (মুহাম্মদকে) নবী হিসেবে ও তাঁর কথাগুলোকে ঐশীবাণীরূপে বিশ্বাস করানোর জন্যে; পরবর্তী বাক্যেই মুহাম্মদ বললেন, 'হুদাল্লিল মুত্তাকিন', অর্থাৎ মুত্তাকিনদের জন্যে এ একটি পথ-নির্দেশক। কিন্তু 'মুত্তাকিন' কারা? কোরানে বলা হল : 'আল্লাজিনা ইউমিনুনা বিল গায়িব', অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে গায়েবের (অদৃশ্য বস্তুর) ওপর। (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ৩)। মুহাম্মদ কিছু মানুষকে 'বোকা' বানাতে সক্ষম হলেন। তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করলো আল্লাহ, ফেরেস্তা, শয়তান, বেহেস্ত, দোজখ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, তক্‌দির, জিন, পরী, তাবিজ- কবজ, যাদু-মন্ত্র, হুর-গেলোমান, আরশ-কুরসী জাতীয় গায়েবি-অদৃশ্য বস্তুর ওপর। ওপরের আয়াতানুযায়ী কোরান প্রশ্নাতীত, কোরান সন্দেহাতীত, কোরান অন্ধবিশ্বাসী মানুষের জন্যে বেহেস্তের সোপান। এর পরে কোরানকে বিজ্ঞানের চোখে দেখতে চায় কোন্ সে বে-আক্কেল? অন্ধ-বিশ্বাস ধর্মের ভিত্তি, পক্ষান্তরে সন্দেহ আর প্রশ্ন বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। বিজ্ঞান আলো হলে ধর্ম অন্ধকার। বিজ্ঞানের অপরিসীম সাফল্যতার সামনে ধর্ম এখন ইনটেনসিভ কেয়ারে লাইফ-সাপোর্ট মেশিনে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। মুক্তমনা, সন্দেহবাদী, দ্বান্দিক বস্তুবাদী, বিবর্তনবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের জন্যে কোরানের সুরা বাকারার দ্বিতীয় বাক্যটিতেই নিহীত রয়েছে সর্বশেষ উত্তর; সামনে অগ্রসর হওয়া অর্থহীন। প্রশ্নের দরজা বন্ধ। আল্লাহর দোহাই দিয়ে মুহাম্মদ কোরানে বলছেন : "তোমরা কি তোমাদের রসুলকে প্রশ্ন করতে চাও, যেমন মুসাকে এর আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল?" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ১০৮)।

* লক্ষ্য করুন 'আল্লাহর ওহি' বলে ঘোষিত কোরান শরিফের সুরা বাকারার ১০৬ নং আয়াত ও সুরা নাহ্‌লের ১০১ নং আয়াতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা পরস্পরবিরোধী (Contradictory) হচ্ছে সুরা ইউনুসের ৬৪ নং আয়াত, সুরা আনআমের ৩৪, ১১৫ নং আয়াত, সুরা কাহাফের ২৭ নং আয়াত।

তবুও বারবার মানুষ কোরান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে। বারবার ভয় ভীতি আর লোভ-প্রলোভন দেখিয়েও সকল মানুষকে বোকা-অন্ধবিশ্বাসী বানাতে না পেরে তিক্ত-বিরক্ত মুহাম্মদ শেষমেশ অভিশাপ দিতে শুরু করলেন :

> 'ওয়লাকাদ আনজালনা ইলাইকা আয়াতি বায়্যিনাতিন, ওয়ামা য়্যাকফরু বিহা ইল্লাল ফাসিকুন।' অর্থাৎ আর নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে নাজিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, কেবল দুর্বৃত্তরাই তা অবিশ্বাস করে। (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ৯৯)।
>
> 'নিঃসন্দেহে যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহর বাণীসমূহ তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি।' (সুরা ৩, আল ইমরান, আয়াত ৪)।
>
> 'আর যারা আল্লাহর বাণীসমূহে মিথ্যারোপ করে তারা নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকারে বোবা-বধির।' (সুরা ৩৬, আল আনাম, আয়াত ৩৯)।
>
> 'খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়ালা সামইহিম ওয়ালা আবসারিহিম গিশাওয়াহ, ওয়ালাহুম আজাবুন আজিম।' অর্থাৎ আল্লাহ তাদের (অবিশ্বাসীদের) অন্তর ও কানসমূহ তালাবদ্ধ করে দিয়েছেন, তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন, আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ৭)।
>
> "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিন ওয়াতাব্বা। মা আগ্‌না আ'নহু মালুহু ওয়ামা কাসাবা। সায়াস্‌লা নারান জাতা লাহাবিন। ওয়ামরাআতুহু, হাম্মালাতা আলহাত্বাবি। ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদিন।" অর্থাৎ "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দুটো। আর সেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। তাকে অচিরেই ঠেলে দেওয়া হবে জ্বলন্ত আগুনে। আর ইন্ধন যোগানকারী তার স্ত্রীকেও। তার গলায় থাকবে খেজুর পাতার আঁশের তৈরি শক্ত বেড়ী।" (সুরা ১১১, লাহাব বা মাসাদ, আয়াত ১-৫)।

কে এই আবু লাহাব? কেন আল্লাহ (নবীজি?) তাঁর ধ্বংস কামনা করছেন? আর কেনই বা মুসলমানগণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবু লাহাবের ধ্বংস কামনা করেন? নবীজির জীবনীকারকরা আমাদের জানিয়েছেন, আব্দুল উজ্জা ('আবু লাহাব' নামেই বেশি পরিচিত) নবীজির আপন চাচা; আবু তালিবের ভাই। কিন্তু কেন আপন চাচার ধ্বংস কামনা করা হচ্ছে? কারণটা জানতে হলে আমাদেরকে নবীর মক্কাজীবন সম্পর্কে জানতে হবে। মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিবি খাদিজা এবং নবী মুহাম্মদের তিন কন্যার মধ্যে দুই কন্যার (রোকেয়া ও উম্মে কুলসুম, তাঁরা খাদিজার প্রথম স্বামীর সন্তান) সাথে নবী নিজেই বিয়ে দিয়েছিলেন চাচা আব্দুল উজ্জা বা আবু লাহাবের দুই পুত্র ওত্‌বা এবং ওতাইবার সাথে; এবং তা মুহাম্মদের নিজেকে 'নবী' বলে ঘোষণার কিছুদিন আগে। কোরায়েশ বংশের হাশিমি গোত্রের প্রধান আবু তালিবের মতো তার ভাই আবু লাহাবও ছিলেন কাবা ঘরের মূর্তিপূজারি (পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী)। 'নবীত্বের' ঘোষণা দেওয়ার প্রথম থেকেই মুহাম্মদের ইসলাম ধর্মের প্রচারকে তিনি মনে করতেন ভ্রান্ত এবং ভবিষ্যতে গোত্র-দ্বন্দ্ব ও আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে; যার জন্য তাঁর মধ্যে প্রফেটের প্রতি চাপা ক্ষোভ-উষ্মা জমা ছিল। নবী মুহাম্মদ যতোই ইসলাম ধর্মের চর্চা সংগঠিতভাবে পরিচালনা করতে লাগলেন, মক্কার পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতা করতে লাগলেন, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে লাগলেন আবু লাহাব ততোই নতুন ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে মুহ্যমান হন; পরবর্তীতে একসময় প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নবীর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। আবু লাহাবের সন্তানদ্বয়ও রোকেয়া ও কুলসুমকে তালাক প্রদান করে নবীর পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নবীজি অন্তরে বেশ দুঃখ পেলেন, কিন্তু তখনও আবু লাহাবের মতো ব্যক্তিদের 'ভিটেয় ঘুঘু চরানো'র মতো সামর্থ তাঁর হয়ে ওঠেনি। Sir William Muir-এর ভাষ্য মতে, নবীজি তার 'মিশন' (৬১০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নিজেকে আল্লাহর নবী ঘোষণা করেন) শুরু করার তিন-চার বছর পর (তবে অনেক তফসিরকারক সুরা লাহাবের সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি) একদা বনি হাশিম, বনি আবু মুত্তালিব, বনি ফিহর গোষ্ঠীর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এবং কোরায়েশ বংশের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দিয়ে প্রফেট নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তার পাশাপাশি ইসলামের মূল নীতি সম্পর্কে অভিহিত করছিলেন। এমন সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হলেন আবু লাহাব। তিনি চিৎকার করে ওঠলেন, ধ্বংস হও মুহাম্মদ! কোরায়েশ বংশের লোকদের দাওয়াত দিয়েছ অথচ আমাদের কি দিয়েছ? উৎসন্নে যাও, আজ থেকে আমি তোমার ঘোর শত্রু হলাম! মুহাম্মদও নিজেকে ধরে রাখতে পালেন না। প্রচণ্ড রাগে তিনি বলে উঠলেন, তুমিও ধ্বংস হও! অনির্বাণ অগ্নিশিখায় জ্বলতে থাকো! এই ঘটনার পর থেকে মুহাম্মদের চাচা আব্দুল উজ্জার নাম হয়ে যায় 'আবু লাহাব', মানে অগ্নিশিখার পিতা। নবী তখনই ওহি পেয়ে গেলেন, আবু লাহাব ও তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিলের (উমাইয়া গোত্র নেতা আবু সুফিয়ানের বোন) নামে, তাঁরা ধ্বংস হবে, তাঁদের নরকবাস হবে। (সুরা ১১১, লাহাব, আয়াত ১-৫)। পরবর্তীতে আবু লাহাব বদর যুদ্ধের কিছু পরে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সচেতন পাঠকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসবে, মক্কাবাসী মুহাম্মদ তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই কন্যা রোকেয়া ও উম্মে কুলসুমকে মূর্তিপূজক ও কোরায়েশ বংশের প্রভাবশালী আবু লাহাবের দুই ছেলের সাথে বিয়ে দিলেন কেন? কারণ সকলেরই জানা। নবী মুহাম্মদ (দঃ) ভালোভাবেই জানতেন বাহুবল ও অর্থবল ছাড়া তাঁর নতুন ধর্ম যে 'সূতিকা ঘরে'ই মারা যাবে; যেমনটা হয়েছে আরবের আরেক একেশ্বরবাদী হানিফদের অবস্থা। প্রশ্ন দেখা দেয় আবু লাহাবের দুই ছেলে, নবী কন্যা রোকেয়া ও উম্মে কলসুমকে তালাক না দিলে,

আবু লাহাব বা আব্দুল উজ্জা মুহাম্মদকে ত্যাগ না করলে সুরা 'লাহাব' কি নাজিল হতো? এও কি পূর্ব নির্ধারিত? নবীর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিয়ে রচিত 'সুরা লাহাব' কি ফেরেস্তাদের পবিত্র হাতে সুরক্ষিত ফলকে লেখা ছিল? এ সকল জবাব না পাওয়া প্রশ্নের কারণে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই সুরা লাহাব আল্লাহর ওহি না নবী মুহাম্মদের নিজের বক্তব্য, তা নিয়ে বির্তক চলে আসছে। অনেকেই বিশেষ করে ইসলামের একমাত্র মুক্তচিন্তার অনুসারী মোতাজিলারা এই সুরাকে আল্লাহর 'ওহি' বলে মানতে নারাজ। যাহোক, আমরাও একটি প্রশ্ন তুলতে পারি সুরা লাহাবের ভাস্য নিয়ে। সুরা ইয়াসিনের ৮২নং আয়াতে কথিত 'সর্বশক্তিমান' আল্লাহ দাবি করেছেন, 'কুন ফা-ইয়াকুন' অর্থাৎ হও বললেই তা হয়ে যায়, তা সুরা লাহাবে যখন আল্লাহ বল্লেন, 'ধ্বংস হোক আবু লাহাব!' তবে কেন তৎক্ষণাৎ আবু লাহাবের মৃত্যু হল না? প্রায় দশটি বছর এ দুনিয়ার আলো-বাতাস-খাদ্য গ্রহণ করে প্রবল বিক্রমে বেঁচে থেকে নবী মুহাম্মদের বিরোধিতা করে ৬২৪ সালে বদর যুদ্ধের পর মারা গেলেন। লক্ষ্য করুন সুরা লাহাবের প্রথম দুটো লাইন, পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে এখানে তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আবু লাহাবকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য। চার নম্বর লাইনে বলা হচ্ছে, তাকে ঠেলে দেওয়া হবে জ্বলন্ত আগুনে অর্থাৎ এ নিশ্চয়ই দোজখের আগুনের কথা বলা হচ্ছে। ইসলামি বিশ্বাস মতে কেয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে বিচারের পরেই কেউ বেহেস্তে যাবে, কেউবা দোজখে, সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু সুরা লাহাব যদি সত্যি আল্লাহর বক্তব্য হতোই তাহলে বর্তমানকালের জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হলো তা কেন তৎক্ষণাৎ ঘটলো না? আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবরূপ লাভ করতে দশ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়! তবে কী সুরা ইয়াসিনের ৮২নং আয়াতের দাবি 'আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে' সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়! কি বলেন পাঠক? না-কী আমরা বলতে পারি, সুরা লাহাব শুধুমাত্র আমাদের নবীর ক্ষুব্ধ মনের প্রতিক্রিয়া মাত্র! তা মুসলমানরা কেন এই সুরা নামাজে পড়ে থাকেন? কারণ কিছুই না; বেশিরভাগ মুসলিম তো কোরান না বুঝে, কোরানের ইতিহাস সম্পর্কে না জেনে, নিজের ভিতর প্রশ্নের-জিজ্ঞাসার দরজায় শক্ত খিল দিয়ে ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্য নিয়ে কোরান শরিফ পাঠ করে থাকেন। সাধারণভাবে সুরা ফাতিহা বাদে নামাজের জন্য কোরান শরিফের ১০৩ থেকে ১১৪ নং মক্কি সুরাগুলো পাঠ করা হয়ে থাকে। এই সুরাগুলি ছোট তাই অল্প সময়ের ভিতর পাঠ করতে সুবিধে।

মক্কায় থাকাকালীন 'সুরা লাহাব' ছাড়াও প্রফেট মুহাম্মদের জীবনে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য 'ঘটনা' ঘটেছিল; যেমন বলতে পারি শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বোরাকে চড়ে বেহেস্তে গমন, আসার পথে দোজখ পরিভ্রমণ, পালক পুত্র জায়েদ বিন হারিথের স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ, কবিদের সাথে বিরোধ ইত্যাদি। আপাতত আমরা আমাদের প্রফেটের 'মেরাজ' বা 'বেহেস্ত ভ্রমণের' কাহিনী শুনি, বাকিগুলি ধীরে ধীরে শুনা যাবে। (প্রফেট পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহের কাহিনীটি অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছি)। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের সপ্তাহখানেকের মধ্যে বিবি খাদিজা এবং চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর নবীজি কিছুটা পারিবারিকভাবে একা হয়ে পড়েন। তাঁর মাথার ওপরের এতোদিনকার ছায়া সরে যায়, তবে এটাও বলা যায় খাদিজার সাথে সংসারের ফলে জীবনে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য চলে আসায় মনের ভেতরে চেপে রাখা এতোদিনকার গোপন বাসনা মেটানোর যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে যান তিনি; নারীপ্রীতি এবং ঘনঘন বিবাহের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ সামনে চলে আসে। বিষয়টি তাঁর সমসাময়িকদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী বিবি খাদিজা জীবিত থাকতে নবী কখনো 'দ্বিতীয় পত্নী' গ্রহণ চিন্তাই করতে পারেননি; কিন্তু দীর্ঘ দিনের জীবনসাথী খাদিজার মৃত্যুর খুব অল্প সময় পরই নিজের 'Monogamy' প্রথা ভেঙে সওদা বিনতে জামাআ নামের বয়স্ক বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন। এরপর আসেন ছয় বছরের শিশু আবু বকর তনয়া আয়েশা। ছয় বছরের শিশুকন্যার সাথে কি পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির সংসার হয়? যদিও আশেপাশে দাসী-বাদীর তো আর অভাব ছিল না। তারপর একে একে প্রফেটের 'হেরেমে' আসতে থাকেন দ্বিতীয় খলিফা ওমরের মেয়ে হাফসা, জয়নাব বিনতে খোজাইমা, উম্মে সালমা, জয়নাব বিনতে জাহাশ, জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (বানু মুস্তালিক গোত্রের মেয়ে), উম্মে হাবিবা (আবু সুফিয়ানের মেয়ে, আরেক নাম রামালা), সাফিয়া, মায়মুনা (খালিদ বিন ওয়ালিদের খালা বা ফুপু অর্থাৎ আন্টি), ফাতেমা (শোরাইয়ার মেয়ে), হেন্দ (ইয়াজিদের মেয়ে), হাবলা (দক্ষিণ আরবের চিফ আল-আশআথ বিন কায়ইসের বোন), আসমা (শাবার কন্যা), রায়হানা (মদিনার ইহুদি গোত্র বানু কোরাইজার লোক; বদর যুদ্ধের শেষে বানু কোরাইজাকে নিধনের পর তাঁকে 'গনিমতের মাল' হিসেবে নবীজি হেরেমে নিয়ে আসেন), মারিয়া কিবতিয়া বা মেরি দ্য কপ্ট (মিশরের রোমান গভর্নর মুকাও কিস কর্তৃক উপহারপ্রাপ্ত), উম্মে শারিক, খাওলা। তবে অনেকের সাথে প্রফেটের বিয়ে কার্যকর হয়নি, কারণ শর্ত পূরণ হয়নি, কারো সাথে মিলন হয়নি, কাউকে প্রফেট তালাক প্রদান করেন আর কারো সাথে বিয়ে ছিল খুবই অস্থায়ী। ইরানের লেখক আলি দস্তি তাঁর '*Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*' গ্রন্থে বলেছেন প্রফেটের জীবনে ২২ জন রমণী এসেছেন বলে জানা যায়, এদের মধ্যে ১৬ জন বিবাহের মাধ্যমে, ২ জন দাসী এবং ৪ জনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, নবীজির ৪৯ বছর বয়সে বিবি খাদিজা মারা যান (৬১৯ খ্রিস্টাব্দে) আর নবীজি মারা যান ৬২ বছর বয়সে (৬৩২ খ্রিস্টাব্দে); মধ্যের ১৩ বছরে (৪৯ বছর থেকে ৬২ বছর পর্যন্ত) আরো একুশ জন রমণীর পাণি গ্রহণ করা স্বাভাবিক কারণেই ভ্রু কোঁচকানোর মতো ব্যাপার বৈকি!

যাহোক, মুহাম্মদের 'প্রফেট মিশন'-এর ১২তম বর্ষে (সম্ভাব্য) ৬২১ খ্রিস্টাব্দের আরবি 'রজব' মাসের ২৭ তারিখে চাচা আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানির ঘরে অবস্থান করে পরের দিন নবী মুহাম্মদ দাবি করেন গতরাতের 'মেরাজের' কাহিনী![৫৫] : "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রে সফর করিয়েছিলেন মসজিদ-উল-হারাম থেকে মসজিদ-উল-আকসায়, যেখানকার পরিবেশ তাঁরই আর্শীবাদপূত। তিনি তো সব শোনেন, সব দেখেন।" (সুরা ১৭, ইসরা বা বনি-ইজরাইল, আয়াত ১)[৫৬] । প্রথম দিকে তিনি অবশ্য এ কাহিনী একান্ত অনুগতদের কাছেই ব্যক্ত করেন। অনুগতদের মধ্যে আবু বকর ছাড়া কেউই 'গল্প'টি বিশ্বাস করেননি। উম্মে হানি পর্যন্ত ভীষণভাবে বিরক্তবোধ করেন। তিনি নবী মুহাম্মদকে সাবধান করে দেন জনসাধারণের সামনে এই গল্প না বলার জন্য, কারণ এতে তিনি তাঁদের কাছে উপহাসের পাত্র হবেন ও সুনাম নষ্ট হবে। (দ্রষ্টব্য : *পবিত্র কোরআনুল করীম* (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), মূল : তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা ৭৬৪)। উল্লেখ্য, উম্মে হানি কখনো নবীর বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন না।[৫৭] ধীরে ধীরে গল্পটি ঘর থেকে বেড়িয়ে দ্রুত পাবলিক স্কোয়ারে পৌঁছে যায়। মক্কার লোকজন অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে নবীকে অবিশ্বাস্য মেরাজ নিয়ে খুঁটিনাটি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকেন। নবীও তাঁদের নানাভাবে উত্তর দিতে থাকেন। নবীজির ভাষ্যে, তিনি যখন অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় তখন জিব্রাইল আসে বোরাক নামক এক উদ্ভট ঘোড়া নিয়ে। সফেদ সাদা ঘোড়াটির মুখ মেয়ে মানুষের মতো, লেজে ময়ুরপুচ্ছ। ঐ ঘোড়ায় চড়ে নবী জেরুলামের মোরিয়া পর্বতে গিয়ে হাজির হন, সেখান থেকে সোনার মইয়ে ধরে সপ্তাকাশ ডিঙিয়ে পৌঁছে যান বেহেস্তে; আদম, মুসা, আব্রাহাম, যিশুর সাথে এক এক করে দেখা করে শেষে আল্লাহর সাথেও কথা বলে ফিরে আসার পূর্বে এক নজরে দোজখে ঘুরে আসেন। দোজখে তিনি মক্কাবাসী অনেক অমুসলিমদের সাথে দাদা আব্দুল মোত্তালিব, চাচা আবু তালিবসহ তাঁর অন্যান্য পূর্বপুরুষকে শাস্তি পেতে দেখেছেন। কারণ তাঁরা বিধর্মী ও মূর্তিপূজারী ছিলেন। যে দাদা, যে চাচা পিতৃ-মাতৃহীন নবীকে কোলে-পিঠে করে, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে নিজের সন্তান থেকেও বেশি আদর করেছেন, লালন-পালন করেছেন, মানুষ করেছেন, সেই দাদা আর চাচার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও পরিবারের প্রতি বিরূপভাব লক্ষ্য করে নবীর অনেক আত্মীয়-স্বজনই প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। নবীজির ধর্মশিক্ষা দাদা আব্দুল মোত্তালিব, চাচা আবু তালিবকে শেষমেশ ঠাঁই দিল নরকে? এ নিয়ে অনেকেই নবীর কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। ওদিকে দুষ্টু লোকেরা বলে থাকে অন্য কথা; তারা বলে : "নবী মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রী না হওয়া সত্ত্বেও কাজিন এবং পিতৃতুল্য আবু তালিব তনয়া উম্মে হানির ঘরে রাত্রি যাপন করেছেন, এটা কেউ না কেউ জেনে ফেলেছিল বা দেখে ফেলেছিল, প্রফেট মুহাম্মদ ও উম্মে হানি তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই লোকমুখে জানাজানি হয়ে গেলে পরিবারের বদনাম হবে, এমনটা ভেবেই পাবলিকের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই (ইংরেজিতে যাকে বলে 'Camouflage' করা) অবিশ্বাস্য-অলৌকিক 'মেরাজের' কাহিনী পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে! পরবর্তীতে এই কাহিনীকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করানোর উদ্দেশ্যে নিকট আত্মীয়স্বজনসহ অন্যান্য পাবলিকের কৌতূহলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের চাপে প্রফেট মুহাম্মদ 'গল্পের ডাল-পালা-শাখা-প্রশাখা গজিয়ে গজিয়ে' নিজের বেহেস্ত-দোজখের ভ্রমণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর তা মুখরোচক খবর হিসেবে মক্কা ছাড়িয়ে অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।" এতে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করা হয়ে গেল : 'বিবাহ বহির্ভূতভাবে' উম্মে হানির ঘরে রাত কাটানোর বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হল আর মক্কার লোকদের 'মিরাকল' দেখিয়ে দেওয়া হল। যেহেতু মক্কার লোকেরা আগেই বলেছিল, তারা মুহাম্মদের বক্তব্য বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না তিনি বেহেস্তে আরোহণ করতে পারবেন। (দ্রষ্টব্য : সুরা ১৭, বনি ইজরাইল বা ইসরা, আয়াত ৯৩)।

---

[৫৫] Saiyid Safdar Hosain, *The Early History of Islam*, Low Price Publications, Delhi, 2006, page 65.

[৫৬] সুরা বনি-ইসরাইল বা ইসরা'র প্রথম আয়াতটির দুটি ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হলো : "Glory to (Allah) Who did take His servant for a Journey by night from the Sacred Mosque to the farthest Mosque, whose precincts We did bless,- in order that We might show him some of Our Signs: for He is the One Who heareth and seeth (all things)." [17:1, Yusuf Ali]

"Glorified (and Exalted) be He (Allâh) [above all that (evil) they associate with Him] [*Tafsir Qurtubî,* Vol. 10, Page 204] Who took His slave (Muhammad) for a journey by night from *Al-Masjid-al-Harâm* (at Makkah) to the farthest mosque (in Jerusalem), the neighbourhood whereof We have blessed, in order that We might show him (Muhammad) of Our *Ayât* (proofs, evidences, lessons, signs, etc.). Verily, He is the All-Hearer, the All-Seer." [17:1, Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali & Muhammad Muhsin Khan] যদিও কোরানের কোথাও জেরুলামের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং আরো অনেক বিষয়ের মতো মেরাজেরও বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়নি কোরানে; তবে হাদিসসহ ও মুহাম্মদের জীবনীকারকরা এ বিষয়ে বহু সুন্দর সুন্দর গল্পের জাল বুনেছেন। অনেকেই বলে থাকেন, দান্তে তাঁর বিখ্যাত 'Divine Comedy' নাকি এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সাজিয়েছেন! যাহোক, আমরা জানি নবীজীবন শুরু হওয়ার পর মক্কায় থাকাকালীন কাবা ঘরের দিকে নয় বরং মুহাম্মদের নির্দেশে মুসলমানরা জেরুলামের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন এবং এই নির্দেশ প্রায় বার বছর পর্যন্ত বহাল ছিল; পরবর্তীতে হিজরতের পর মদিনাতে ইহুদিদের সাথে বিরোধ চূড়ান্তরূপ নিলে হযরতের ওমরের পরামর্শে নবীজি মসজিদের কিবলা পরিবর্তন করে কাবার দিকে করেন।

[৫৭] ইসলামিক স্কলার David Samuel Margoliouth তাঁর *Mohammed and The Rise of Islam* গ্রন্থে (The Knickerbocker Press, New York, 3rd edition, Page 66) জানিয়েছেন, মক্কার বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী খাদিজার সাথে বিয়ের আগে তরুণ মুহাম্মদ চাচা আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানি'র পাণি প্রার্থনা করেন কিন্তু চাচার অসম্মতির কারণে ব্যর্থ হন। আগ্রহীরা D. S. Margoliouth-এর বইটি আন্তর্জাল থেকে পাঠ করতে পারেন : http://www.muhammadanism.com/Margoliouth/mohammed_rise_islam/mohammed_rise_islam.pdf

নরকের ভয়-ভীতি, স্বর্গের লোভ-লালসা, অভিশাপ-ধিক্কার দিয়ে লেখা সবগুলো সুরাই মুহাম্মদের মক্কায় থাকাকালীন সময়ের। সকলকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানানো সম্ভব হলো না। ভয়ঙ্কর আজাব-শাস্তির কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত মক্কার মানুষেরা জিজ্ঞাসা করলো—সেই দিন কবে আসবে, যেদিন আল্লাহ পাকড়াবেন, কেয়ামত কতো দূর? মুহাম্মদ বললেন—কেয়ামত আসন্ন, কেয়ামত অতি নিকটে!

মক্কার মানুষেরা দিন তারিখ জানতে চায়।

মুহাম্মদ বললেন—আমি কি জানি? আমি তো তোমাদেরই মতো মানুষ।

মানুষ বললো—আমাদের জন্যে গজব নিয়ে এসো।

মুহাম্মদ বললেন—আল্লাহ চতুর্দিকে ঘিরে আছেন। তিনি অতর্কিতে পেছন থেকে আক্রমণ করেন।

মানুষ বললো—তবুও নিয়ে এসো প্রমাণস্বরূপ।

মুহাম্মদ বললেন— তোমরা কি দেখো নাই পূর্বে কতশত জনপদ আল্লাহ ধ্বংস করেছেন?

তারা বলে - আমরা দেখি নাই, আমার বিশ্বাস করি না।

মুহাম্মদ বললেন—আমি যতদিন তোমাদের মাঝে আছি, ততদিন আল্লাহর গজব আসবে না।

কিন্তু আল্লাহর আজাব, গজব, মর্মন্তুদ শাস্তি, কেমন হয়, কেয়ামত কাকে বলে দেখানোর জন্যে ১০ বছর পর মুহাম্মদ সঙ্গী-সাথীসহ ঢাল-তলোয়ার, বর্শা, তীর-ধনুক নিয়ে মদিনায় নিজেই 'কেয়ামত' হয়ে নাজিল হন। মক্কায় থাকাকালীন মুহাম্মদের মনের দীর্ঘমেয়াদী গোপন বাসনা, ইসলাম কায়েমের নীলনক্সা, পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শুধু চাচা আবু-তালিব ছাড়া আর কেউ হয়তো আন্দাজ করতে পারেননি।

৫

অবিশ্বাসীদের প্রশ্নবাণে মুহাম্মদ তিক্ত-বিরক্ত। দিনদিন তারা তাঁর প্রতি কঠোর হচ্ছে। তিনিও যৌক্তিক কোনো উত্তর দিতে পারছেন না। পারছেন না কোন ম্যাজিক বা নিদর্শন দেখাতে। কোরানের বাণী নিয়ে আল্লাহ (?) আসলেন নবীকে সান্ত্বনা দিতে, "তারা বলে, তাঁর প্রভু কেন তাঁর কাছে কোনো নিদর্শন বা প্রমাণ পাঠান না? বলো, গায়েবি (অদৃশ্য বিষয়) শুধু আল্লাহর কাছে আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও অপেক্ষায় রইলাম।" (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ২০)। "ওরা বলল, অলীক স্বপ্ন! না, সে এ বানিয়েছে। না, সে তো এক কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে এক নিদর্শন আনুক যেমন নিদর্শন দিয়ে পূর্বসূরিদের পাঠানো হয়েছে।" (সুরা ২১, আম্বিয়া, আয়াত ৫)।

মুহাম্মদ মক্কি জীবনের প্রত্যেকটি সুরায় বারবারই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, কিভাবে জবরদস্ত পরাক্রমশালী আল্লাহ তার শক্তির নিদর্শনস্বরূপ বহু জনপদ ধ্বংস করেছেন, আর তার নবীগণ লাঠিকে সাপ বানিয়ে, জলকে দ্বি-খণ্ডিত করে, মৃতকে জীবিত করে, আগুনের ভেতর ঢোকে, মাছের ভেতরে বাস করে, কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে, বাতাসে উড়াল দেয়ার ক্ষমতা দেখিয়ে, কি অত্যাশ্চর্য নিদর্শন রেখে গেছেন! পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে হিসেব করলে দেখা যায়, বর্তমানে প্রচলিত কোরান শরিফের প্রথম ৮৯টি সুরার মধ্যে ২৭বার হযরত মুসার সাথে সম্রাট ফেরাউনের সংঘর্ষের কাহিনীসহ আরো কিছু কাহিনী বারেবারে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ প্রতি ৩.৩ সুরার মধ্যে একই কাহিনী পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে! [৫৮] আর এই কাহিনীগুলোর সবগুলিই হুবুহু একইরূপে অথবা কিছুটা ভিন্নরূপে ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওল্ডটেস্টামেন্ট, নিউটেস্টামেন্ট ধর্মগ্রন্থে পূর্বেই প্রচলিত ছিল[৫৯]; বলে রাখা ভালো, হিব্রু ভাষায় রচিত

[৫৮] Don Richardson, *Secrets of the Koran*, Regal Books, U.S.A. 2003, page 33.

[৫৯] কোরান শরিফের সাথে তৌরাত শরিফ বা ইঞ্জিল শরিফের কাহিনীর মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো এমন নয় যে আমাদের নবীজিই প্রথম জেনেছেন, কোরান শরিফে প্রথম বিধৃত হয়েছে বরং এগুলো আগে থেকেই আরবের বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের (Docetists সম্প্রদায়, এন্টিয়কের বিশপ Paul of Samosata দ্বারা পরিচালিত মনকিস্ট সম্প্রদায়, মরিয়ামাইট্স সম্প্রদায়, Collyridians সম্প্রদায়) মধ্যে (সিরিয়ান, কপটিক, গ্রিস, আরাবিক ও আর্মেনিয়ান ভাষায়) বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল, তাদের সাথে আমাদের নবীজি ও অনেক সাহাবিদের পরিচয় ছিল এবং বলতে পারি (খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মমতকে পাশ কাটিয়ে) এগুলোকে তিনি (মুহাম্মদ) 'সত্য' বলে মনে করে নিজের ধর্মমতের সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছেন। যেমন যিশুর মাতা মেরীর জন্ম সম্পর্কে যে কাহিনী বিস্তৃত পরিসরে কোরান শরিফে বর্ণিত হয়েছে (সুরা ৩, আল-ই-ইমরান, আয়াত ৩৫), তার উৎস হচ্ছে 'History of Nativity of Mary', 'Protevangelium of James the Less', 'Coptic History of the

ওল্ড টেস্টামেন্টের চরিত্রগুলির আরবিয় নামগুলি সরাসরি হিব্রু ভাষার পরিবর্তে কোরান শরিফে প্রধানত সিরিয় (অর্থাৎ নূহ, নোয়া) ও গ্রিক (অর্থাৎ ইলিয়াস, এলিয়াস; ইউনুস, জোনাহ) ভাষা ব্যবহৃত এসেছে। ওল্ডটেস্টামেন্টের চরিত্রগুলোর মধ্যে আদম, নুহ, আব্রাহাম বা ইব্রাহিম (২৫টি বিভিন্ন সুরাতে প্রায় ৭০ বার উল্লেখিত উল্লেখিত হয়েছে, সুরা ১৪-তে ইব্রাহিমের নামটি শিরোনাম ধরা হয়েছে), ইসমায়েল, লট বা লুত, যোসেফ বা ইউসুফ (সুরা ১২-তে এই নামটি শিরোনাম করা হয়েছে), মোজেস বা মুসা (৩৪টি বিভিন্ন সুরাতে এই নাম এসেছে), সল বা তালুত, ডেভিড বা দাউদ, সলোমন বা সুলেমান, এলিজা বা আলিয়াসা, জোনাহ বা ইউনুস, জব বা আইয়ুবের নাম দশটি সুরাতে বহন করছে। আদমের সৃষ্টি ও পতনের কাহিনী পাঁচবার, মহাপ্লাবনের কথা আটবার ও সমকামের কথা আটবার বলা হয়েছে। সেমেটিক সাহিত্যের অধ্যাপক ফিলিপ কে. হিট্টি'র মতে : "বস্তুত বাইবেলের অন্য যেকোন অংশের চেয়ে 'পুরাতন নিয়ম' নামক গ্রন্থটির প্রথম পাঁচটি পুস্তকের সঙ্গে কোরানের সাদৃশ্য বেশি।" (দ্রষ্টব্য : *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯)। আর জনাব আলি দস্তি তো অত্যন্ত পরিষ্কার করেই কোরান শরিফ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> "... it contains nothing new in the sense of ideas not already expressed by others. All the moral precepts of the Qur'an are self-evident and generally acknowledged. The stories in it are taken in identical or slightly modified forms from the lore of the Jews and Christians, whose rabbis and monks Mohammad had met and consulted on his journeys to Syria, and from memories conserved by descendants of the peoples of Ad and Thamud. ... In the field of moral teachings, however, the Qur'an cannot be considered miraculous. Mohammad reiterated principles which mankind had already conceived in earlier centuries and many places. Confucius, Buddha, Zoroaster, Socrates, Moses, and Jesus had said similar things." (দ্রষ্টব্য : *Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*, Page 56)।

এরপরও অনেক মুসলমানই দেখি দাবি করেন, মৌলিক সাহিত্যকর্ম হিসেবে 'কোরান' নাকি অসামান্য![৬০] যাহোক, মুহাম্মদ কিন্তু নিজে বাস্তবে কোনো নিদর্শন দেখাতে পারছেন না। হতাশ হওয়ারই কথা। এখন উপায়? জিবরাইল মারফত নবীর কাছে বাণী এলো : "ওদের আগে অবিশ্বাসী বহু জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, এরা কি তবে বিশ্বাস করবে?" (সুরা ২১, আম্বিয়া, আয়াত ৬)। যেহেতু এরা বিশ্বাস করবে না সুতরাং কোনো নিদর্শন দেখিয়ে লাভ নেই—এমন কথায় যে চিড়া ভিজবে না, মক্কাবাসীরা এমন সুবোধ বালক নয়, মুহাম্মদ তা টের পেয়ে গেছেন। আমাদের আল্লাহর নবী মুহাম্মদ শুধু কালক্ষেপণ করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। মক্কা থাকাবস্থায় ছলাকলা কৌশল ব্যতীত বল প্রয়োগের ক্ষমতা-সামর্থ নেই। মাত্র ১৫/১৬ জন লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছে, তাও দু-একজন বাদে সকলই সমাজের বঞ্চিত, দারিদ্রক্লিষ্ট নিম্নবিত্তের লোক। এদিকে কোরায়েশ নেতাগণ লক্ষ্য করলেন, মুহাম্মদ তাঁর মিষ্টভাষায় আস্তে আস্তে কল্পকাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে লোকদের মগজ ধোলাই করে নিচ্ছেন। আবু তালিবের ছেলে হজরত আলি এর প্রথম 'ভিক্টিম'; এরপর ধনাঢ্য বণিক আবু বকর, চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালেব, লৌহমানব ও বদমেজাজী বলে মক্কায় পরিচিত ওমর বিন আল-খাত্তাব (ওমরের চাচা 'হানিফ' জায়েদ ইবনে আমর বিন নওফল, নবীজির 'মিশনের'

Virgin', 'The Infancy of the Saviour' ; যিশু যে কাদা মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করে প্রাণ দিলেন (৩:৪৯) তার উৎস হচ্ছে 'Gospel of Thomas the Israelite'; যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি, হয়েছে তাঁর মতো আরেকজনকে (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ১৫৭), এই কাহিনীর উৎস হচ্ছে 'Journey of the Apostles'। (দ্রষ্টব্য : *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯)।

[৬০] কোরানে সম্পর্কে প্রফেটের সময়কাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অনেক মুসলমানের বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহ হতে প্রত্যাদেশকৃত 'কোরানের' সাথে তুলনীয় সাহিত্য রচনা করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক অন্ধবিশ্বাসী মুসলমান এ নিয়ে চ্যালেঞ্জও করেছিলেন নানা সময়ে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়েছিল। ইসলামের যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার অনুসারী বলে খ্যাত মোতাজিলারা গোঁড়াবাদীদের এমন বক্তব্য (কোরানের অলৌকিকত্ব) খণ্ডন করেছিলেন জোরালোভাবে। তারা দেখিয়েছিলেন, ইসলামপূর্ব আরবের অনেক কবির রচনার স্টাইল, নৈতিক শিক্ষা কোরানের চেয়ে অনেক উন্নত। এই প্রবন্ধের শুরুর দিকে আমরা উল্লেখ করেছি, 'প্রতিক্রিয়া' কেমন হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী (পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী) কবি ও অনুবাদক ইবন আল মুকাফা (মৃত ৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) কোরানের মতো গদ্য কবিতা লিখতে গেলে মৌলবাদীরা একটা একটা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে আগুনে পুড়িয়ে তাঁকে হত্যা করে। পারস্যের কবি বাশার ইবনে বারদ (মৃত ৭৮৪) বলেছিলেন, তার যে কোনো কবিতা যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষিত ক্বারীদ্বারা আবেগভরে পাঠ করানো হয়, তাহলে তা কোরানের সমতুল্য হবে। যখন তিনি একজন গায়িকাকে তার একটি কবিতা আবৃত্তি করতে শোনেন, তিনি উল্লাস প্রকাশ করে বলেন যে এটা কোরানের সুরা হাশরের চেয়ে ভালো। তাঁকেও 'বাতিহা' জলাভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়। Maxime Rodinson তাঁর '*Mohammed*' গ্রন্থে (trans. Anne Carter, Harmondsworth: Penguin, Page 92) জানিয়েছেন, প্রফেট মুহাম্মদ মক্কায় থাকাকালীন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন কোরান 'মুহাম্মদসৃষ্ট' নিয়ে সন্দেহ হলে দশটি সুরা আনো (সুরা ১১, হুদ, আয়াত ১৩) অথবা একটি সুরা আনো (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ৩৮)। মুহাম্মদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আরবের কয়েকজন খ্যাতনামা কবি সুরা রচনায় হাত দেন, যাদের রচনার স্টাইল, বিষয়বস্তু উভয়ই কোরানের সুরার সমতুল্য। কিন্তু একজন কবিকে যখন বলা হল, তোমার কবিতায় সেই উৎফুল্লব্যঞ্জকের দ্যোতনা নেই যেমন আছে কোরান আবৃত্তিতে, তখন সেই কবি জবাব দিলেন, 'আমার কবিতাও কোরানের সুরার মতো একশো বছর ধরে মসজিদে আবৃত্তি করা হোক, তারপর দেখো।' (দ্রষ্টব্য : *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫)।

শুরু হওয়ার আগের ধর্মগুরুদের একজন)। চিন্তিত কোরায়েশ নেতাগণ আবু তালিবের শরণাপন্ন হলেন। তারা সমঝোতা করবেন নবী মুহাম্মদের সাথে, এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাবও পাঠালেন। প্রস্তাবটি হলো : মুহাম্মদ এবং নবদীক্ষিত মুসলমানেরা যদি এক বছর তাঁদের তিন প্রধান দেবীসহ (আল্লাত, মানাত, উজ্জা) অন্যান্য দেব-দেবীগণকে স্বীকার করে উপাসনা করেন, তবে তাঁরাও পরের বছর মুহাম্মদের আল্লাহকে মেনে নিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাঁর উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবে। কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মদ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পাঠ করলেন সুরা কাফেরুন : "Say O Muhammad, O Al-Kafirun, I worship not that which you worship, Nor will you worship that which I worship. And I shall not worship that which you are worshipping. Nor will you worship that which I worship. To you be your religion, and to me my religion." (সুরা ১০৯, কাফিরুন, আয়াত ১-৬)। মুহাম্মদের এ বক্তব্যে হতাশ হলেন কোরায়েশ নেতাগণ। আবার গেলেন আবু তালিবের কাছে। আবু তালিব নিজে মুহাম্মদের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন না; কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীন ভাতিজার প্রতি অপরিসীম মায়াও ত্যাগ করতে পারেন না। তাই ভাতিজাকে কাছে ডেকে এনে বললেন : "তুমি কি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেবে না?" মুহাম্মদ বললেন : "প্রিয় চাচা, পারসিয়ানদেরকে পদানত করে আমি আরববিশ্বে কোরায়েশ বংশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, আপনি একটিবার বলুন, আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।" রাজনীতি কাকে বলে, কোরায়েশ বংশের এই প্রবীণ নেতা আবু তালিব ভালই বুঝেন; জবাব দিলেন : "তোমার যা ইচ্ছে খুশি তা-ই করো, তবে আমি জীবিত থাকতে কাউকে তোমার অনিষ্ট করতে দেবো না।" মুহাম্মদ আশ্বস্ত হলেন বটে কিন্তু আশঙ্কামুক্ত হতে পারলেন না। নানা চাপে মুহাম্মদও সাময়িক সমঝোতার পথ খোঁজছিলেন। সমঝোতার কৌশলও বের করে ফেললেন দ্রুত। নিজেকে 'নবী' ঘোষণার পাঁচ বছর পর ৬১৫/৬১৬ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসের একদিন মক্কার বিশিষ্ট নাগরিকরা কাবা ঘরের পাশে জড় হয়ে শহরের ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় সেখানে হাজির হন মুহাম্মদ। তিনি তাঁদের পাশে বসে বিভিন্ন আলোচনার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো আবৃত্তি করলেন কোরান শরিফের বিখ্যাত ৫৩ নম্বর সুরা 'নজ্‌ম'। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের বর্ণনানুযায়ী প্রফেট মুহাম্মদের মক্কায় সর্বপ্রথম যে সুরা প্রকাশ্যে জনগণের সামনে পাঠ করেন তা 'সুরা নজম')। সুরাটির প্রথম দিকে বর্ণনা করলেন উর্ধ্ব দিগন্ত থেকে আসা জিব্রাইলের সাথে নবীজির সাক্ষাৎ এবং জিব্রাইল মারফত পাঠানো আল্লাহর বার্তা গ্রহণ ইত্যাদি[৬১], এরপর যখন তিনি মধ্যখানের ১৯-২০ চরণে (আয়াত) এসে যে দুটো বাক্য উচ্চারণ করলেন তা নিয়ে তুমুল হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। আয়াত দুটো ছিল : "আফারাআইতুসুল লাতা ওয়াল উজ্জা"; অর্থ হলো "তোমরা কি ভেবে দেখেছো লাত ও উজ্জা সম্বন্ধে?" (আয়াত ১৯)। পরের আয়াতটি হচ্ছে : "ওয়া মানাতাছ্ ছালাছাতুল উখরা, তিল্‌কাল গারানিকা তালাউলা ওয়া আন্না শাফাতুহুন্না লাতারজা।" (আয়াত ২০)। ২০ নং আয়াতের প্রথমাংশের অর্থ হলো : "আর তৃতীয় দেবী 'মানাত' এর কথা?"; দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো : "তারা অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন দেবীগণ, নিশ্চয়ই আমরা তাদের মধস্থতা আশা করি।" সুরা নজ্‌ম-এর ১৯-২০ আয়াতের ইংরেজিতে হচ্ছে, "Have you thought of al-Lat and al-Uzza and Manat, the third... these are the exalted Gharaniq (a high flying bird) whose intercession is approved." ২০ নম্বর আয়াতের দ্বিতীয় অংশটুকু বর্তমান কোরানে নেই; সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কোরানে সুরা নজ্‌মের ১৯-২২নং আয়াতে পাই, "What think ye then of al-Lat, and al-'Uzza, and Manat the third idol besides? Shall ye have male progeny and God female? This, then, were an unjust partition!" (আয়াত ১৯-২২)। ২১-২২নং আয়াতের বাংলা দাঁড়ায় "তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।" আয়াত পরিবর্তনের ফলে ব্যাখ্যাতে যে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, এই তিন দেবী যদি নারী না হয়ে পুরুষ হতেন (মানে দেবতা হতেন) তবে আল্লাহর কোনো আপত্তি থাকতো না বা আপত্তির পরিমাণ কম হতো; মেয়ে সন্তান হওয়াতেই যতো আপত্তি! যাহোক, অনেকেই হয়তো জানেন ইসলামপূর্ব আরবে অত্যন্ত সম্মানিত দেবী ছিলেন 'লাত' (আল্লাত), 'মানাত', 'উজ্জা'; যারা 'আল্লাহর কন্যা' (বানাতাল্লাহ) হিসেবেই আরববাসীর কাছে অধিক পরিচিত। আরবিভাষী নাবাতিয়েনরা (এক সময় যাদের রাজ্য দামেস্ক থেকে হিজাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরবর্তীতে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে চলে যায়) আল্লাতকে যুদ্ধের দেবী হিসেবে পূজা করতো; গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরাডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪-৪২৫) আল্লাতকে আরবের বিশেষ করে নাবাতিয়েনদের মহান দেবী হিসেবে চিহ্নিত

[৬১] সুরা নজমের প্রথম দিককার আয়াতের (১ থেকে ১৮ পর্যন্ত) ব্যাপারে ইসলামি পণ্ডিতদের মধ্যে দু'প্রকার মত বা তফসির প্রচলিত আছে। (এক) আনাস ও ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তফসিরের সারমর্ম এই, এসব আয়াতে মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ ও নৈকট্যলাভের কথা আলোচিত হয়েছে। (দুই) অন্যান্য অনেক সাহাবি, তাবেয়ি, তফসিরবিদ (আল-ওয়াকিদী, তাবারি, ইবনে কাসির, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাযী প্রমুখ), মুহাম্মদের জীবনীকারক, আধুনিককালের কোরানের অনুবাদকদের মত হচ্ছে, এখানে (১৭ নম্বর সুরা ইসরা'র মতো) 'মেরাজ' মানে প্রফেট মুহাম্মদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রহস্যময় স্বর্গভ্রমণের কথা বলা হচ্ছে না। মেরাজের ঘটনা আরো কয়েক বছর পরে কোরানে এসেছে। এই আয়াতগুলিতে বরং 'ওহি বাহক' জিব্রাইলের আকাশ হতে ভূমিতে অবতরণ, প্রফেটের সাথে সাক্ষাত এবং প্রফেটের 'অন্তর্দৃষ্টি' প্রসারিত করে দেবার কথা বলা হচ্ছে। (দ্রষ্টব্য : *পবিত্র কোরআনুল করীম* (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), মূল : তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা ১৩০৩-১৩০৫)। পশ্চিমা ইসলাম-বিশেষজ্ঞ Sir William Muir ওয়াকিদী, তাবারির মত সমর্থন করে বলেন : "The chapter opens with a description of the first visit of Gabriel to Mahomet, and of a later vision of that angel, in which certain heavenly mysteries were revealed." (দ্রষ্টব্য : *The Life of Mahomet*, Vol 2, Page 150)।

করেছিলেন। আর উজ্জা ছিলেন আরবের প্রেমের দেবী, পশু ও মানুষ বলি দেওয়া তাঁর আরাধনার অঙ্গবিশেষ; আল-কালবি'র লেখা থেকে জানা যায় যুবা বয়সে স্বয়ং মুহাম্মদও এই দেবীকে উদ্দেশ্যে করে বলি দিয়েছিলেন।[৬২] মানাত ছিলেন ভাগ্যের দেবী; পাশপাশি আরবদের কাছে আল্লাত চন্দ্রের, মানাত শুক্র গ্রহের এবং উজ্জা ছিলেন লব্ধক (সাইরিয়াস) নক্ষত্র প্রতিনিধিত্বকারী। কাবাঘরে 'তাওয়াফ' করতে প্যাগান কোরায়েশরা এই দেবীদের নাম উচ্চারণ করতেন; এখন যেমন মুসলমানরা হজের সময় কাবাঘরে 'তাওয়াফ' করতে গিয়ে 'লাব্বায়েক, আল্লাহুমা লাব্বায়েক...' বলেন। মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্বে তায়েফে আল্লাত দেবীর বিশেষভাবে পূজা হতো; মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল পূর্ব দিকে নাখলাতে উজ্জা দেবীর এবং মক্কা থেকে অনতিদূরে মদিনার (পূর্ব নাম 'ইয়াসরিব') পথে কোদাইদ নামক এলাকায় মানাত দেবী পূজিত হতেন। যাহোক, উপস্থিত কোরায়েশগণ টেনশনমুক্ত হলেন, কেউ কেউ আনন্দিত হলেন, উল্লসিত হলেন, ভাবলেন ঠিক আছে, মুহাম্মদ অন্তত পিতৃপুরুষের ধর্মীয় রীতি মেনে নিয়ে দেব-দেবীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মুহাম্মদ সুরা নজ্‌মের শেষ বাক্যটা বললেন এভাবে : "অতএব তোমরা আল্লাহকে সেজদা কর এবং তারই উপাসনা কর।" মুহাম্মদের বক্তব্য শেষে অনেকেই ভূমিতে আনত হয়ে সেজদা দিল।[৬৩] উল্লেখ্য, তখনকার আরববাসীরা মোটামুটি সর্বধর্মসমন্বয়তায় বিশ্বাস করতো বিধায় মক্কার কাবাঘর ছিল বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পবিত্র উপাসনালয়। তাই মুহাম্মদ যখন প্রথমাবস্থায় তার নতুন ধর্মের কথা বলতেন কেউ তেমন একটা প্রতিবাদ করেনি; যতদিন পর্যন্ত না নবী মুহাম্মদ তাদের মূর্তিপূজার ওপর বিরোধিতা-আঘাত করেছেন। মুহাম্মদ দেখলেন মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় পিতৃপুরুষের ফিরে গেছেন, এ রকম একটি খবর দ্রুত মক্কা ছেড়ে পাশের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে পৌঁছালো। পৌঁছালো পাশের খ্রিস্টান অধ্যুসিত রাজ্য আবিসিনিয়াতেও; যেখানে কতিপয় নব্য-মুসলমান মক্কা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। খবরটি নব্য-মুসলমানদের কানে পৌঁছুতেই এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসে এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে যায়। দূরদর্শিতার ফলে নবীজি বুঝতে পারলেন, এই আপোষরফার ফলে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা মাঠে মারা যেতে পারে। তাঁকে আবারো কৌশল অবলম্বন করতে হলো, নিয়ে আসতে হলো কোরানের বাণী। যেহেতু উপস্থিত জনতা এক বাক্যে সবাই সাক্ষী দিচ্ছেন, তারা ঐ আয়াতটি শুনেছেন, মুহাম্মদ স্বীকার করলেন যে ঐ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল সত্য, তবে তা তাঁর নিজের বা তাঁর আল্লাহর মুখের বাণী ছিল না। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন যে, শয়তান তাঁর (মুহাম্মদের) কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঐ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিল। মানুষ তাজ্জব হয়ে গেল, শয়তান মুহাম্মদকেও ভুলাতে পারে, তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাতে পারে? এবার আল্লাহ (আসলে মুহাম্মদ বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে) কোরানের দোহাই দিলেন : "এবং শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তুমি তর্ককারীদের সাথে বসে থেকো না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গ বদলায়। ...আমি কিছু আয়াত তোমাকে ভুলিয়ে এর পরিবর্তে ভাল বা এর অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি।" (সুরা ৬, আনআম, আয়াত ৬৮ এবং সুরা ২, বাকারা, আয়াত ১০৬)। অনেক পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে, হযরত মুহাম্মদকে আল্লাহ প্রেরিত আয়াত 'শয়তান' ভুলিয়ে দিয়ে অন্য আয়াত নিয়ে আসে—এরূপ কাহিনীকে রূপকার্থে ব্যবহার করে ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে (২৬ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হয়েছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিট্রিশ নাগরিক সলমান রুশদির সেই বিখ্যাত, অধিকাংশ মুসলমানদের কাছে বিতর্কিত উপন্যাস 'স্যাটানিক ভার্সেস' (শয়তানি আয়াতসমূহ)। বইটি প্রকাশ হওয়ার পরের বছর 'ইসলামকে কটাক্ষ করা ও মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেওয়ার' অভিযোগ তুলে সলমান রুশদি এবং তাঁর বইটির প্রকাশকের বিরুদ্ধে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি (১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯) নিজের মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে ইরানি রেডিওতে ফতোয়া দিলেন[৬৪] :

> "I inform the proud Muslim people of the world that the author of the Satanic Verses book, which is against Islam, the Prophet and the Qur'an, and all those involved in its publication who are aware of its content are sentenced to death."

[৬২] হাদিসেও আমাদের নবীজির পৌত্তলিক উপাসনার নানা প্রমাণ রয়েছে। আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, রসুল মুহাম্মদ বলেছেন, তিনি প্যাগান দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে কোরবানি করা পশুর মাংস বালদাহ্ নামক স্থানে 'হানিফ' জায়েদ বিন আমর বিন নওফল (নবীজির 'ইসলাম' নামক একেশ্বরবাদের ধর্মীয়শিক্ষক)-এর জন্য নিয়ে যেতেন। কিন্তু জায়েদ বিন আমর সে খাদ্য খেতে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন একমাত্র 'আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত পশুর মাংস বাদে তোমার অন্য কোনো প্যাগান ঈশ্বরের নামে উৎসর্গকৃত পশুর মাংস আমি খাই না।' (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬৭, নম্বর ৪০৭)। আবার এটাও জানি রসুল প্যাগানদের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করলেও প্যাগানদের রীতি অনুসরণ করে মক্কাতে হজের সময় তিনি নিজে কালো পাথরে চুমু খেতেন (বোখারি শরিফ, ভলিউম ২, বুক ২৬, নম্বর ৬৭৩, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৯, ৬৮০), তাই আজকের যুগের 'মুহাম্মদ-অনুসারী' একেশ্বরবাদী মুসলমানেরা অন্যান্য পৌত্তলিক রীতির সমালোচনা করলেও পাথরকে চুমু খাওয়ার ব্যাপারটি চোখ বুঝেই মেনে চলেন। (আগ্রহীরা দেখুন : http://www.answering-islam.org/Shamoun/idolatry.htm)।

[৬৩] Sir William Muir, *The Life of Mahomet*, Vol 2, Smith, Elder, & Co., London, 1861, Page 151; The internet version can be read at: http://www.answering-islam.org/Books/Muir/index.htm

[৬৪] আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/14/newsid_2541000/2541149.stm

ঐ বছরের মার্চ মাসে ওআইসি'র (Organization of Islamic Conference) ইসলামিক সম্মেলনে ৪৫টির মধ্যে ৪৪টি রাষ্ট্র একমত হয়ে ঘোষণা করে খোমেনির এই ফতোয়া বে-ইসলামি; তবে তারা রুশদির ঐ উপন্যাসটিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৬৫] ওআইসি ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার ফলে একমাত্র তুরস্ক ব্যতীত বিশ্বের সবগুলো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রেই 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নিষিদ্ধ হয় অনেকগুলো অমুসলিম রাষ্ট্রতে যেমন ভারত (ভারত অবশ্য খোমেনির ফতোয়ার আগেই ১৯৮৮ সালের ৫ অক্টোবর, এবং ঐ বছরের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিশর, সৌদিআরব, মালয়েশিয়া, কাতার, সুদান প্রভৃতি দেশে বইটি নিষিদ্ধ করে), থাইল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, শ্রীলঙ্কা, লাবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, কেনিয়াসহ আরো অনেক দেশে। ওআইসি আয়াতুল্লাহ খোমেনির 'ফতোয়া'কে যতোই বে-ইসলামি বলুক না কেন, এই 'বে-ইসলামি' ঘোষণা কায়েম করতে উগ্রপন্থীরা এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার অনেক দেশ যেমন জাপান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইরান, সৌদি আরব, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ইটালি, নরওয়ে, মিশর, মরোক্ক প্রভৃতি দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ–ভাঙচুর করে, আগুনে পুড়িয়ে দেয় রুশদির বই, বই বিক্রির অপরাধে বোমা মেরে গুড়িয়ে দেয় লাইব্রেরি। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ইসলামি মৌলবাদীরা রুশদির বইয়ের জাপানি অনুবাদক হিতোশি ইগারশিকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে, ইটালিয় অনুবাদক ইত্তোরে ক্যাপরিয়লিকে হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরিকাঘাত করে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৯৩ সালে জুলাই মাসে তুর্কি লেখক এবং অনুবাদক আজিজ নেসিনের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়; কারণ তাঁর অপরাধ তিনি তুরস্কের এক পত্রিকার কলামে রুশদির বই থেকে কিছু উদ্বৃতি দিয়েছিলেন; একই বছরের অক্টোবর মাসে নরওয়েজিয়ান প্রকাশক উইলিয়াম নিগার্ডকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐ বছরই ইরানের খোরদাদ ফাউন্ডেশন রুশদির মস্তকের জন্য তিন লক্ষ মার্কিন ডলার পুরুষ্কার ঘোষণা করে। পরের বছর তা বাড়িয়ে ছয় লক্ষ মার্কিন ডলার করা হয়! ১৯৯৯ সালে আরেকটি ইরানি ফাউন্ডেশন রুশদিকে হত্যার জন্য ২.৮ মিলিয়ন ডলার পুরুষ্কার ঘোষণা করে এবং খোরদাদ ফাউন্ডেশন পুনরায় (২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) রুশদিকে হত্যার জন্য ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরুষ্কার ঘোষণা করে এবং এ ঘোষণা এখনো বলবৎ আছে। বর্তমানকালের ইসলামি পণ্ডিত, ধর্মতত্ত্ববিদ, আলেম, ওলামা কেউই স্বীকার করতে চান না, নবী মুহাম্মদের উপর শয়তানও ভর করতে পারে। তাঁদের মতে এটা অমুসলিমদের শয়তানি, নবীর মহত্ত্বের উপর অহেতুক কলঙ্ক আরোপের অপচেষ্টা। নবীজি ভুল করেছেন অথবা কোরায়েশদের সাথে সমঝোতার স্বার্থে নিজেই বানিয়েছিলেন এ আয়াত, পরে সমঝোতা ভেস্তে যাওয়াতে সরে এসেছেন এখান থেকে, এটা মনে করলে তাকে ধর্ম-বিরোধী (Heretical) বলা যেতে পারে; তাই বেশিরভাগই ইসলামি বুজুর্গরা এ ব্যাপারে চুপ থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। কিন্তু আধুনিককালের কোনো কোনো নবীচরিত রচনাকারীরা শুধু চুপ থাকাই নয়, সরাসরি অস্বীকার করছেন এ ঘটনার এবং তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন; যেমন আমাদের মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর বিখ্যাত নবী জীবনী '*মোস্তফা চরিত*'-এ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় 'নবীর ওপর কলঙ্ক আরোপের' অপকর্মের প্রতিবাদ জানিয়েছেন! তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, নবী মুহাম্মদের মুখে কথা বসানো শয়তানের পক্ষে অসম্ভব। তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন আরেক ইসলামি পণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলির বক্তব্যের। কারণ আমীর আলি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ '*The Spirit of Islam*'-এ কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করে স্বীকার করেছেন শয়তানি প্রণোদনার কথা![৬৬] আগেই বলে রাখি, উপন্যাস কিন্তু ইতিহাস নয় এবং ইতিহাসের বিকৃতিও নয়; উপন্যাস উপন্যাসই; তবে যে মূল ইস্যুটিকে (শয়তানি আয়াত) কেন্দ্র করে মুসলিম মৌলবাদীদের এতো লঙ্কাকাণ্ড, তা কিন্তু এমন নয় যে সলমান রুশদি নিজে এমন কাহিনী তৈরি করেছেন, ইসলামের ইতিহাসে যার অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র নেই। কোরান শরিফে তো স্পষ্টই রয়েছে : "আমি তোমার পূর্বে যেসব নবী এবং রসুল পাঠিয়েছিলাম তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করত তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলত। কিন্তু শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে আল্লাহ তা দূর করে দেন। তারপর আল্লাহ আয়াতগুলোকে সুসংবদ্ধ করেন।" (সুরা ২২, হজ, আয়াত ৫২)। শয়তান যে নবী-রসুলের উপর অনেক আগে থেকেই ভর করে আসছে, এবং ভর করতে পারে সেটা স্বয়ং আল্লাহই স্বীকার করে নিচ্ছেন! এবং এই কোরান শরিফেও তো রয়েছে, বেহেস্তের মধ্যেই হযরত আদম-হাওয়াকে শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। (সুরা ৭, আ'রাফ, আয়াত ১৮৯-১৯২)। তাহলে কেন ইসলামি বুজুর্গদের এতো ঢাক ঢাক গুড় গুড়! 'শয়তানি আয়াতে'র কথা প্রথম জানা যায়, নবী হযরত মুহাম্মদের প্রথম জীবনীকার ইবন ইসহাকের (মৃত ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ) বহুল প্রচারিত গ্রন্থ 'সিরাত রসুলাল্লাহ'।[৬৭] উপরোক্ত গ্রন্থে নবী মুহাম্মদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখেই তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। পুনরুক্তি হবে, বিধায় এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো না। ইবন ইসহাকের লেখাতে আমরা পাই, "মুহাম্মদ যখন কোরায়েশদের দেব-দেবী নিয়ে বললেন, তখন কোরায়েশরা অত্যন্ত উল্লসিত হলো; ...তারা বলতে লাগলো মুহাম্মদ অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের দেব-দেবী নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন।" ইবন ইসহাক আরো বলেন, "জিব্রাইল এসে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলো, এ কি করলেন মুহাম্মদ? আমি যা আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম, তা আপনি জনসাধারণের সামনে পাঠ করেননি। যা নিয়ে আসিনি, তাই আপনি পাঠ করেছেন। এরপর মুহাম্মদ কোরায়েশদের দেব-দেবী সম্পর্কে আগের দেওয়া বক্তব্য তুলে নিলেন।" (পৃষ্ঠা ১৬৬)। ইবন ইসহাকের পর মুহাম্মদের জীবনীকারক আল-ওয়াকিদী (মৃত ৮২৩), ইবন হিশাম

[৬৫] এ জি নূরানী, *ইসলাম ও জেহাদ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৪৩। এবং Wikipedia.com

[৬৬] Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Low Price Publications, Delhi, India, 2002, page 34-35.

[৬৭] Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 'The Life of Muhammad', (translated in English by A. Guillaume), Oxford University Press, London, 1955, 2004, Page 165-166.

(মৃত ৮৩৪), ইবন সাদ (মৃত ৮৪৫) কোরানের তফসিরকারক মুহাম্মদ ইবন-জরির আল-তাবারি (মৃত ৯২৩), আল-জামাখশারি (মৃত ১১৪৩), আল-বাদাবি (মৃত ১২৮৬/১২৯১)-সহ আরো অনেকেই এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত উল্লেখ করেছেন। ইবন সাদের (আল-ওয়াকিদীর সেক্রেটারি হিসেবে পরিচিত) লেখাতে দেখি একই বক্তব্য[৬৮] :

> "Then the apostle of Allah, approached them (Quraysh) and got close to them, and they also came near to him. One day he was sitting in their assembly near the Ka'bah, and he recited: "By the Star when it sets", (53:1) till he reached, "Have ye thought upon Al-Uzza and Manat, the third, the other". (53:19-20) Satan made him repeat these two phrases: "These idols are high and their intercession is expected". The apostle of Allah repeated them, and he went on reciting the whole surah and then fell in prostration, and the people also fell in prostration with him..." (তুলনীয় : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ২, বুক ১৯, নম্বর ১৭৭)।

বুঝা যায়, শয়তানি আয়াতের ঘটনা ইসলামের ইতিহাস, কোরানের ইতিহাস, নবী মুহাম্মদের জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এটা এমন নয় যে, ইসলাম-বিরোধীদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। তাহলে, চক্রান্তকারীদের দলে মুহাম্মদের জীবনীকারক, কোরানের তফসিরকারক অনেকেই পড়ে যান। আর কোরানেও তো এই ঘটনার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। এবার কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যাক : (১) আমরা আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সাধারণ বোধ-বুদ্ধিতেই বোঝতে পারি, জিন-ভূত-দৈত্য-দানো-শয়তান-আল্লাহ-ঈশ্বর এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই; মানসিক বিভ্রম মাত্র। তাহলে মুহাম্মদ কেন শয়তানের অজুহাত টেনে আগের অবস্থান থেকে সরে আসলেন? কারণ, যেমনটা ভেবে সমঝোতার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, সেটা কোরায়েশদের বিপুল প্রচারের কাছে হেরে গিয়েছিল, এতে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস ভেস্তে যাচ্ছিল; যার ফলে তাঁকে তাঁর বক্তব্য 'শয়তানের দোহাই' দিয়ে তুলে নিতে হয়েছিলো। রাজনীতিতে এ ধরনের সস্তা 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' কৌশল, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো, বা দোহাই দেওয়া অতীতকাল থেকে এখনো হরহামেশাই চলছে। (২) হযরত মুহাম্মদের নিজের খেয়াল-খুশি মতো কিংবা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আল্লাহর বাণী' কোরানের আয়াতকে পরিবর্তন করার এটা একটা উদাহরণমাত্র। এ ধরনের আরো দুয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক : আল-বারা হতে বর্ণিত, নবীজি একটি প্রত্যাদেশ জানালেন, "যেসব মুসলমান বাড়িতে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে, তাদের মর্যাদা সমান নয়।" প্রত্যাদেশ পেয়ে বললেন, জায়েদকে ডাকো, কালির দোয়াত এবং হাড়ের টুকরো লাগবে লেখার জন্য। (উল্লেখ্য, বর্তমানকালের মতো তখন তো আর কাগজ বা কম্পিউটার ছিল না; কোরানের আয়াত সংরক্ষণ করা হতো ভেড়া ও ছাগলের চামড়ার অংশ, খেজুর গাছের পাতা, চ্যাপ্টা পাথর, কাঠের পাটা, চামড়ার খণ্ড, উটের, ছাগলের স্কন্ধের ও পাঁজরের হাড় এবং 'মানুষের বক্ষ' অর্থাৎ মুখস্ত বা স্মরণশক্তিতে)। কাব্যিক ব্যঞ্জনায় লেখা শুরু হলো : মর্যাদা সমান নয় যেসব মুসলিম বসে থাকে...। নবীর পাশে আগেই বসে থাকা আমর বিন উম্মে মাকতুম নামের একজন অন্ধ ব্যক্তি এ সময় বলে উঠলো : হে আল্লাহর নবী, এই আয়াতে আমার জন্য আদেশ কি, আমি তো অন্ধ লোক। নবী আবার ধ্যানমগ্ন হলেন, প্রত্যাদেশও পেয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ : "মুসলিমদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে, তাদের মর্যাদা সমান নয়।" (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৯৫)। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬১, নম্বর ৫১২)। অথচ সুরা ইউনুসে সরাসরি বলা হয়েছে, "আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই। (no change can there be in the words of Allah.)" (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ৬৪)। সুরা কাহাফে বলা হয়েছে, "... তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। (...none can change His Words)" (সুরা ১৮, কাহাফ, আয়াত ২৭)। একই কথা বলা হয়েছে সুরা আনআমে : "আল্লাহর বাণী কেহ পরিবর্তন করতে পারবে না (None can alter the words of Allah.)।" এবং "সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ ও তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই। (The word of thy Lord doth find its fulfilment in truth and in justice: None can change His words.)" (সুরা ৬, আনআম, আয়াত ৩৪ এবং ১১৫)। এখন দেখি, সামান্য একজন অন্ধব্যক্তিও আল্লাহর বাণী সংশোধন করে দেয়! আল্লাহও মানুষের সীমাবদ্ধতা বুঝেন না! আনাস হতে বর্ণিত : ...আমরা পাঠ করলাম, "জানিয়ে দাও আমাদের লোকদের যে আমরা আমাদের নেতা-প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি খুশি হয়েছেন এবং আমরাও অত্যন্ত খুশি হয়েছি।" পরবর্তীতে এই আয়াতটি কোরান শরিফ থেকে বাতিল করা হয়। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫২, নাম্বার ৫৭)। খলিফা হযরত ওমর (বিন আল-খাত্তাব) থেকে বর্ণিত : আমার নেতা-প্রভু আমার সাথে তিনটি বিষয়ে একমত হয়েছেন। প্রথমত আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আমার ইচ্ছা আব্রাহামের (ইব্রাহিম) স্থানকেই (কাবা ঘর) আমাদের প্রার্থনার জায়গারূপে নিতে চাই। পরবর্তীতে প্রত্যাদেশ এলো : "আর আমি কাবা ঘরকে মানুষের প্রার্থনাস্থল করেছিলাম...।" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ১২৫)। দ্বিতীয়ত আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে আদেশ দিন, তারা যেন সাধারণ মানুষ থেকে পর্দা মেনে চলে, কারণ যেকোনো সময় তাঁদেরকে খারাপ-ভালো কোনো কিছু কেউ বলে ফেলতে পারে। পরবর্তীতে নবীপত্নীদের প্রতি পর্দা মেনে চলার আয়াত নাজিল হয়। (সুরা ২৪, নুর, আয়াত ৩১)।

[৬৮] Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa'd, *Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir*, (translated in English by S. Moinul Haq), Vol 1, Part 1 & 2, Pakistan Historical Society, Pakistan, Page 236-239.

তৃতীয়ত, একবার (হযরত আয়েশার জন্য নির্ধারিত দিন থাকা সত্ত্বেও আরেক পত্নী মারিয়া কিবতিয়া বা মেরি দ্য কপ্টের সাথে শয্যাশায়ী হওয়ার কারণে—লেখক) নবীর স্ত্রীগণ নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল; তখন আমি তাদেরকে বললাম, তিনি যদি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে আল্লাহতালা নবীকে তোমাদের থেকে অনেক ভালো স্ত্রী দেবেন। পরবর্তীতে আমি যেমনটি বলেছিলাম সে রকম একটি আয়াত নাজিল হল। (সুরা ৬৬, তাহরিম, আয়াত ৫)। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৮, নম্বর ৩৯৫)। (৩) সুরা বাকারাতে আল্লাহ (আসলে মুহাম্মদ) চ্যালেঞ্জ করলেন : "কোরানের আয়াত নিয়ে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে, তবে তার মতো কোনো সুরা আনো।" (সুরা ২, বাকারা, আয়াত ২৩)। চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার জন্য কোনো আরববাসী কোরানের মতো সুরা বানাবার আগেই শয়তান নিজেই সুরা নিয়ে হাজির!! এরপরও কোন মুখে মুসলিম পণ্ডিতরা দাবি করেন কোরানের সুরার মতো কোনো সুরা কেউ বানাতে পারবে না!

কোরান শরিফের ১১৪টি সুরার মধ্যে ৯০টিই মক্কায় রচিত। কোরান শরিফে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করছেন : "নিশ্চয়ই আমি এই উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণ করব।" (সুরা ১৫, হিজর, আয়াত ৯)। কিন্তু স্থান-কাল-সময়-তারিখ নির্দিষ্ট করে জগতের তাবৎ মুসলমান জাতি কেন একমত হয়ে বলতে পারেন না এই গ্রন্থখানি প্রথম কোন্ বাক্য দিয়ে শুরু করে আর কোন্ বাক্যে শেষ হয়েছে; সুরাসসমূহের কোন্ সিরিয়েল নাম্বারে কেন-কিভাবে বর্তমান কোরানখানি সাজানো হয়েছে? সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ' হতে নাজিলকৃত কোরানের বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? স্বয়ং আল্লাহ যে কোরানকে সংরক্ষণের-রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, প্রফেটের মৃত্যুর পরই কোরান নিয়ে এত বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হলো কেন? ভবিষ্যতে কোরান নিয়ে 'ছিনিমিলি খেলা' হবে সেটা কি সর্বজ্ঞ আল্লাহতায়ালা জানতেন না? কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সাবধান বাণী নেই কেন কোরানে? কোরানের বিশৃঙ্খলতার দুয়েকটি উদাহরণ দিলে মনে হয় খুবই উপযোগী হবে : কোরান শরিফের প্রথম সুরা 'ফাতিহা' কিন্তু প্রথম ওহি বা প্রত্যাদেশ নয়। প্রফেট মুহাম্মদের দাবি মতো 'আল্লাহর কাছ থেকে জিব্রাইল মারফত আসা' প্রথম দিনের 'প্রত্যাদেশ' স্থান পেয়েছে ৯৬ নম্বর সুরা আলাকের ১-৫নং আয়াতে (বাকি ৬-১৯নং আয়াতগুলো অবশ্য অনেক পরে এসেছে)। দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ স্থান পেয়েছে ৭৪ নম্বর সুরা মুদ্দাসসির'র ১-৫নং আয়াতে আর জীবনের অন্তিম 'প্রত্যাদেশ'টি নাকি স্থান পেয়েছে ২ নম্বর সুরা 'বাকারা'র ২৮১নং আয়াতে![৬৯] তাহলে বুঝুন সময়ের ক্রম হিসাবে আসা সুরাগুলো এবং অন্তর্গত আয়াতগুলি কী পরিমাণে অবিন্যস্ত। ৬১৫/৬১৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে 'আল্লাহ হতে প্রত্যাদেশকৃত' বলেন আর 'প্রফেট দ্বারা রচিতই' বলেন সুরা নজমের বর্তমান অবস্থান ৫৩ নম্বরে; এবং আরো প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে ৬২০/৬২১ খ্রিস্টাব্দে আসা সুরা 'ইসরা' বা 'বনি-ইজরাইল'-এর বর্তমান অবস্থান ১৭ নম্বরে! কেন? কোরান শরিফের একজন ইংরেজি অনুবাদক George Sale নাকি অনেক কষ্ট করে সুরাগুলোকে সময়ের ক্রমানুসারে মোটামুটি রেখে সাজানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই হিসাবে দেখা যায় সুরা আলাক (৯৬ নম্বর) সর্বপ্রথম এবং সুরা মায়িদা (৫ নম্বর) সর্বশেষ অবতীর্ণ সুরা। শুধু সুরার উল্টোপাল্টা অবস্থানই নয়, বর্তমানে যে অবস্থায় কোরানকে পাই, তাতে অনেক সময় দেখা যায়, কোনো সুরার কোনো আয়াত হয়তো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু ঠিক আগের বা তার পরের আয়াতটি বহু বছর আগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন ধরেন সুরা বাকারা। দাবি করা হয়, সুরা বাকারা নবী মুহাম্মদের মদিনাতে অবস্থানকালে বদর যুদ্ধের (৬২৪ খ্রিস্টাব্দে) প্রেক্ষাপটে প্রত্যাদেশকৃত। কিন্তু সুরা বাকারার ২৮৪ থেকে ২৮৬ নং আয়াত নবীজি হিজরতের (৬২২ খ্রিস্টাব্দে) আগে মক্কায় থাকতে বলেছিলেন কিন্তু বসানো হয়েছে সুরা বাকারার একদম শেষে! চমৎকার খোদার উপর খোদকারির ঘটনা! একই ঘটনা ঘটেছে পরের সুরা আল-ইমরানসহ আরো অনেক সুরাতে। বুঝতে পারি কোরানের লিখিত খণ্ডাংশগুলি সংরক্ষণের ভালো ব্যবস্থা ছিল না। নবী তাঁর পত্নীদের ঘরে থাকতেন বলে সংরক্ষণে অসুবিধা হত। অনেক সময় এমন হত যে প্রত্যাদেশ এলো, কিন্তু তা যথাসময়ে লিখে রাখা হল না; কালক্রমে নবী তা ভুলে গেলেন। এভাবে সে বাণী লুপ্ত হয়ে গেল। আবার অনেক সময় প্রফেট কিছু বললেন, কিন্তু 'কাতিব' (আয়াত লেখক) বা 'হাফেজ' (কোরান মুখস্তকারী)-রা তা আল্লাহর বাণী বলে লিখে রাখলেন বা মুখস্ত করলেন।[৭০] কালক্রমে তা কোরানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনকি নবী নিজেও কোরানের একেক সুরা

[৬৯] 'আল্লাহর ওহি' বলে দাবিকৃত কোরানের প্রথম আয়াত নাকি হচ্ছে, "পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" (সুরা আলাক, আয়াত ১), আর অন্তিম ওহি হচ্ছে, "সেই দিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে" (সুরা বাকারা, আয়াত ২৮১)। তবে অন্তিম ওহিটি নিয়ে বেশ ভিন্নমত রয়েছে। কারো কারো মতে, ৫নং সুরা মায়িদা'র ৩ নং আয়াত "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম ও তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম।"-সর্বশেষ ওহি।

[৭০] প্রফেট মুহাম্মদ 'ওহি' লিখে রাখা-মুখস্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৪২-৪৩ জন সাহাবির সাহায্য নিয়েছেন। প্রথম দিককার ওহি লেখকদের (কাতিব) মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নবী পত্নী খাদিজা, খাদিজার কাজিন এবং প্রতিশ্রুত 'হানিফ' ওয়ারাকা ইবনে নওফল (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল), চার খলিফা, আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ-পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিথ (৬২৯ সালে মুতার যুদ্ধে মারা যান)। এরপর নানা সময়ে আরো যারা আসেন বিবি আয়েশা, বিবি উম্মে সালমা, মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক, প্রফেটের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি জায়েদ বিন থাবিত (জায়েদ আরবি ছাড়াও পার্সিয়ান, গ্রিক, ইথিওপিক, কপটিক, সিরিয়ান, হিব্রু ভাষা জানতেন, পাশপাশি তাঁর ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল), খলিফা উসমানের সৎভাই আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্, বিখ্যাত কবি হাসান বিন থাবিত, প্রাক ইসলামি যুগের শেষ জেনারেশনের জনপ্রিয় কবি লাবিদ ইবনে রাবিয়া বিন জাফর আল-আমিরি ('দিওয়ান' নামের প্রাচীন আরবিয় কবিতা

একেক রকম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।[৭১] হাদিসে দেখি সাহাবি ইবনে মাসুদ বলেছেন, তিনি শুনতে পেলেন একজন লোক কোরানের একটি আয়াত একভাবে পাঠ করছে, এবং নবীজি ঐ আয়াতটি আবার অন্যভাবে পাঠ করছেন। অতঃপর লোকটিকে নবীর কাছে নিয়ে গেলে নবী সব শুনে বললেন, তোমরা উভয়েই ঠিক আছো, পার্থক্য তৈরি করো না। তোমাদের আগে যারা এরকম পার্থক্য তৈরি করেছিন, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৬, নম্বর ৬৮২)। এরপরও দরদী-মুসলিমরা কীভাবে যে দাবি করেন : "The text of the Qur'an is entirely reliable. It has been as it is, unaltered, unedited, not tampered with in any way, since the time of its revelation." (M. Fethullah Gulen, *Questions this Modern Age Puts to Islam*. London: Truestar, 1993. p.58)। Sir William Muir তাঁর *The Life of Mahomet* গ্রন্থের (Vol-1) প্রথম চ্যাপ্টারে আমাদের জানিয়েছেন অনেকের কাছে কোরানের ৯১নং সুরা 'শামস', ১০০নং সুরা 'আদিয়াত', ১০২নং সুরা 'তাকাসুর', ১০৩নং সুরা 'আসর' আদৌ আল্লাহর বাণী নয়। তাহলে বলতে হয় এগুলো নিশ্চয়ই নবী বা তাঁর সহযোগীদের রচিত কাব্য অথবা উপরিউক্ত উপায়ে (ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে) সুরাগুলো কোরানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আরবি ভাষা যারা জানেন না, তারা যদি একটু কষ্ট করে বাংলা বা ইংরেজিতে অনূদিত কোরানের এই সুরাগুলো পাঠ করেন তবে নির্ঘাৎ ধাক্কা খাবেন! এগুলো কি সত্যই আল্লাহর বাণী? সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, প্রশ্নের উত্তর হবে 'না'।[৭২] ৮৪নং সুরা ইনশিকাক্-এর ১৬-১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি শপথ করি গোধূলির, আর রাত্রির এবং তাকে যে ঢেকে দেয় তার; আর শপথ করি চন্দ্রের যখন তা পূর্ণ!" এই আয়াতে উল্লেখিত 'আমি' কে? নিশ্চয়ই প্রফেট মুহাম্মদ বা অন্য কারো, যিনি এই আয়াত রচনা করেছেন। তবে কোনোভাবেই আল্লাহর নয়, কারণ আয়াত শুরুর পূর্বে 'কুল' বা 'বলো' শব্দটি নেই। এবার লক্ষ্য করুন, ৯১নং সুরা শামস্। এই সুরাটিতেও সর্বজ্ঞানী-সর্বশক্তিমান, মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহুতায়ালা প্রথমে শপথ নিচ্ছেন সূর্যের, সূর্য রশ্মির, চন্দ্রের, রাতের; ৭নং আয়াতে দেখি আল্লাহ সামান্য মানুষেরই শপথ নিচ্ছেন, সাথে সাথে স্বয়ং নিজেরই শপথ নিচ্ছেন! সুরার সর্বশেষ আয়াতে (১৫নং আয়াত) বলছেন : "আর এর পরিণামের জন্য (আল্লাহর) আশঙ্কার কিছু নেই।" এসবরই কি কোনো অর্থ আছে? শুধু কাব্যিক ছন্দ-ব্যঞ্জনা-সৌন্দর্য তৈরি করা ছাড়া। আল্লাহ কেন মানুষের শপথ নিচ্ছেন, কেনইবা সূর্যের ও সূর্যের আলোর শপথ নিচ্ছেন, আবার দেখি তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন? আল্লাহ কি তাহলে ভয় পান? কাকে ভয় পান? যাহোক, বাকি সুরাগুলো পাঠক, আপনারা নিজেরাই পাঠ করে প্রশ্ন খুঁজতে থাকুন। অনেক উত্তরই পেয়ে যাবেন। ওদিকে ১২নং সুরা 'ইউসুফ'-কে আল্লাহ প্রদত্ত 'ওহি' বলে মানতে নারাজ ইসলামের আজারিদা ও মায়মুনিয়া গোষ্ঠী (Sect)। তাদের বক্তব্য হচ্ছে : "এটি ইউসুফ-জুলেখার প্রেমকাহিনী মাত্র, যেখানে এক বিবাহিত মহিলা স্বামীর অবর্তমানে বাড়ির চাকরের (নবী ইউসুফ) সাথে পরকীয়া প্রেমের জন্য প্রলুব্ধ করছে, যা একটি মহান পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অংশ হতে পারে না।" কোরান শরিফের ১০৫ নম্বর সুরা 'ফিল' এবং ১০৬ নম্বর সুরা 'কোরাইশ' কি একই সুরার অন্তর্ভুক্ত নাকি দুটি পৃথক সুরা, এ নিয়ে ইসলামের ইতিহাসে বেশ বির্তক রয়েছে। সব তফসিরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সুরা কোরাইশ, সুরা ফিলের সাথেই সম্পর্কিত। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো মাসহাফে এ দুটিকে একই সুরারূপে লেখা হয়েছিল; এবং পূর্বে উভয়

সংকলনের লেখক), উমাইয়া গোত্র নেতা আবু সুফিয়ান পুত্র খলিফা মুয়াবিয়া, খালিদ বিন অলিদ (খলিফা আবু বকরের সময়কালের সেনাপতি), ব্যক্তিগত ভৃত্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ, ওবেই ইবনে ক্বাব (আবু মুন্ধির নামেও পরিচিত; মদিনার প্রথম ব্যক্তি যিনি আকাবার দ্বিতীয় শপথ গ্রহণকালে ইসলাম গ্রহণ করেন), আমর ইবনুল আস, মুহাম্মদ বিন-মাছলামা (কবি কাব বিন আল-আশরাফ-এর হত্যাকারী), আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আল-হারিথ বিন হিশাম প্রমুখ। (দ্রষ্টব্য : মুনীর উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ*, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, পৃষ্ঠা ৯-১০)।

[৭১] দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাব হতে বর্ণিত : "নবী মুহাম্মদ জীবিত থাকতেই আমি শুনতে পেলাম হিসাম বিন হাকিম বিন হিজাম নামের এক ব্যক্তি নামাজ পড়ার সময় কোরানের (২৫ নম্বর) সুরা ফুরকান পাঠ করছে। কিন্তু সে যেভাবে পাঠ করছে, নবী আমাকে সেভাবে শিখিয়ে দেননি। নামাজ শেষ হলে আমি লোকটিকে ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কে তোমাকে এভাবে পাঠ করতে শিখিয়েছে? লোকটি উত্তর দিল, নবী মুহাম্মদ। আমি তাকে ধরে নিয়ে গেলাম নবীজির কাছে, বললাম, হে আল্লাহর নবী, এই লোকটি অন্যরকমভাবে সুরা ফুরকান পাঠ করছে, এমনটি তো আপনি আমাকে শেখাননি। তখন নবী আমাদের দুজনের কাছে আবার সুরা ফুরকান পাঠ শোনলেন। বললেন, কোরান আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হয়েছে বিভিন্নভাবে পাঠ করার জন্য, তাই তোমাদের কাছে যেভাবে সহজ হয়, সেভাবেই পাঠ করতে পারো।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬১, নম্বর ৫৬১)।

[৭২] প্রশ্ন উঠবে তাহলে কোরান কি বহুমানুষের হাতে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত কোন মনুষ্যরচিত গ্রন্থ? আমাদের কাছে মনে হয় সেই সম্ভাবনাই বেশি। কারণ কোরানের বেশ কিছু সুরাতে দেখতে পাই ডুমুর, জলপাই, সিনাই পর্বত, নিরাপদ (মক্কা) নগরী (সুরা ৯৫, তিন, আয়াত ১), কিয়ামতের, আত্মার (সুরা ৭৫, কিয়ামা, আয়াত ১-২), বাতাসের (সুরা ৭৭, মুরসালাত, আয়াত ১), ফেরেশতাদের (সুরা ৭৯, নাজিআত, আয়াত ১-৫), দ্রুতগামী ঘোড়ার (সুরা ১০০, আদিয়াত, আয়াত ১-৫) শপথ নেওয়া হয়েছে। এগুলোতে মুহাম্মদ বা তাঁর সাহাবিরা স্পষ্টই নিজেদের 'প্যাগান' ঐতিহ্য-রীতিনীতিকে লুকাতে পারেননি। যেমন পারেননি ১১৩নং সুরা ফালাকের ৪ নম্বর আয়াতে। জাদুটোনা, বাণমারা বা বশীকরণ ইত্যাদি তো আরবের পৌত্তলিকদের 'সর্বপ্রাণবাদী' উপাসনার অংশ। আবার বলা যায় প্রাক-ইসলামি যুগের কবিতায় বিশেষ করে বেদুইন কবিদের কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের কবিতায় যথেষ্ট স্তুতির উপস্থিতি, নিজেদের বিভিন্ন দ্রুতগামী-শক্তিশালী পশুর (ঘোড়া, উট) প্রশংসা করা হতো, শত্রুকে বিদ্রুপ করা হতো, শপথ নেওয়া হতো কখনো শক্তিমান, বলশালী ঈশ্বরের, কখনো বা অন্য কিছুর (সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি ইত্যাদি)। (দ্রষ্টব্য : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৭৯-১৪৫)।

সুরার মাঝে 'বিসমিল্লাহ' লিখিত ছিল না। কিন্তু তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান যখন তাঁর খেলাফতকালে কোরান সম্পাদনার উদ্দেশ্যে সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করা হয় তখন এ দুটি সুরাকে স্বতন্ত্র দুটি সুরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝে 'বিসমিল্লাহ' লিপিবদ্ধ করা হয়।[৭৩] হযরত উসমানের কোরান কমিটি 'কাটাছেড়া-পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংযোজন-বিয়োজন দ্বারা সাজানো' পরও (মুসলিমদের দাবি আর বিশ্বাস মতো) প্রত্যাদেশলব্ধ সম্পূর্ণ 'অপরিবর্তিত' কোরানটি এখন কোটি-কোটি মুসলমানের কাছে পরম পূজনীয়! কোরান শরিফ সম্পর্কে আরবি সাহিত্যের সুপণ্ডিত রেনল্ড অ্যালন নিকলসন বলেন[৭৪] : "কোরান ভীষণভাবে মানব সমাজের দলিল। এতে মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বের প্রতিটি পর্বের প্রতিফলন রয়েছে। রয়েছে তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এ কারণেই কোরানে আমরা ইসলাম ধর্মের উদ্ভব এবং প্রাথমিক বিকাশের অনুসন্ধানের অসাধারণ এবং অকাট্য তথ্য পাই। এমন তথ্য বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা অন্য কোন প্রাচীন ধর্মে নেই। দুর্ভাগ্যবশত কোরানের গ্রন্থনা যেভাবে হয়েছে তা শুধুই বিশৃঙ্খল বলেই বর্ণিত করা যায়। বিভিন্ন অধ্যায়কে (সুরা) সাজাতে কোনো কালানুক্রম মানা হয়নি। স্রেফ কোন অধ্যায়টি আয়তনে কত বড়, সেই অনুযায়ী অধ্যায়গুলি সাজানো হয়েছে। যে অধ্যায়গুলি বড় (শুধু ব্যতিক্রম প্রথম সুরা *ফাতিহা*) সেগুলি গোড়ায় স্থান পেয়েছে। এছাড়া বহুক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন বিষয়ের টুকরো টুকরো অংশ দিয়ে এক একটি অধ্যায় তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ছন্দ ছাড়া কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই। বহুক্ষেত্রেই মুহাম্মদ প্রকৃতপক্ষে যা বলেছেন সেইসব কথার মূল প্রসঙ্গ উদ্ধার করা অসম্ভব। কোন প্রসঙ্গে বা কোন পরিস্থিতিতে সেগুলি অবতীর্ণ হয়েছে তার কোনো ঠিকঠিকানা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। এই পরিস্থিতিতে কোরানকে বুঝতে-জানতে আমাদের দ্বিতীয় মূল তথ্যের উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়। তা হল, হাদিস।" নিকলসনের বক্তব্য অনুসরণ করে বলি কোরান শরিফে সুরাগুলি সাজাবার ব্যাপারে যে ধরন লক্ষ্য করা যায় তা হল : প্রথম সুরা ফাতিহা (৭টি আয়াত) বাদে দ্বিতীয় সুরা বাকারার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, তৃতীয় সুরা আল-ইমরানের আয়াত সংখ্যা ২০০, চতুর্থ সুরা নিসার আয়াত সংখ্যা ১৭৬, পঞ্চম সুরা মায়িদার আয়াত সংখ্যা ১২০। শেষের দিকের সুরার আয়াত সংখ্যা ৩০, ২০, কিংবা ১০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই কারণে দেখা যায়, প্রথম ২০টি সুরা কোরানের অর্ধেক স্থান দখল করে আছে এবং প্রথম ৪৫টি সুরা ৮০ শতাংশ স্থান।[৭৫] জার্মান স্কলার সলমন রেইনাক মনে করেন[৭৬] :

> "From the literary point of view, the Koran has little merit. Declamation, repetition, puerility, a lack of logic and coherence strike the unprepared reader at every turn. It is humiliationg to the human intellect to think that this mediocre literature has been the subject of innumerable commentaries, and that millions of men are still wasting time absording it."

কোরান এবং ইসলামের ইতিহাস নিয়ে যাদের সামান্য জ্ঞান আছে, এবং অন্ধবিশ্বাস দ্বারা তাড়িত নন, তারা সহজেই বুঝতে পারছেন, আর. এ. নিকলসন কিংবা সলমন রেইনাক শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা করছেন না, বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণী আলোচনা-গবেষণা করেই কোরান নিয়ে তাঁরা এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাই চাইলেই তাঁদের বক্তব্য এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। জার্মান স্কলার সলমান রেইনাকের মতো আরেক পশ্চিমা পণ্ডিত টমাস কারলাইল (*On Heroes and Hero Worship* গ্রন্থের লেখক), যিনি নবী মুহাম্মদের 'নেতৃত্বের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু কোরান সম্পর্কে অভিমত : a wearisome confused jumble, crude, incondite and complained of its endless iterations, ling windedness, entanglement, insupportable stupidity, in short! Nothing but a sense of duty could carry any European through the Koran! অর্থাৎ "এমন এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল যে পড়তে বিরক্তি ধরে, অশোধিত ও অসংস্কৃত, অসমাপ্ত, অসমর্থনযোগ্য যুক্তিহীন বক্তব্য; এ পুস্তক পাঠ করে কোনো ইউরোপিয়ান পাঠকের কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার নেই।" যাহোক, কোরানের উপর দর্জির কাজ করে তালি মারার জন্য শুধু খলিফা (বিশেষ করে খলিফা উসমানকে) আর কতিপয় সাহাবিদের উপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই; এতে নবীজিরও অবহেলা কম নয়। তিনি জীবিত থাকতে কোরানকে হাড়ের টুকরো, খেজুর পাতা, কাঠের টুকরোতে লিখে রাখা হতো। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে সংশোধন-পরিমার্জন করে দুই মলাটের ভিতর নিয়ে আসা কি চাট্টিখানি কথা? কোরান সম্পাদনায় সবচেয়ে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা হচ্ছে এখানে কোনো কালানুক্রম অনুসরণ করা হয়নি। কেন করা হয়নি? কোরানের যে বর্তমান রূপ আমরা পাই, তা থেকে মনে হয় কোরান সম্পাদনা করতে গিয়ে কেউ কেউ নিজের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো রকমে শুধু দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। নবী মুহাম্মদের কোরান রচনার মূল স্পিরিটটি তাঁরা ধরতে পারেননি। যেমন ধরেন : মদিনায় আবৃত্তি করা সুরা 'বাকারা' ক্রমিকানুসারে ৯১ নং সুরা। কিন্তু তা বর্তমান কোরানের ২নং সুরা। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, মক্কায় থাকাকালীন সময়ে

[৭৩] হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), *পবিত্র কোরআনুল করীম* (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), মূল : তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, (অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), খাদেমুল-হারমাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃষ্ঠা ১৪৭৬।

[৭৪] আর. এ. নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৪৭।

[৭৫] ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, *ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা*, গ্রন্থরশ্মি, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১০৯-১১০।

[৭৬] Ibn Warraq (Editior), *The Origins of the Koran*, Prometheus Books, New York, U.S.A, 1998, page 9.

সুরা 'বাকারা' বাদ দিয়ে মুহাম্মদ ও অনুসারীগণ কোরান পড়তেন কোন্ ক্রমিকানুসারে? সুরা 'ফাতিহা' নাজিল হওয়ার পূর্বে নামাজ কি পড়া হতো? হলে কিভাবে হতো? মক্কায় অবতীর্ণ সুরা 'ফাতিহা' নাজিল হয়েছিল কারো কারো মতে ৬ অথবা ৮ অথবা ৪৮টি সুরার পরে। বর্তমানে তা স্থান পেয়েছে কোরানের একেবারে গোড়াতেই। আরবি 'ফাতিহা' অর্থ শুরু, ভূমিকা বা উদ্বোধন; সুরাটির অপর নাম 'সাবউল মাসানী'। আচ্ছা 'ফাতিহা' কি আল্লাহ প্রদত্ত ওহি বা প্রত্যাদেশ? কোরান শরিফেরই সুরা? আগেই বলে রাখি এ প্রশ্নটি কিন্তু কোনো ইসলামবিরোধীদের মাথা থেকে আসেনি বরং আমাদের মহানবীর অনেক সাহাবিরাই সময়ে সময়ে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। সুরা ফাতিহাটি আগে লক্ষ্য করুন :

> "সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই, যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়, বিচারদিনের মালিক। আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমরাই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে চালিত করো সঠিক পথে, তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, যারা (তোমার) রোষে পতিত হয়নি, পথভ্রষ্টও হয়নি।" (সুরা ১, ফাতিহা, আয়াত ১-৭)।

ইংরেজি অনুবাদও এক সঙ্গে দেখে নেই : " In the name of the Merciful and Compassionate God. Praise belongs to God, the Lord of the Worlds, the merciful, the compassionate, the ruler of the day of judgement! Thee we serve and Thee we ask for aid. Guide us in the right path, the path of those Thou art gracious to; not of those Thou art wroth with, nor of those who err." দুটি অনুবাদকেই আমরা মূলানুগ বলে ধরে নিতে পারি; কারণ এখানে সুরার প্রারম্ভে বন্ধনীর মধ্যে অনুবাদক কোনো শব্দ (বলো বা Say) যোগ করেননি। আরবি কোরান শরিফে এই সুরার শুরুতে 'কুল' (বলো বা পাঠ করো) না-থাকলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষার কিছু ধুরন্ধর-কৌশলী অনুবাদক (স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে) বন্ধনীর ভিতর (বা বন্ধনী ছাড়াই) 'বলো' বা 'Say' শব্দ যোগ করার প্রয়াস চালিয়েছেন - যাতে করে সুরা ফাতিহা আল্লাহরই ঐশীবাণী, অন্য কারো রচনা নয় এমন একটি 'ধুয়া তোলা' সম্ভব হয়। কোরান শরিফে এই 'বলো' বা 'পাঠ করো' (ইংরেজি অনুবাদে Say) শব্দটি ৩৫০ বার খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঠিক কতোটি নবী মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবিরা লাগিয়েছেন আর ঠিক কতোটি অনুবাদকেরা লাগিয়েছেন, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল; যেমন গবেষকগণ আমাদের জানিয়েছেন ২৭নং সুরা নমল-এর ৯১-৯২নং আয়াতের মূল আরবিতে 'কুল' শব্দটি না থাকলেও প্রখ্যাত অনুবাদকেরা (Dawood, Pickthall, Rodwell etc) বন্ধনীর ভিতর (কেউবা বন্ধনী ছাড়াই) 'Say' শব্দটি যোগ করেছেন। আমাদের কোনো কোনো বাংলা অনুবাদকেরাও দেখি এই কাজটি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদন করেছেন। যাহোক, সুরা ফাতিহা পাঠ করলে প্রশ্ন দেখা দেয়, আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ৬-৭ লাইনের ছোট্ট প্রার্থনাটিতে তিনটি গুণবাচক নাম 'রহমান' (পরম করুণাময়), 'রহিম' (পরম দয়াময়) এবং মালিক (প্রভু) দেখতে পাওয়া যায়। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ আল্লাহ কি 'নিজের ঢাক নিজে পেটাতে' (গুণকীর্তন করতে) পারেন তাঁর প্রত্যাদেশে? তারপর 'আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি...।' এটা কি আল্লাহর বক্তব্য না মানুষের? বিখ্যাত কোরান-সমালোচক ইবন ওয়ারক তো স্পষ্ট করেই বলেছেন[৭৭] :

> "These words are clearly addressed to God, in the form of a prayer. They are Muhammad's words of praise to God, asking God's help and guidance."

ইসলামের ইতিহাস থেকে জানতে পারি মহানবীর অন্যতম সাহাবি ও ব্যক্তিগত ভৃত্য আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ তাঁর নিজের জন্য যে কোরান শরিফ পাঠে সুরা-আয়াত সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে সুরা 'ফাতিহা', এবং শেষের দুটো সুরা, ১১৩নং সুরা 'ফালাক', ১১৪নং সুরা 'নাস'-এর স্থান ছিল না।[৭৮] কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেমেটিক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক Arthur Jeffery তাঁর '*A Variant Text of*

[৭৭] Ibn Warraq, *Why I am not a Muslim*, Prometheus Books, New York, U.S.A, 1995, page 106.

[৭৮] বর্তমানে প্রচলিত সুরা ফালাক এবং সুরা নাসে অনুবাদকেরা বন্ধনী ছাড়াই 'বলো' (Say) শব্দটি যোগ করে আল্লাহর ঐশীবাণী প্রমাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। 'বলো' শব্দটি বাদ দিলে একে আর আল্লাহর ওহি বলে মনে হয় না, তখন সম্পূর্ণ নবী বা তাঁর সাহাবিদেরই বক্তব্য। আরো দেখুন, ৬নং সুরা আনআম-এর ১০৪নং আয়াত : "তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো এসেছে। যে-কেউ তা লক্ষ করবে তা করবে তা তার নিজের জন্যই করবে, আর কেউ লক্ষ না করলে তাও তার নিজের জন্যই, আর আমি তোমাদের রক্ষক নই।" এখানে 'আমি তোমাদের রক্ষক নই' কথাটি পরিষ্কারভাবেই মুহাম্মদের নিজের বক্তব্য হিসেবেই তুলে ধরে। কোরান শরিফের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক Dawoodসহ আরো অনেকেই (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan) অনুবাদের পাদটীকায় এই 'আমি' (I) কে মুহাম্মদ রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

the Fatiha' প্রবন্ধে আমাদের জানাচ্ছেন, শিয়া মতালম্বীদের সুরা ফাতিহার বেশ পুরাতন একটি ভিন্ন পাঠ তাঁর সংগ্রহে এসেছে। ভিন্ন পাঠটি প্রকাশিত হয়েছে '*Tadhkirat al-A'imma* of Muhammad Baqir Majlisi' (edition of Tehran, 1331, page 18) [৭৯] :

Nuhammidu 'llaha, Rabba 'l-alamina

'r-rahmana 'r-rahi ma,

Mallaka yaumi'd - dini,

Hayyaka na'budu wa wiyyaka nasta i nu,

Turshidu sabi la'l - mustaqi mi,

Sabi la 'lladhi na na' 'amta 'alaihim,

Siwa 'l - maghdu bi 'alaihim, wa la'd - dall i na,

ইংরেজিতে অনূদিত ঐ ভিন্নপাঠটি হচ্ছে :

We greatly praise Allah, Lord of the worlds,

he Merciful, the Compassionate,

He who has possession of the Day of Judgement.

Thee do we worship, and on Thee do we call for help.

Thou dost direct to the path of the Upright One,

The Path of those to whom Thou hast shown favor,

Not that of those with whom Thou are angered, or those who go astray,

মক্কায় রচিত সুরাগুলো পড়লে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, মুহাম্মদ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রাণীজগৎ, সৌরজগৎ ও ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল অতি সীমিত। বর্তমানকালে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে অনুবাদকের চালাকি আর গোঁজামিল দিয়ে মেলানোর চেষ্টায় রত মুসলমানদের কোরান শরিফের সেই সকল মক্কি সুরার কিছু কিছু আয়াতের ওপর এবার আলোকপাত করা যাক : "ওয়ালাকাদ বাআছনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসুলান...।" অর্থাৎ "আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি...।" (সুরা ১৬, নাহ্‌ল, আয়াত ৩৬)। আরব দেশের বাইরে জগতের কোন্ কোন্ দেশে, কোন্ কোন্ জাতির কাছে রসুল এসেছিলেন? না কি পৃথিবীতে তখন শুধু আরব দেশেই মানুষের বসতি ছিল? তৌরাত শরিফে বলা হয়েছে, পৃথিবীর মানুষ ঘোর পাপকর্মে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে আল্লাহ বড় ব্যথিত হলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন, পৃথিবীর সমস্ত জীবজগৎ ধ্বংস করে দিবেন। (জেনেসিস, ৬:৫-৮)। আল্লাহ পৃথিবী ধ্বংস করার জন্য মহাপ্লাবন সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন এবং পৃথিবীর প্রত্যেক প্রজাতি থেকে এক জোড়া করে সংগ্রহ করে রাখার পরামর্শ দিলেন হযরত নুহকে; কারণ পরবর্তীতে তাদের দিয়েই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবেন। নুহ আল্লাহর কথা মত সবকিছুই করলেন। (জেনেসিস, ৬:১৯-২২)। তৌরাত শরিফে বর্ণিত নুহের প্লাবনের সাথে কোরানের অনেকাংশই মিল রয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের 'কোরানে-বিজ্ঞান খোঁজা' কতিপয় তথাকথিত মুসলিম পণ্ডিতরা সবক দেন কোরানে নাকি হযরত নুহ বা মহাপ্লাবন নিয়ে অবাস্তব কিছু বলা হয়নি! আচ্ছা! তাই বুঝি! মিশরীয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ ড. তাহা হুসেন (১৮৮৯-১৯৭৩) একদা বলেছিলেন[৮০] : "They must explain what distinguishes Christanity from Islam for both stem from the same source. The essence of Islam is the same essence of Christanity." অর্থাৎ তাঁদেরকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করে দেখাতে হবে ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে কী সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। কেননা এই দুই ধর্ম একই উৎস থেকে উদ্ভূত। ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য বা নির্যাস আর খ্রিস্টানের মূল বৈশিষ্ট্য বা নির্যাস একই। আমাদের স্বীকার করতে আপত্তি নেই কোরান শরিফে তৌরাত শরিফের মতো বিস্তারিতভাবে নুহের জাহাজের বর্ণনা (জাহাজের উচ্চতা-আয়তন-ধারণ সংখ্যা) বা মহাপ্লাবন নিয়ে বক্তব্য দেয়া হয়নি। (দ্রষ্টব্য : *The Origins of the Koran*, page 190-192)। আবার যা দেওয়া হয়েছে তাও কম নয়। কোরান শরিফে স্পষ্ট বলা আছে : "আমি তো নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে ওদের মধ্যে বাস করেছিল সাড়ে ন'শো বছর।" (সুরা ২৯, আনকাবুত, আয়াত ১৪)। কোরানে আল্লাহ (?) বলছেন : "... সে জাহাজ বানাতে লাগল, আর যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার কাছ দিয়ে যেত

[৭৯] Ibn Warraq (editor), *The Origins of the Koran*, Prometheus Books, New York, U.S.A, 1998, Page 145-149. আগ্রহীরা Arthur Jeffery-এর *A Variant Text of the Fatiha* প্রবন্ধটি আন্তর্জাল থেকে পাঠ করে নিতে পারেন : http://www.answering-islam.org/Books/Jeffery/fatiha.htm

[৮০] Dr. Taha Hussain, *The Future of Culture in Egypt*, American Council of Learned Societies, Washington, DC, 1954, Page 7

তারা তাকে ঠাট্টা করত। ...অবশেষে আমার আদেশে পৃথিবী প্লাবিত হল। আমি বললাম, এর ওপর প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া উঠিয়ে নাও, যাদের বিরুদ্ধে আগেই স্থির করা হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবার-পরিজনকে ও যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকেও উঠিয়ে নাও।... এরপর বলা হল, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শুষে নাও! আর হে আকাশ! থামো। এরপর বন্যা প্রশমিত হল।" (সুরা ১১, হুদ, আয়াত ৩৬-৪৪)। আবার দেখুন : "তারপর আমি তার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ তৈরি করো, তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও পৃথিবী প্লাবিত হবে তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া আর তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে। আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তাদেরকে ডোবানো হবে।" (সুরা ২৩, মুমিনুন, আয়াত ২৭)। হযরত নুহ সাড়ে ন'শো বছর বেঁচে ছিলেন সেটা তৌরাত শরিফের জেনেসিসের ৯:২৯ আয়াতেও বলা আছে। বলুন তো, কোরান শরিফে উল্লেখ আছে বলেই কোনো ব্যক্তি সাড়ে ন'শো বছর বেঁচে থাকতে পারে আর কতিপয় ধর্মগুরু (আসলে ধর্মমাতাল) এটা আজকের নানা উছিলায় 'বাস্তবসম্মত' বলে দাবি করবেন এবং তা মেনে নিতে হবে, এতোটা মূঢ় নিশ্চয়ই হয়নি কেউ? আরবি ভাষার অধ্যাপক ড. তাহা হুসেন অনেক আগেই এ ধরনের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। অর্ধশতাব্দীব্যাপী মিশরের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ড. তাহা হুসেন ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিল শীর-আল-জাহিলী' বা '*On Pre-Islamic Poetry*'-তে খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন :

> "The Torah may speak to us about Abraham and Ishmael and the Quran may tell us about them too, but the mention of their names in the Torah and the Quran is not sufficient to establish their historical existence, let alone the story which tells us about the emigration of Ishmael, son of Abraham, to mecca and the birth of the arabicized Arabs there. We are compelled to see in this story a kind of fiction to establish the relation of the Jews and Arabs on the one hand and Islam and Iudaism on the other." অর্থাৎ, তৌরাত শরিফ আমাদেরকে ইব্রাহিম ও ইসমাঈল সম্বন্ধে বলতে পারে এবং কোরানও আমাদেরকে তাঁদের সম্পর্কে বলতে পারে, কিন্তু কেবল তৌরাত ও কোরানে তাঁদের নাম থাকাই যথেষ্ট নয়। গল্পটি আমাদেরকে ইব্রাহিম-পুত্র ইসমাঈলের দেশান্তরী হয়ে মক্কায় গমন, এবং আরবি ভাষা-সংস্কৃতির আরব জাতির জন্মের কথা বলে। গল্পটিতে আমরা এক ধরনের অলীক বস্তু দেখতে বাধ্য হই, একদিকে ইহুদি জাতি ও আরব জাতির মধ্যে, অন্যদিকে ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য অলীক কাহিনীটির সৃষ্টি। (দ্রষ্টব্য : *পার্থিব জগৎ*, পৃষ্ঠা ১৫৩)।

আমরাও ড. তাহা হুসেনের বক্তব্যে এক মত পোষণ করে একটু পিছনের দিকে টেনে ইব্রাহিম থেকে নুহ বা আদম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বলতে পারি কোরান শরিফ বা কোনো ধর্মগ্রন্থে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নাম থাকলেই তার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বা ন্যায্যতা প্রকাশ পায় না। ধর্মগ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক-এক জোড়া করে নুহের বিশাল নৌকায় উঠানো হয়েছিলা। চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা ভারতবর্ষের কোনো মানুষ, পশু-পাখি, সাপ, কীট-পতঙ্গ কি সেই নৌকায় উঠেছিল? না-কি আরব দেশ ব্যতীত তখন জগতে কোনো দেশ বা কোনো প্রাণী ছিল না? চল্লিশ দিন পর নৌকা থেকে নেমে এক জোড়া শামুক বা কেঁচো বা জোঁক সারা পৃথিবীতে বংশবিস্তার করলো কতো দিনে, কিভাবে? নুহের মহাপ্লাবনের অবাস্তব-অসম্ভব বর্ণনা সম্পর্কে অত্যন্ত যৌক্তিক প্রশ্ন তুলেছেন বিখ্যাত লেখক এবং কোরান-সমালোচক ইবন ওয়ারক, তিনি বলেন :

> "Noah was asked to take into the ark a pair from every species (sura 11.36-41). Some zoologists[+] estimate that there are perhaps ten million living species of insects; would they all fit into the ark? It is true they do not take up much room, so let us concentrate on the larger animals: reptiles, 5,000 species; birds, 9,000 species; and 4,500 species of class of Mammalia. In all, in the phylum Chordata, there are 45,000 species. What sized ark would hold nearly 45,000 species of animals? A pair from each species makes nearly 90,000 individual animals, from snakes to elephants, from birds to horses, from hippopotamuses to rhinoceroses. How did Noah get them all together so quickly? How long did he wait for the sloth to make his slothful way from the Amazon? How did the kangaroo get out of Australia, which is an island? How did the polar bear know where to find Noah?" (দ্রষ্টব্য : *Why I am not a muslim*, page 133)।

ইবন ওয়ারকের এ প্রশ্নগুলো তো আমাদেরও। আজকের যুগের একটা স্কুলের বাচ্চা ছেলেও বুঝবে তৌরাত শরিফে বা কোরান শরিফে উল্লেখ করা হযরত নুহ আর তাঁর মহাপ্লাবনের কাহিনী একেবারে 'ঈশপের গল্প' টাইপের কেচ্ছাকাহিনী ছাড়া কিছুই নয় এবং

[+] Lynn Margulis and K.V. Schwartz, *Five Kingdoms*, San Francisco, 1982, page 224-39.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ছাড়াই কোরান শরিফ তা ধার করেছে তৌরাত শরিফ থেকেই![৮১] আচ্ছা, কেনইবা এক আদম আর এক বিবি হাওয়া থেকে সৃষ্ট মানুষগুলো পৃথিবীতে হাজার প্রকার ভাষায় কথা বলে? ধরে নিলাম মা হাওয়ার ভাষা ছিল আরবি এবং তাঁর সন্তানেরা একটি চতুষ্পদ জন্তুকে 'জামাল' নামে ডাকতো। কিন্তু আদমের সন্তানেরা বাংলাদেশে গিয়ে ঐ জন্তুটিকে দেখে 'উট' আর ইংল্যান্ডে এসে 'ক্যামল' নামে ডাকবে কেন? আদম-হাওয়া কি তাদের সন্তানদেরকে এক-একটি প্রাণীর কয়েক হাজার নাম শিখিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন? না কী ঐ সকল জায়গায় আগে থেকেই ভিন্ন ভাষার মানুষ বাস করতো? কেউ যদি বোকার স্বর্গে বাস না করে তাহলে তার জন্যে ব্যাপারটা বুঝা মোটেই কঠিন নয়। ভাষার বিষয়টি যখন ওঠেই এল, তখন একফাঁকে বলে নিই; কথিত আছে জিব্রাইল মারফত নবীজির কাছে কোরানের আয়াত নাজিল হতো 'কাবিলা মাজারদের' ভাষায়। মাজার হলেন নবীজির পরদাদদের একজন। তাঁর নামানুসারেই গোত্রের নাম হয়েছে কাবিলা মাজার। এই কাবিলা মাজারের ভাষাই ছিলো মক্কার কোরায়েশদের ভাষা; যা মূলত আরবেরই একটি আঞ্চলিক ভাষা। কিন্তু বিশ্বাসীরা বলে থাকেন, তা ছিলো স্বয়ং আল্লাহর ভাষা।[৮২] ইসলামের আলেম-ওলামা, বুজুর্গব্যক্তিবর্গ থেকে সাধারণ মুসলমানও দাবি করেন, কোরান শরিফ একেবারে খাঁটি আরবি ভাষাতেই রচিত; আল্লাহতায়ালা পরিষ্কার আরবি ভাষাতেই (clear Arabic language) কোরান নাজিল করেছেন। প্রাচীন মুসলিম তফসিরকারকগণ যদিও প্রথম প্রথম কোরানে বিদেশি শব্দ আমদানি বা ঋণের কথা স্বীকার করেছেন; মোতাজিলাপন্থী আরবি গদ্যের বিশেষজ্ঞ আমর ইবন বাহার ('আলজাহিজ' নামে খ্যাত, মৃত ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) বলেছিলেন, কোরান রচনায় ও ভাষায় একটি ভালো গ্রন্থ বটে, তবে পরিপূর্ণ আরবি ভাষায় রচিত নয়। নবীজির অন্যতম সাহাবি আব্বাস ইবন মিরদাস নিজের একটি কবিতায় বলেছিলেন 'ইসলাম' শব্দটিও মুহাম্মদের পূর্বে প্রচলিত ছিল, তিনি শুধু এর 'মেরামত' বা সংস্কার করেছেন।[৮৩] তাছাড়া আরো কিছু শব্দ যেমন কোরানের চ্যাপ্টারকে 'সুরা' বলা হয়, 'সুরা' শব্দটি এসেছে সিরিয়ান শব্দ সুরতা (Surta) থেকে, (সিরিয়ান) খ্রিস্টানরা ঐ শব্দটি ব্যবহার করতো তাদের ধর্মীয় পুস্তকের অংশবিশেষকে। এছাড়া আল্লাহর কাছে মুসলমানদের সম্পূর্ণ প্রণিপাতকে 'সেজদা', আল্লাহকে বারবার একাগ্রচিত্তে স্মরণ করার পদ্ধতিকে 'জিকির' (Zurkrana থেকে আগত, বাংলা অর্থ প্রণিপাত), বাধ্যতামূলক দানের জন্য যে কর 'জাকাত', ভিক্ষুকদের (মিসকিন) ভিক্ষা দেয়াকে 'সাদাকা' বলে—এসবই নবী মুহাম্মদের সময়কালীন সিরিয়ান খ্রিস্টানদের বহুল ব্যবহৃত শব্দমালা; এবং তা অপরিবর্তিতরূপে ইসলামে-কোরান শরিফে যোগ করা হয়েছে। কোরান শরিফের ২৫নং সুরার শিরোনাম 'ফুরকান'। 'ফুরকান' শব্দের অর্থ ওহি (Revelation) যা প্রাক-ইসলামে এবং ইসলামে 'মুক্তি' (Salvation) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ফুরকান' শব্দটি এসেছে আরামাইক খ্রিস্টান শব্দ 'পোরকান' (Porkhan) থেকে, যার অর্থ একই অর্থাৎ মুক্তি বা Salvation। (দ্রষ্টব্য : *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, পৃষ্ঠা ২০৯-২১০)। তবে পরবর্তীতে বিশেষ করে ইমাম মুহাম্মদ আল শাফিইর (মৃত ৮২০) প্রভাবে কোরান শরিফে বিদেশি শব্দের উপস্থিতি স্বীকার করার ধারা আস্তে আস্তে চাপা দেওয়া হতে শুরু করে। বলা হয়, কোরানের প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ আল্লাহ কর্তৃক রচিত এবং প্রেরিত; খাঁটি আরবি ভাষায় অবিকৃতভাবে লিখে রাখা হয়েছে। কোরান শরিফের নয় থেকে দশটি আয়াতেও এরকম দাবি রয়েছে। সুরা এবং আয়াতগুলি হচ্ছে :

> (১) সুরা ১২, ইউসুফ, আয়াত ২; (২) সুরা ১৬, নাহ্‌ল, আয়াত ১০৩; (৩) সুরা ২০, তাহা, আয়াত ১১৩, (৪) সুরা ২৬, শোআরা, আয়াত ১৯৫; (৫) সুরা ৩৯, জুমার, আয়াত ২৮; (৬) সুরা ৪১, হা-মিম সিজদা বা ফুস্‌সিলাত, আয়াত ৩, ৪৪; (৭) সুরা ৪২, শুরা, আয়াত ৭; (৮) সুরা ৪৩, জুখরুফ, আয়াত ৩; (৯) সুরা ৪৬, আহ্‌কাফ, আয়াত ১২।

কিন্তু কোরান শরিফের বিখ্যাত তফসিরকারক (টীকাকার) এবং মুসলিম পণ্ডিত ইমাম জালাল উদ্দিন আল-সিউতি (Jalaluddin Al-Suyuti, ১৪৪৫-১৫০৫) '*Precision and Mastery in the Sciences of the Qur'an*' (Al-Itqan fi `Ulum al-Qur'an) গ্রন্থের একটি চ্যাপ্টারে আরবি কোরান শরিফে পাওয়া ১০৭টি বিদেশি শব্দের (অ-আরবি) তালিকা দিয়েছেন, যে শব্দগুলি কোরান শরিফের আগে আরবি ভাষায় রচিত অন্যান্য সাহিত্যে প্রচলিত ছিল না। সিউতি কোরানে ভারতীয়[৮৪], মিশরীয়, কপটিক, তুর্কি, নিগ্রো এবং

---

[৮১] তৌরাত বা কোরান শরিফসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মহাপ্লাবন নিয়ে পৌরাণিক-লোকগাঁথা সম্পর্কে জানতে পড়ুন : *মহাপ্লাবনের বাস্তবতা: পৌরাণিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান*, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০০৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৩-৪০।

[৮২] বেনজীন খান, *দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৯০।

[৮৩] M. M. Bravmann, *The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts*, Leiden, 1972, Page 26.

[৮৪] কোরান শরিফে ভারতীয় বা সংস্কৃত শব্দের উপস্থিতি নির্ণয় নিয়ে অনেকের মধ্যে বেশ আগ্রহ আছে। আমি পাঠকের এই আগ্রহের দিক লক্ষ্য করে কোরান শরিফে উল্লেখিত বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত 'সম্ভাব্য' তিনটি সংস্কৃত শব্দ উল্লেখ করছি : প্রথম শব্দ ৭৬নং সুরা দাহ্‌র (Al-Insan)-এর ১৭নং আয়াতের '*জানজাবিল*' (Zanjbeel)। এই আয়াতে আল্লাহ (মুহাম্মদ?) বেহেস্তবাসীদের *জানজাবিলের* পানিমিশ্রিত এক পানীয় খাওয়ানোর কথা বলছেন। দ্বিতীয় শব্দ একই সুরার ৫নং আয়াতের '*কাফুর*' (kafur)। আয়াতের বর্ণনায় যা এক ধরনের 'স্বর্গীয়' সুগন্ধিযুক্ত শরাব। তৃতীয় শব্দটি ৮৩নং সুরা মুতাফ্‌ফিফিন-এর ২৬নং আয়াতের '*মুস্ক*' (musk)। আয়াতে ঐ শব্দ স্বর্গীয় পানীয়ের সাথে সম্পর্কিত। এখানে উল্লেখ্য, অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সুগন্ধি (যেমন চন্দন), মসলা (যেমন গোল মরিচ, দারুচিনি), আয়ুর্বেদিক ঔষধের খ্যাতি বিশ্বজোড়া সমাদৃত এবং গ্রিক-সিরিয়া-পারস্যের সাথে ভারতের ভালোই বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

বার্বার শব্দের উপস্থিতি চিহ্নিত করেছেন। তবে কোরান শরিফে বিদেশি শব্দের উপস্থিতি নির্ণয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেমেটিক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক Dr. Arthur Jeffery (১৮৯২-১৯৫৯)। তিনি ২৭৫টি বিদেশি শব্দের উপস্থিতি প্রাচীন আরবিয় কোরান শরিফ থেকে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন, যেগুলোর উৎস ইউথোপিয়ান, আর্মেনিয়ান, হিব্রু, সিরিয়ান, সাবাতিয়ান, গ্রিক, ল্যাটিন, মধ্যপারস্য ইত্যাদি অ-আরবি (আজমি) ভাষা।[৮৫] তাহলে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি, নবীজি এবং সাহাবিরা কোরান শরিফে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা অবশ্যই খাঁটি নির্দিষ্ট আরবি ভাষায় রচিত নয়, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সংকর জাতীয় 'আঞ্চলিক ভাষা'। আরবি ভাষায় শব্দের এই রকমফের নিয়ে কোনো কোনো মৌলানা-আলেম-ওলামা শেষমেশ নিজেদের পূর্বের অবস্থান ধরে না রাখতে পেরে বলে থাকেন, কোরানে কিছু বিদেশি শব্দ থাকলেও তার 'আরবত্ব' ক্ষুণ্ন হয় না। এতে আমাদের আপত্তি নেই; কোরানে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ যেভাবেই ঘটুক না কেন, তার আরবিয় বৈশিষ্ট ক্ষুণ্ন হয়েছে কি হয়নি, সেটা বিতর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু কীভাবে-কেন ঐ বিদেশি শব্দগুলো কোরানে গুঁজে গেল তার উৎস অনুসন্ধানে নবীজির বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আরবের (মক্কার) বাইরে (আবিসিনিয়া, সিরিয়া, পারস্য, ফিলিস্তিন ইত্যাদি) ভ্রমণ, স্বাভাবিকভাবে সেখান থেকে বিদেশি ভাষা রপ্ত করা, এবং কয়েকটি বিদেশি ভাষার বিশেষজ্ঞ সাহাবিদের কোরান রচনায় প্রভাব অস্বীকার করা যায় না কিংবা আমাদের কাছে অবাস্তব বা ভুল বলে মনে হয় না।[৮৬] এবার আসি, ওপরে আন্ডার লাইন করা সুরা নাহ্‌ল-এর ১০৩ নম্বর আয়াতে। এই আয়াতটি আবার লক্ষ্য করুন : "And indeed We know that they say: "It is only a human being who teaches him, The tongue of the man they refer to is foreign, while this is a clear Arabic tongue." (সুরা ১৬, নাহ্‌ল, আয়াত ১০৩)। আল্লাহ (আসলে নবীজি) দাবি করছেন, কোরান একেবারে আরবি ভাষায় আল্লাহর কাছ থেকেই আসছে। কিন্তু ইতিহাস থেকে জানি নবী তো তৎকালীন মক্কার সমাজবিচ্ছিন্ন কেউ ছিলেন না, মক্কার প্রতিষ্ঠিত বংশে জন্ম, বাপ-দাদারা আরবের সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মীয় উপাসনালয় 'কাবা ঘরের' স্বত্বাধিকারী, জন্মের সময় পিতা-মাতা মারা গেলেও দাদা-চাচা কেউই দরিদ্র ছিলেন না, তাঁদের কাছেই লালন-পালন, তার উপর মক্কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী খাদিজার সাথে বিবাহ নবীজির ভাগ্যের চাকাই ঘুরিয়ে দেয়।

মুহম্মদ (দঃ) কি সত্যই নিরক্ষর ছিলেন?

প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখি নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত মিথ হচ্ছে, তিনি নাকি 'উম্মি' বা নিরক্ষর ছিলেন। (এতে কোরানের অলৌকিকতা আরো বেশি মজবুত হয়, কারণ মুসলিমরা বেশ গর্ব করেই বলতে ভালবাসেন, '১৪০০ বছর আগেকার এক নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ কোরাণ রচনা করা অসম্ভব ছিলো' !) মুসলিম পণ্ডিতদের ভাষ্য মতে কোরান শরিফের (মক্কায় অবতীর্ণ) ৭নং সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৭, (মক্কায় অবতীর্ণ) ২৯নং সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৮, (মদিনায় অবতীর্ণ) ৬২নং সুরা জুম্‌আ, আয়াত ২-এ আল্লাহতায়ালা নবীজিকে উম্মি হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস এবং হাদিস থেকে পাই ভিন্ন তত্ত্ব। পাশ্চাত্যের ইসলামি স্কলাররা (Maxime Rodinson, Montogomery) সরাসরি অস্বীকার করেন মুহাম্মদ নিরক্ষর বা উম্মি ছিলেন। তাঁরা মনে করেন 'উম্মি' বলতে মুহাম্মদকে কোরান শরিফে একেবারেই নিরক্ষর বা লিখতে-পড়তে জানেন না বলে বোঝানো হয়নি বরং শুধু বোঝানো হয়েছে মুহাম্মদ ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ (তৌরাত, ইঞ্জিল শরিফ) পাঠ করেননি পূর্বে। পশ্চিমা পণ্ডিতরাও তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে সুরা আনকাবুতের ৪৮নং আয়াত হাজির করেন। ঐ আয়াতে বলা হয়েছে : "তুমি তো এর পূর্বে কোনো কেতাব পড়নি বা নিজ হাতে কোনো কেতাব লেখনি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করবে।" এছাড়া পশ্চিমা পণ্ডিতরা গুরুত্ব দেন নবী মুহাম্মদের জীবনকে। আমরা দেখি নবীর জীবনীকার সকলেই জানিয়েছেন, মক্কা ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি এবং নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ছোটবেলা থেকেই মুহাম্মদকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রায়ই মক্কার বাহিরে যেতে হত। সেই বহির্বাণিজ্যে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার ছাপ রেখেছিলেন। প্রশ্ন দেখা দেয় একজন বণিকের যদি সামান্য অক্ষর জ্ঞান না থাকে এবং হিসাব-নিকাশ চালানো মতো গণনা দক্ষতা না থাকে তবে তো বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। টাকা পয়সার লেনদেন কি অন্যের উপর নির্ভর করে চলে? আমরা জানি বিবি খাদিজা কিন্তু প্রথমে মুহাম্মদকে বাণিজ্যে দক্ষতার কারণেই মুগ্ধ হয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচালকরূপে নিয়োগ দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে পরিণয়ের দিকে সম্পর্ক গড়ায়। খাদিজার মতো একজন ব্যবসায় সফল-অভিজ্ঞ রমণী তাঁর ব্যবসার বৈদেশিক দায়িত্ব একজন

[৮৫] Arthur Jeffery, *The Foreign Vocabulary of the Koran*, Oriental Institute, Baroda, 1938; http://www.answering-islam.org/Books/Jeffery/Vocabulary/index.htm

[৮৬] কঙ্কর সিংহ, *ইসলাম ও কোরান*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৬১।

নিরক্ষর ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিবেন এটা ভাবা যায় না। তারপরও ধরে নিলাম, খাদিজার সাথে বিয়ের আগে মুহাম্মদ নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে তিনি অক্ষরজ্ঞান শেখেননি তাও ভাবা যায় না, কারণ খাদিজা মুহাম্মদের থেকে বয়সে বড় হওয়ায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং বিশাল বাণিজ্য সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অবশ্যই তাঁকে লেখাপড়া, হিসাব-নিকাশ শিখতে হয়েছে নিশ্চয়ই।

এতো গেল নবীর জীবন-ইতিহাস। এবার হাদিসে দেখি কি বলা হয়েছে : (১) উসরা হতে বর্ণিত, ছয় বছরের আয়েশার সাথে বিয়ের কাবিন নবী মুহাম্মদ নিজেই লিখেছেন। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৮৮)। (২) ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, একটি লোকের হাতে লাল চামড়ায় আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য লেখা ছিল বানু জুহাইর ইবন উকাইশের জন্য। বক্তব্য হচ্ছে : "তোমরা যদি অন্য কোনো ঈশ্বর বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নাও, মুহাম্মদকে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করো, যাকাত দাও, নামাজ পড়ো তবে আল্লাহ এবং তার নবীর কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে।" এরপর লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হল, এই বার্তা কে লিখে দিয়েছে? লোকটি উত্তর দিল 'আল্লাহর নবী'। (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১৯, নম্বর ২৯৯৩)। (৩) আল বারা হতে বর্ণিত, নবী ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, যতক্ষণ না তিনি রাজি হন মক্কাবাসীর সাথে চুক্তি করতে। তিন দিন অপেক্ষার পর তিনি শান্তি চুক্তি করতে রাজি হলেন। একজন মুসলমান চুক্তি লেখার পর নীচে স্বাক্ষরের স্থানে লিখল আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে। মক্কার কাফেররা প্রতিবাদ করে উঠল। তারা মুহাম্মদকে 'আল্লাহর নবী' বলে স্বীকার করতে চাইলো না। বললো, মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহর পুত্র, এটাই লেখা হউক। এ নিয়ে দ্বন্দ্বে যখন চুক্তি প্রায় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম তখন মুহাম্মদ হযরত আলিকে নির্দেশ দিলেন, চুক্তিপত্র হতে 'আল্লাহর নবী' শব্দ কেটে দিতে। কিন্তু আলি রাজি হলেন না। তখন মুহাম্মদ নিজেই চুক্তিপত্র হাতে নিয়ে নিজ হাতে কেটে দিলেন 'আল্লাহর নবী' শব্দটি এবং যোগ করলেন 'আব্দুল্লাহর পুত্র'। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৫৫৩)।[৮৭] সহি মুসলিমেও ঘটনাটি বিধৃত আছে এভাবে -

> It has been narrated on the authority of al-Bara' b. 'Azib who said: 'Ali b. Abu Talib penned the treaty between the Holy Prophet (may peace be upon him) and the polytheists on the Day of Hudaibiya. He wrote: This is what Muhammad, the Messenger of Allah, has settled. They (the polytheists) said: Do not write words" the Messenger of Allah". If we knew that you were the Messenger of Allah, we would not fight against you. The Prophet (may peace be upon him) said to 'Ali: Strike out these words. He (Ali) said: I am not going to strike them out. So the Prophet (may peace be upon him) struck them out with his own hand. The narrator said that the conditions upon which the two sides had agreed included that the Muslims would enter Mecca (next year) and would stay there for three days, and that they would not enter bearing arms except in their sheaths or bolsters. (Sahih Muslim, Chapter 33, Book 19, Number 4401)

যে নবী 'নিরক্ষর', লিখতে পড়তে জানেন না, তিনি কিভাবে কোন একটা লিখিত চুক্তি থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে তা কেটে দিতে পারেন? এ ছাড়া বহু হাদিসে আছে মুহম্মদ (দঃ) নিজ হাতে 'ডকুমেন্ট' রচনা করেছেন। যেমন,

> Narrated Anas bin Malik :
>
> Once the Prophet wrote a letter or had an idea of writing a letter. The Prophet

[৮৭] আরো দেখুন : বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ৬৫; বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ১১৪; বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫২, নম্বর ২৮৮; বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৭১৬, ৭১৭; বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৭০, নম্বর ৫৭৩; বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৯২, নম্বর ৪৬৮; বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৩, নম্বর ৩৯৩। কোরান শরিফের প্রথম 'নাজিলকৃত' সুরা, ৯৬নং সুরা আলাকের ১-৪নং আয়াতে 'পাঠ করার কথা বলা হচ্ছে', প্রশ্ন দেখা দেয়, যে ব্যক্তি নিজেই লেখাপড়া জানেন না বলে দাবি করা হচ্ছে, তিনি কিভাবে আল্লাহর ওহি নিয়ে এসে জনসাধারণকে 'পাঠ' করার কথা বলেন? আবার ৬৮নং সুরা কলমের প্রথম আয়াতেই 'কলম' এবং 'লেখনী'র শপথ নেয়া হয়েছে, যা অবশ্যই লক্ষণীয়।

was told that they (rulers) would not read letters unless they were sealed. So the Prophet got a silver ring made with "Muhammad Allah's Apostle" engraved on it. As if I were just observing its white glitter in the hand of the Prophet ... (Sahih Bukhari Volume 1, Book 3, Number 65)

Narrated 'Ubaidullah bin 'Abdullah:

Ibn 'Abbas said, "When the ailment of the Prophet became worse, he said, 'Bring for me (writing) paper and I will write for you a statement after which you will not go astray.' But 'Umar said, 'The Prophet is seriously ill, and we have got Allah's Book with us and that is sufficient for us.' But the companions of the Prophet differed about this and there was a hue and cry. On that the Prophet said to them, 'Go away (and leave me alone). It is not right that you should quarrel in front of me." Ibn 'Abbas came out saying, "It was most unfortunate (a great disaster) that Allah's Apostle was prevented from writing that statement for them because of their disagreement and noise. (Volume 1, Book 3, Number 114)

এবার নিশ্চয়ই অনেকের ভিতর থেকে সংশয় দূর হয়েছে, মুহাম্মদ আসলেই 'উম্মি' ছিলেন না।

এখন আমরা পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাই, নবী চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার পর তিনি যখন পৌত্তলিকতা বিরোধী বক্তব্য দিয়ে নিজেকে আল্লাহর মনোনীত শেষ নবী দাবি করলেন, এবং আল্লাহর বক্তব্য হিসেবে কোরানকে হাজির করলেন সেখানে মক্কাবাসীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতো নবীজির আশেপাশে কারা থাকে, কাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন, তাদের কর্ম-পরিচয় কী ইত্যাদি। তাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্দেহ করেছিল, আরবিয় এবং অ-আরবিয় কোন কোন ব্যক্তিবর্গ নবীজিকে কোরান রচনায় সহায়তা করছে। পাঠকের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, এখানে কোন সেই ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে? পনেরশত বছর পর আজ হয়তো শতভাগ নিশ্চিত করে বলা যাবে না, তবে বিভিন্ন ইসলামিক স্কলার মুহাম্মদের জীবনী অধ্যয়ন করে কয়েকজনকে সম্ভাবনার মাধ্যমে সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আল-নিসাবোরি। তিনি[৮৮] বলেন, এখানে সম্ভবত পাঁচজন ব্যক্তির যে কোনো কারো কথা বলা হচ্ছে : (১) হোতেইব ইবন আব্দুল ইজার সন্তান আইস এবং জাইস, যারা তৌরাত শরিফ সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ ছিল, (২) ফাইক ইবন আল-মোঘেইরা'র সন্তান সোলেমান আল-পার্সি, যিনি প্রথমে পারস্যের (ইরান) অগ্নিপূজারি জরথুস্ত্রিয়ান ছিলেন, পরে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। পারস্যের জান্দিশাপুরে নেস্টোরিয়ান কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করে খ্রিস্টান কাল্‌ব গোত্রে বসবাস শুরু করেন। মদিনাতে খন্দকের যুদ্ধে 'পরিখা খনন করার বুদ্ধি' মুহাম্মদকে তিনিই প্রদান করেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি নবীজির ওহি লেখকদের (কাতিব) কেউ ছিলেন না, তবে নবীর সঙ্গী হিসেবে নিয়মিত আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। কথিত আছে, কোরানে শেষ বিচারের দিন, ফেরেস্তা ও শয়তান বা ইবলিস ইত্যাদি যে কথা বিধৃত আছে, তার ধারণা নবীকে এই সোলেমান পার্সিই প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে আরো পুরাতন ধর্মগ্রন্থ জেন্দাআবেস্তায় (জরথুস্ত্রিয়ানদের ধর্মগ্রন্থ) ইবলিস, শেষ বিচারের দিন, মৃত্যুর পর শাস্তি ইত্যাদির কথা বর্ণিত আছে। (৩) রোমানিয়া থেকে আগত খ্রিস্টান আমর ইবন আল-হাদ্রমি (৪) মক্কার দুই লোক জাবের এবং ইয়াসর, পেশায় তরবারি বানাতো পাশাপাশি সুন্দর করে তৌরাত এবং বাইবেল পাঠে তাদের প্রচুর খ্যাতি ছিল। নবীজিও ওদের কাছে এসে তৌরাত-বাইবেলের পাঠ শুনতেন। (৫) মক্কার একজন লৌহমানব (সম্ভবত দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন আল খাত্তাবের কথা বলা হচ্ছে, কারণ তিনি ঐ নামেই বিখ্যাত ছিলেন)। আরেক ইসলামিক স্কলার শেখ খলিল আব্দুল করিম[৮৯] কয়েকজন সম্ভাব্য ধর্মীয়-গুরুর নাম দিয়েছেন, যাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মক্কার চারিদিকে বেশ প্রসারিত ছিল। তালিকায় প্রথম নাম হচ্ছে : (১) খ্রিস্টান সাধক, নবীর প্রথম স্ত্রী খাদিজার কাজিন ও হানিফ মতাবলম্বী ওয়ারাকা বিন নওফল (নওফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের শেষের প্রবন্ধে আছে)। (২) সিরিয়ার নেস্টরিয়ান চার্চের সন্ন্যাসী বহিরা (খ্রিস্টান নাম সারজিয়োস) (৩) প্রফেটের অন্যতম সাহাবি ইবনে আব্বাস। যাহোক, কোরান নিয়ে মক্কাবাসীর সন্দেহের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি ইংরেজি সেই প্রবাদ "No smoke exist without a fire!"

[৮৮] Al-Nisabory, *Bizarre of the Quran*, Part 7, Page 99.

[৮৯] Sheikh Khalil Abdul Kareem, *The Genisis period in the life of the truthfull and the honest*, Page 33

সুরা ফুরকানের ৫৯নং আয়াতে বলা হল : "আল্লাজি খালাকাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ামা বাইনাহুমা ফিছিত্তাতি আইয়্যাম... ।" অর্থাৎ "তিনিই ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ ও পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু। তারপর তিনি আরশে (রাজসিংহাসন) সমাসীন হলেন ।" (আরবি 'য়্যাওমু' শব্দের অর্থ দিন। 'আইয়্যাম', য়্যাওমুর বহুবচন)। ছয় দিনের হিসেবটা কিভাবে করা হলো? আর 'নিরাকার' আল্লাহ সৃষ্টি করে কিভাবে সিংহাসনে আসীন হলেন, বা সৃষ্টির আগে কোথায় ছিলেন? যাহোক, আল্লাহর কারিগরী হাতে সূর্য আগে, না পৃথিবী আগে সৃষ্টি করলেন? কত ঘণ্টা, কতো মিনিটে তখন একদিন হতো? জুপিটার আর ইউরেনাসে কতো ঘণ্টায় দিন হয় মুহাম্মদ কি তা জানতেন? পৃথিবীতে যে সময়ে একদিন অথবা এক বছর হয়, মঙ্গল, বৃহস্পতি কিংবা শনি গ্রহে একই সময়ে কি একদিন অথবা এক বছর হয়? তবে কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে আল্লাহর কতো সময় লাগে, সে হিসেব রাখার জন্যে এক সাথে সূর্য আর পৃথিবীকে সব কিছুর আগেই সৃষ্টি করেছিলেন? "হুয়াল্লাজি জাআলাস্‌সামছা দিয়াআন ওয়াল কামারা নুরান... ।" অর্থাৎ "তিনিই তো সূর্যকে করেছেন উজ্জ্বল তেজস্বী আলোকময় আর চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় ।" (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ৫)। মানেটা হলো কি? আমরা জানি যে চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, চাঁদ যে পৃথিবীর একটা উপগ্রহ মাত্র এবং সূর্যের আলোয় আলোকিত সেটা কি কথিত মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ জানেন না? পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদকে রাতের বেলা দেখে মুহাম্মদ ধরে নিয়েছিলেন, চাঁদেরও আলো আছে! ধরে নেওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ ঐ সময় আরব জনসাধারণের কাছে চাঁদের যে আলো নেই, চাঁদ যে পৃথিবীর একটা উপগ্রহ মাত্র, এ ধরনের পর্যাপ্ত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল না। তাই তো এ ধরনের ভুল নবী-রসুল মুহাম্মদ বারেবারে করেছেন। "তাবারাকাল্লাজি জাআলা ফিছ্‌ছামায়ি বুরুজান ওয়াজাআলা ফিহা ছিরাজান ওয়া কামারাম মুনিরা ।" অর্থাৎ "তিনিই কল্যাণময় যিনি আকাশে তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন একটি প্রজ্জ্বল বাতি (সূর্য) ও দীপ্তিময় চন্দ্র ।" (সুরা ২৫, ফুরকান, আয়াত ৬১)। 'ওয়াল কামারা নুরান' (জ্যোতির্ময় চন্দ্র), 'ওয়া কামারাম মুনিরা' (দীপ্তিময় চন্দ্র)—ওগুলোর মানেটা কি? চৌদ্দশত বছর পূর্বে যে চোখে মুহাম্মদ চাঁদের আলো দেখেছিলেন সে চোখে পৃথিবীরও যে আলো থাকতে পারে তা বুঝতে পারেননি। তাই কোরানের কোথাও 'ওয়া আরদান মুনিরা' (দীপ্তিময় পৃথিবী) বা 'ওয়াল আরদা নুরান' (জ্যোতির্ময় পৃথিবী) লেখা নেই ।[৯০] "আলাম তারা ইলা রাববিকা কাইফা মাদ্দাজ্জিলু... ।" অর্থাৎ "তুমি কি দেখনি, কিভাবে তোমার প্রভু ছায়া বিস্তার করেন? তিনি ইচ্ছে করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক ।" (সুরা ২৫, ফুরকান, আয়াত ৪৫)। আল্লাহ ইচ্ছে করলে সূর্যকে (না ছায়াকে) স্থির রাখতে পারতেন, কিন্তু রাখেননি, এই তো কথা? রাখেননি কেন? যা রাখেননি তা নিয়ে বলার কি আছে? পরের আয়াতে আল্লাহ (নাকি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার শিকার মুহাম্মদ) বলছেন : "ছুম্মা কাবাজনাহু ইলাইনা কাবজান ইয়াছিরা ।" মানে হচ্ছে, "তারপর ধীরে ধীরে একে আমি টেনে নেই আমার নিজের দিকে ।" (সুরা ২৫, ফুরকান, আয়াত ৪৬)। আল্লাহ কাকে টানেন? ছায়াকে টেনে টেনে লম্বা করেন, নাকি সূর্যকে টেনে টেনে কাছে নেন? এ কথার অর্থটা কি দাঁড়ালো? অর্থটা হলো, সকল সময়ের জন্যে সকলকে বোকা বানানো যায় না। ইরানের সুফিবাদী কবি জালাল উদ্দিন রুমি একদা বলেছিলেন : "When you are dealing with children, you must use childish language." ধরে নিতে পারি সম্ভবত আমাদের শেষ গ্রেট প্রফেট মুহাম্মদও আরববাসীদের 'শিশু' ভেবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেহেস্ত, দোজখ, কেয়ামত, জীন, ফেরেশতা, আল্লাহর কাহিনী বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার করে সাজিয়েছিলেন। বোঝা যায়, কেউ কেউ নয়, অনেকেই তাঁর এ ধরনের 'ধার করা' বক্তব্য গোগ্রাসে গিলেছিলেন।

৬

শত বাধা, প্রতিবাদ, প্রশ্নের উত্তরে প্রফেট একই সুরে বলতে থাকলেন, গজব অতিসত্তর এসে পড়বে, কেয়ামত আসন্ন। মুহাম্মদকে মক্কার অবিশ্বাসীরা কবি, মিথ্যেবাদী, উন্মাদ, পাগল বললো, উপহাস, তিরস্কার নির্যাতন, অপমান করলো তবু কিয়ামত হয় না, কোন প্রকার আজাব-গজব আসে না। নবীজি এক কথা বারবার বলতে থাকলেন, নতুন কিছু নেই, নেই কোনো পরিবর্তন। লোকে বললো : মুহাম্মদ, যে ঘটনা আমরা তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল কিতাবে আগেই পড়েছি, তা আর কতো শুনাবে, এবার পুরাতন রেকর্ডটি বদলাও। আল্লাহ বললেন : "ওয়া ইজা তুতলা আলাইহিম আয়াতুনা বায়্যিনাতিন... ।" অর্থাৎ "যখন আমার বাণী তাদের সামনে পাঠ করো, যারা আমার সাথে মোলাকাতের আশা করে না, তারা বলে অন্য কোনো বই নিয়ে এসো, না হয় এটি বদলাও ।" (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ১৫)। নিজেকে আল্লাহর মনোনীত-প্রেরিত পুরুষ হিসেবে কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন দেখাতে ব্যর্থ মুহাম্মদ, কথা বলার কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করলেন। দৃশ্যমান কিছু প্রাকৃতিক বিষয় বস্তুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "আফালা-ইয়াংজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত?' মানে হলো, "তারা কি উটের দিকে চেয়ে দেখে না, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?" (সুরা ৮৮, গা'শিয়া, আয়াত ১৭)। পৃথিবীতে কতো বিচিত্র আকারের সুন্দর পশু-পাখি থাকতে মুহাম্মদ উটের মধ্যে আল্লাহর দক্ষ কারিগরি দেখতে পেলেন! "ওয়া ইলাছছামাই কাইফা রুফিয়াত?" বাংলা হলো : "আর (তারা কি দেখে না) আকাশকে কিভাবে উঁচু

[৯০] আরো দেখুন : Nader Harirchi, *The astronomical error in the Koran*, The Rationalist Society of Australia's Newsletter: *Australian Rationalist*, Number 65, Page 6-7. the internet version can be read at: http://www.rationalist.com.au

করা হয়েছে?" (সুরা ৮৮, গা'শিয়া, আয়াত ১৮)। এই আকাশের কথা বহুবার কোরানে উল্লেখ আছে। আকাশ কিসের সৃষ্টি বা আকাশ বলতে কি আদৌ কোনো জিনিষ আছে? আকাশ সম্পর্কে জানতে হলে বাতাস ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রথমে চিনতে হবে। আকাশ সৃষ্টির তথ্য মুহাম্মদের অজানা ছিল বলেই কোরানে বার বার বলেছেন : "আকাশ বিদীর্ণ হবে, আকাশ থেকে পানীয়-বৃষ্টি বিতরণ করা হয়, আকাশে দূর্গ আছে, আকাশ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, আকাশ একটি মজবুত ছাদ, ওপরে ৭টি আকাশ আছে, তাতে ৭টি দরজা জানালা আছে ইত্যাদি। "ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুছিবাত?" মানে "আর (তারা কি দেখে না) পাহাড়কে কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে?" (সুরা ৮৮, গা'শিয়া, আয়াত ১৯)। বোঝা যাচ্ছে, ভূ-তাত্ত্বিক জ্ঞানও আমাদের প্রফেটের মোটেই ছিল না। পৃথিবীর নদ-নদী পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগরের উৎপত্তি তিনি জানতেন না বলেই কোরান সাক্ষী দিচ্ছে : "আর তিনি পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন (শক্ত খুঁটি হিসেবে) পাছে তোমাদেরকে নিয়ে হেলেদোলে (পৃথিবী) কাঁত হয়ে না যায়, আর তিনি নদ-নদী, রাস্তাঘাট তৈরি করেছেন যেন তোমরা পথ প্রদর্শিত হও।" (সুরা ১৬, নাহ্‌ল, আয়াত ১৫)। বাঁচা গেলো! পাহাড়ের জোরে পৃথিবী আর কাঁত হচ্ছে না! নবী মুহাম্মদের ধারণা ছিল পৃথিবী একটি 'সমতল থালা' বিশেষ, তাই পরিষ্কার করেই বলেছেন, "ওয়া ইলাল আরদি কাইফা ছুতিহাত?" অর্থাৎ—আর (তারা কি দেখে না) দুনিয়াকে কেমন সমতল করে বিছানো হয়েছে? (সুরা ৮৮, গা'শিয়া, আয়াত ২০)। আল্লাহ নদ-নদী, রাস্তঘাট তৈরি করেছেন এর অর্থটা কি? হ্যাঁ, একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, মুহাম্মদ যে রাস্তা পাহাড়ে অথবা সমতল ভূমিতে দেখেছেন, তা তাঁর জন্মের আগে থেকেই তৈরি ছিল, তাই ভেবেছেন ওগুলো আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন! কিন্তু সত্যিই কি তাই? নবী মুহাম্মদ আল্লাহর নাম ভাঙিয়ে বলছেন, "আলাম য়্যারাও ইলাত্‌তাইরি মুছাখ্‌খারাতি...।" মানে—"তারা কি আকাশের শূন্যগর্ভে ভাসমান পাখিদের দেখে না? আল্লাহ ছাড়া ওদের কেউ ধরে রাখে না।" (সুরা ১৬, নাহ্‌ল, আয়াত ৭৯)। নবীজি 'আল্লাহ'র তৈরি পাখি উড়তে দেখেছেন, কিন্তু আধুনিককালের মানুষের রকেট উড়তে দেখেন নাই; রকেটকে কেউ ধরে রাখতে পারে না-ধরে রাখতে হয় না, পৃথিবীর অভিকর্ষ বলকে অতিক্রম করেই মহাশূন্যে পাড়ি দেয়। বাতাস সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে অথবা উড়োজাহাজের যুগে নবী মুহাম্মদের জন্ম হলে মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি এ ধরনের আয়াত কোরানে লিখাতেন না।

আসলেই আকাশ বলতে কোনো জিনিষ নেই। সূর্যের আলোর সাতটি রঙ, যথা : বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন আমরা সূর্যের আলো আমাদের চোখে পৌঁছুবার আগে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় ধুলিকণা বা অণুর সাথে ক্রিয়া করে। বাতাস (ধুলিকণা, গ্যাসীয় অণু) তার ঘনত্বের স্তর বা প্রকারভেদে বিভিন্ন রঙ ধারণ করে। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে আকাশের অনেকাংশ নীল দেখায় কারণ, নীল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, বাকি রঙ (যেমন লাল রঙ) থেকে। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় আকাশের রঙ লাল বা কমলা দেখায় কারণ এ সময় আমাদের দৃষ্টিরেখা থেকে নীল রঙ বিক্ষিপ্তভাবে দূরে ছড়িয়ে থাকে। জলের ধর্মও তা-ই। সুতরাং সন্ধ্যা ও প্রভাতের আকাশ দেখে, আকাশের রঙ কি লাল, কি নীল এ প্রশ্ন অবান্তর। তবে বলা যায় আকাশ কোনো অদৃশ্য কিছু নয়, বরং আকাশ দেখা যায়। সহজভাবে বলতে গেলে, সূর্যের আলো + বাতাসের কণিকাসমূহ = আকাশ। এক কথায়, যেখানে সূর্যের আলো ও বাতাস নেই, সেখানে আকাশ নেই আর যেখানে মানুষ ও মাটি নেই সেখানে পথঘাটও নেই। এই সাধারণ জ্ঞানটুকু ষষ্ঠ শতাব্দীর কিছু মানুষের অজানা থাকার কারণে প্রফেট মুহাম্মদ কিছু মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমাদের প্রফেট মুহাম্মদ নীল আকাশ দেখেছিলেন, নীল চাঁদ দেখেননি। পৃথিবী থেকে নীল চাঁদ দেখা যায় না। তবে কেউ যদি দয়া করে দশবর্গ মাইলের একটি বাতাসভর্তি কাঁচের বাক্স চাঁদের ওপর ভাঙতে পারেন, তাহলে ক্ষণিকের জন্য হলেও পৃথিবীর মানুষ একটি নীল চাঁদ দেখতে পাবে।

(ইসলামি) আকাশ সাতটি আর সত্তরটি একই কথা! গোপালভাড়ের আকাশের তারা গণনার মতো; কিংবা রাষ্ট্রের কাকের সংখ্যা, নয় কোটি নয় লক্ষ নয় হাজার নয়'শো নিরান্নব্বই! ভৌগলিক জ্ঞান একেবারে শুণ্যের কোঠায় না থাকলে কেউ কী বলতে পারে : "তারা কি দেখে না আমি সাতটি আসমান ও সাতটি জমিন সৃষ্টি করেছি?" (সুরা ৭১, নুহ্‌, আয়াত ১৫; সুরা ৬৫, তালাক, আয়াত ১২)।

এরপর প্রফেট মুহাম্মদ মক্কাবাসীকে 'মানুষ' সৃষ্টির কথা শুনালেন। এখানেও একেকবার একেক কথা। কখনো বললেন, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে নাপাক পানি থেকে, কখনো ক্ষিপ্ত বেগে বেরিয়ে আসা বীর্য থেকে, কখনো রক্তপিণ্ড থেকে, কখনো আওয়াজকারী কাঁদা মাটি থেকে, আবার এমনি মাটি থেকে, আবার কখনো কোনো কিছু নেই থেকে। (দ্রষ্টব্য : সুরা ২৪, নুর, আয়াত ৪৫; সুরা ২৫, ফুরকান, আয়ত ৫৪; সুরা ১৫, হিজর, আয়াত ২৬; সুরা ৩০, রুম, আয়াত ২০; সুরা ৯৬, আলাক, আয়াত ২; সুরা ১৯, মরিয়ম, আয়াত ৬৭)। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এতোগুলো উপাদান থেকে এতো উপায়ে মানুষ সৃষ্টির কথা বলার পর যখন বলা হয় 'কিছুই ছিল না থেকে' মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন সেটা কি পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য হয়ে যায় না? বিষয়টি পাঠকদের ভেবে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। যাহোক, মজার বিষয় হচ্ছে আজ-কালকার প্রফেট-গুণগ্রাহীরা ঐসব 'আধো-আধো বোল'-এর মধ্যে খোঁজ পেয়ে যান 'বিজ্ঞান', 'লেটেস্ট ইনফরমেশন', দুনিয়ার 'সকল সমস্যার সমাধান'! প্রফেট-গুণগ্রাহীদের চর্বিত চর্বণ শুনতে শুনতে ইদানীং কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। গোঁজামিলের তো সীমা থাকা উচিৎ। আচ্ছা, কোরান শরিফ থেকে কি একটি আয়াত দেখানো সম্ভব যা মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়? জানি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক মুসলমানই বিব্রত বোধ করবেন। সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোরানের আয়াতের সাথে (সৌদি রাজপরিবারের ভাড়াটে ফরাসি ডাক্তার) 'মরিস বুকাইলি' কৌশলে আধুনিক বিজ্ঞানের

আবিষ্কারগুলোর সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করবেন। কোরানকে 'বিজ্ঞানসম্মত' করার জন্য দরদী মুসলমানদের দৌড়ঝাঁপ দেখলে মনে হয় : 'এ দুনিয়াতে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের আগে কোনো বিষয়ে বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল না; ৬১০ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসে হঠাৎ একদিন মক্কার হেরা পাহাড়ের গুহাতে ফেরশতা জিবরাইল আল্লাহর কাছ থেকে দুনিয়াদারি সম্পর্কে একদম সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ জ্ঞান নিয়ে হাজির এবং এরপরই সারা দুনিয়ার আমজনতা সেটা জানতে পেরেছে।' মানুষের হাজার হাজার বছরের সামাজিক চেতনা আর ধীর লয়ে এগিয়ে যাওয়া কঠোর পরিশ্রমী বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে গিয়ে, অস্বীকার করে হঠাৎ করে ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে রচিত কোনো গ্রন্থকে এভাবে 'বিজ্ঞানসম্মত' প্রমাণ করতে চাইলে অবশ্যই বিভ্রান্তি আর ভুল তথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। এছাড়া এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। আর এই বিভ্রান্তি কোন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ছড়ানো হয়ে থাকে সামান্য পরিসরে হলেও পূর্বে আলোচনা করেছি, বিধায় এখানে আর উল্লেখ করলাম না। এরপরও যারা ষষ্ঠ শতাব্দীর কোরানের আয়াতের আধুনিক ব্যাখ্যা গুঁজে দিয়ে বিজ্ঞানের কাধে ভর করে অলৌকিক প্রমাণ করতে চান, তাদের উদ্দেশ্যেই বলি দয়া করে এ ধরনের দাবির আগে জর্জ সার্টন অথবা জে. ডি. বার্নালের বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে লেখা বই দুটি পাঠ করে দেখতে পারেন। বিজ্ঞান উড়ে এসে জুড়ে বসা কোনো বিষয় নয়। হাজার হাজার মানুষের হাজার বছরের জিজ্ঞাসু মনের উত্তর খুঁজে বের করার তাগিদ থেকে অমানুষিক পরিশ্রম আর প্রতি পদে পদে 'ভুল' থেকে শিক্ষা নিয়ে গড়ে ওঠেছে আধুনিককালের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই দীর্ঘদিনের পরিশ্রমলব্ধ ইতিহাস কষ্ট করে জানতে যারা আগ্রহী নন, শুধুমাত্র জেনে নিন আমাদের মহানবী জন্মের কত বছর আগে মিশরীয়রা চান্দ্র-বর্ষপঞ্জি তৈরি করেছে? কিভাবে করেছে? তারা কি ঐশীবাণীর মাধ্যমে এটি তৈরি করেছে? কিংবা কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল? মোটেই না। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে নীল নদের তীরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেছে মিশরীয় সভ্যতা। কৃষির প্রয়োজনেই মানুষ বন্যার পূর্বাভাস জানতে চেয়েছে, জানতে চেয়েছে কখন তাদের নদীর তীরের চাষের জমি পলিতে ভরে যাবে। মানুষের এ জানার আগ্রহ আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন থেকে গড়ে ওঠে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা। কিন্তু তৎকালীন মানুষ 'ভুল' করে চাঁদের অবস্থান নিরীক্ষণ করে তাদের বর্ষপঞ্জি তৈরি করে। চাঁদ যে শুধুমাত্র পৃথিবীর একটা উপগ্রহ মাত্র তা মিশরীয়রা বুঝতে পারেনি। দিগন্তে চাঁদ এবং সূর্যের ওঠা ও ডোবা দেখে অতীতকালের বেশিরভাগ মানুষ ঠাউরে ছিল চাঁদ ও সূর্য দুই-ই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। তাদের বর্ষপঞ্জি ১২ মাসে বিভক্ত। প্রতিটি মাস ছিল ঊনত্রিশ দিনের। সেই মতে বছরে দিনের সংখ্যা ছিল ৩৫৪টি। এ কারণে বছরে বাকি ১১দিন সময়ে সময়ে বিভিন্ন মাসের সঙ্গে যুক্ত করতে হতো। অথচ মজার বিষয় আজ থেকে প্রায় কয়েক হাজার বছর আগে মিশরীয়দের 'ভুল'ভাবে তৈরি করা চান্দ্র-বর্ষপঞ্জি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে এসে আরববাসী ইসলাম ধর্মের ধর্মগুরু থেকে শুরু করে আজকের (২০০৯ সালের) পৃথিবীর নানা প্রান্তের কোটি কোটি অনুগত মুসলমানরা অনুসরণ করে থাকেন। চাঁদ দিয়ে বছর গণনা করা ভুল জেনেও আজকের একবিংশ শতকেও অনেক ঈমানদাররা চান্দ্র-পঞ্জিকা ছাড়তে পারেননি। মানুষ আসলেই অভ্যাস, প্রথা আর ঐতিহ্যের দাস![৯১] জীবন যখন সরল ছিল, তখন না হয় বছরে এগারো দিন এমন কিছু না! কিন্তু আজকের যুগে? আবদুল মতিন খানের ভাষায় বলতে হয় : "ভুল দেখে নিজেকে শুধরিয়ে নেয়াটাই আধুনিকতা। যিনি যত দ্রুত নিজের ভুল শোধরাতে পারেন তিনি তত আধুনিক। নিজ থেকে নয়ই অন্যে ধরিয়ে দিলেও যে শোধরায় না সে হলো সেকেলে।" যাহোক, আজকে যে সৌর ক্যালেন্ডার আমরা ব্যবহার করে থাকি তা ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল; তবে তার অনেক আগে রোমান সভ্যতার যুগে সম্রাট জুলিয়াস সিজার (৪৬ খ্রিস্টপূর্বে ক্ষমতায় আসেন) মোটামুটি শুদ্ধ সৌরবর্ষপঞ্জি তৈরি করতে পেরেছিলেন কিন্তু সেটাও সর্বশক্তিমান-সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহতায়ালা মরুবাসী নবীজিকে বলে দিতে পারেননি! এখানে উল্লেখ করা ভালো মিশরীয়রা কিন্তু চান্দ্র-বর্ষপঞ্জির দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি; তারাও চেষ্টাটেষ্টা করে প্রায় ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বের দিকে চান্দ্র বর্ষপঞ্জির পাশাপাশি একটা সৌর বর্ষপঞ্জি তৈরি করেছিল, ব্যবহার করছিল দীর্ঘদিন কিন্তু পরবর্তীতে সুমেরিয় ও মেসোপটেমিয়ার উত্তরসূরিরা চাঁদের প্রতি এতোই অনুরক্ত ছিল যে সৌরক্যালেন্ডার ব্যবহার তাদের মনঃপূত হয়নি।[৯২] এবং এরই ধারাবাহিকতায় আরববাসীর কাছে সূর্যবর্ষপঞ্জির চেয়ে চান্দ্র-বর্ষপঞ্জি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেকের হয়তো জানা আছে আমাদের পাশের দেশ চীনও সেই খ্রিস্টপূর্ব ২৩৬০ সালের দিকে সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে ৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরু করে দিয়েছিল। এতো গেল পৃথিবীর আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতির হিসাব, আবার রোমান সভ্যতায় জ্যোতির্বিদ পসিত্তোনিয়াস (আনুমানিক ১৩৫-৫১ খ্রিস্টপূর্ব) '*On thed Ocean*' গ্রন্থে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার কারণ হিসেবে সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণকে চিহ্নিত করেছিলেন। তাহলে আমরা কি ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞানখোঁজাদের জিজ্ঞেস করতে পারি মিশরীয়রা, চীনরা, গ্রিকরা কিংবা রোমানরা কোন 'আল্লাহর' ওহি থেকে এগুলো জানতে পেরেছে? না-কী যুগে যুগে জ্ঞান-সাধকদের নিরলস চর্চা, অনুসন্ধিৎসু মনের বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ-বিশ্লেণের দ্বারাই মানুষ ধীরে ধীরে তার জানার বৃত্তটাকে বড় করতে পেরেছে; ওখানে কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের কুদরতি কেরামতি নেই। বলে রাখা ভালো, মিশরীয়, সুমেরিয়, চৈনিক, গ্রিক, রোমান সভ্যতার সব বৈজ্ঞানিক তথ্যই নির্ভুল ছিল, এমনটা আমি মোটেই বলছি না বা দাবি করছি না বরং বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার একটি সাধারণ নিয়মের মধ্যেই ওই সকল সভ্যতার বেশিরভাগ পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য নানা সময়ে সংশোধন-পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে। গ্রিক দর্শনের আদি জনক থেলিস (খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪-৫৫০) বলেছিলেন, পানিই সেই আদি সত্তা, যা থেকে সমস্ত বস্তুর উদ্ভব।

[৯১] আবদুল মতিন খান, *চিন্তাচেতনার শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ*, আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা ১৪১০ (১৫ অক্টোবর ২০০৩), বিজ্ঞানচেতনা পরিষদ, শাহবাগ, ঢাকা।

[৯২] জে. ডি. বার্নাল, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), *ইতিহাসে বিজ্ঞান*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৭৩।

আয়োনিয় সভ্যতার বস্তুবাদী দার্শনিক এ্যানাক্সাগোরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০-৪২৮) সূর্যপূজার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, সূর্য কোনো দেবতা নয়, বরং একটি বিশাল অগ্নিপিণ্ড মাত্র। গ্রিকরা যে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণার বাইরে এসে সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা করলো, সেটা কিভাবে? নবী মুহাম্মদের মতো তো তাদেরও টেলিস্কোপ, স্যাটেলাইট বা অন্য কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না, বরং বলতে পারি মহানবী মুহাম্মদের সময়কাল থেকে তারা তো অনেক অনেক ব্যাকডেটেড ছিল। এতো গেল শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা, অন্যদিকে 'কোরানে বিজ্ঞান খোঁজাদের' আবিষ্কারের বিপক্ষে আমরা দর্শন, গণিত, চিকিৎসা, রসায়ন-পদার্থ-জীববিজ্ঞান, স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের যাবতীয় শাখা থেকে এ ধরনের শতশত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি। মজার বিষয় এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোকে পাশ কাটিয়ে কিংবা এড়িয়ে গিয়ে, বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে অস্বীকার করে অতি উৎসাহী কতিপয় প্রফেট-গুণগ্রাহীরা কোরানে 'বিজ্ঞানের' উপস্থিতি দেখাতে গিয়ে কত যে 'চাপা মারেন' আর কত যে 'চাপা দিয়ে থাকেন' তার কোনো ইয়াত্তা নেই। উদাহরণের জন্য কোরানের একটি আয়াতকে 'এসিড টেস্ট' হিসেবে বেছে নেই। কিছুদিন আগে শোনা গেল দুবাইয়ের একটি মেডিকেল স্কুল নাকি তাদের কারিকুলামে 'ইসলামি চিকিৎসা বিজ্ঞান' নামক একটি বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করেছে; কারণ দুবাইর মেডিকেলের কারিকুলাম ব্যবস্থাপকেরা মক্কায় 'নাজিলকৃত' কোরান শরিফের ২৩নং সুরা মুমিনুনের ১২-১৪নং আয়াতে আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য খুঁজে পেয়েছেন, যা প্রফেট মুহাম্মদের সময়কালীন (ষষ্ঠ শতাব্দী) মানুষের মোটেও জানা ছিল না! কোরান শরিফে এই ধরনের বক্তব্য থাকা মানে এটি নিশ্চয়ই কোরান শরিফের মোজেজা! অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞান বা ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে যাদের মোটামুটি জ্ঞান আছে, তারা কোরান শরিফের এই আয়াতটি বারে বারে পাঠ করেও কোরানের মোজেজার পক্ষে কোনো যুৎসই যুক্তি খুঁজে পাননি; বরং কোরানের আয়াতে প্রদত্ত বক্তব্যকে ভুল হিসেবেই মনে হয়েছে। ব্যাখ্যা চান তো, একটু অপেক্ষা করুন। প্রথমে আয়াত তিনটি কয়েকজন খ্যাতনামা অনুবাদকের অনুবাদ থেকে ভালো করে দেখে নিই :

> "ওয়ালাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসানা মিন সুলালাতিম মিন ত্বি-ন। ছুম্মা জাআ'লনাহু নুৎফাতান ফি ক্বারারিম মাকি-ন। ছুম্মা খালাক্বনান নুৎফাতা আ'লাক্বাতান ফাখালাক্বনাল আ'লাক্বাতা মুদগাতান ফাখালাক্বনাল মুদগাতা ইজামান ফাকাছাওনাল ইজামা লাহমান ছুম্মা আনশাহ্নাহু খালাক্বান আখার, ফাতাবারাকাল্লাহু আহ্ছানুল খালিক্বিন।" অর্থাৎ "আমি তো মানুষকে মাটির উপাদানে সৃষ্টি করেছি, এরপর আমি তাকে নিরাপদ স্থানে (জরায়ুতে) বীর্যের কণারূপে (নুৎফা) স্থাপন করি, তারপর আমি বীর্যকে জমাট রক্তে (আলাকা) পরিণত করি, তারপর জমাট রক্তকে আমি মাংসপিণ্ডে (মুদগাহ) পরিণত করি, সেই মাংসকে হাড় বানাই। অতঃপর হাড় সকলের উপর মাংস পরাইয়া দিলাম। তৎপর প্রাণসঞ্চার করে অন্যভাবে সৃষ্টি করে দিলাম।" (সুরা ২৩, মুমিনুন, আয়াত ১২-১৪)।[৯৩]
>
> "আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে রাখি, পরে আমি শুক্রকে করি জমাট রক্ত, তারপর জমাট রক্তকে করি এক চর্বিতপ্রতিম মাংসপিণ্ড, আর চর্বিত-প্রতিম মাংসপিণ্ডকে করি অস্থিপঞ্জর। তারপর অস্থিপঞ্জরকে মাংস দিয়ে ঢেকে দিই, শেষে তাকে আর-এক রূপ দিই। নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান!" (সুরা ২৩, মুমিনুন, আয়াত ১২-১৪)।[৯৪]
>
> Man We did create from a quintessence (of clay); Then We placed him as (a drop of) sperm in a place of rest, firmly fixed; Then We made the sperm into a clot of congealed blood; then of that clot We made a (foetus) lump; then we made out of that lump bones and clothed the bones with flesh; then we developed out of it another creature. So blessed be Allah, the best to create! (23:12-14, Translated by YUSUFALI)[৯৫]
>
> Verily We created man from a product of wet earth; Then placed him as a drop (of seed) in a safe lodging; Then fashioned We the drop a clot, then fashioned We the clot a little lump, then fashioned We the little lump bones, then clothed the bones with flesh, and then produced it as another creation. So blessed be Allah, the Best of creators! (23:12-14, Translated by PICKTHAL)

বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী অনুবাদকগণ এই আয়াতে আরবি 'নুৎফা' শব্দটিকে 'বীর্য' বলে অনুবাদ করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখি কোনো কোনো অনুবাদকগণ 'ভাষার মারপ্যাঁচে' বীর্যকে সরাসরি 'শুক্র' বানিয়ে দিয়েছেন ('শুক্র' আনুবীক্ষণিক এবং ১৬৭৯ সালে বীর্যের মধ্যে শুক্রের অস্তিত্ব প্রথম পর্যবেক্ষণ এবং চিহ্নিত করেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক এন্টনি ভান লিয়েনহুক; তাই আমরা স্পষ্ট করেই বলতে চাই প্রফেট মুহাম্মদের সময়কালে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মানুষের 'শুক্র' সম্পর্কে ধারণা থাকা সম্ভব নয় এবং ঐ সময়ের আরবি ভাষাতে বীর্য শব্দটি প্রচলিত থাকলেও 'শুক্র' শব্দটি থাকা সম্ভব নয়)। এভাবে কেউবা আরবি 'মুদগাহ' শব্দের অর্থ

[৯৩] *কোরআন শরীফ*, অধ্যক্ষ আলী হায়দার অনূদিত, ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৬৯।

[৯৪] *কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ*, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (অনুবাদক), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭।

[৯৫] আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/

পরিবর্তন করে 'মাংসপিণ্ডে'র বদলে 'ভ্রূণ' (Fetus) লিখেছেন। কিন্তু আফসোসের কথা অনুবাদের মাধ্যমে আয়াতের শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটিয়েও অনুবাদকগণ তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারেননি। যেমন, শুধু পুরুষের বীর্য বা শুক্র থেকেই সন্তান হয় না। যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে নিক্ষিপ্ত বীর্যের 'শুক্রাণু' নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করলেই কি ভ্রূণ উৎপন্ন হতে পারে? মোটেই না। নারীর ডিম্বাণুর ভূমিকার কথা কিন্তু কোরানে বলা হয়নি? কারণ প্রাচীনকালের অর্থাৎ প্রফেট মুহাম্মদের সময়কালীন মানুষের ধারণা বা বিশ্বাস ছিল পুরুষের বীর্যই সন্তান উৎপাদনকারী; সেখানে নারীর ভূমিকা উর্বর শষ্যক্ষেত্রের মতো। কোরানেও সেই প্রাচীন ধারণার প্রতিফলন রয়েছে। (সুরা বাকারা ২২৩নং আয়াত তুলনীয়)। যদিও বর্তমানকালের অনুবাদকেরা এ বিষয়টিও ধরতে পারেননি। ধরে নিচ্ছি সকল অনুবাদকই কোরান শরিফকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'বিজ্ঞানসম্মত' প্রমাণ করতে চাননি। তাঁদের সে ইচ্ছা বা ধারণাও ছিল না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোরানকে 'ঐশীত্ব' প্রমাণের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য, অনুবাদকেরা অথবা ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজা 'ছদ্মবিজ্ঞানীরা' কোরানের এই গ্যাপটা ফিল আপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। যাহোক, ভ্রূণের মধ্যে জমাট রক্ত, জমাট মাংসপিণ্ড আছে এগুলো বলার জন্য ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হয় না। গর্ভপাতের ফলে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন পর্যায়ের ভ্রূণের সরল পর্যবেক্ষণ হতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জন্য এটা জানা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ গ্রিক দার্শনিক-বিজ্ঞানী এরিস্টটলের কথা বলতে পারি। কোরান রচনা বা প্রফেট মুহাম্মদের জন্মের প্রায় আটশত বছর আগে এরিস্টটল নিজে মুরগির ২১টি ডিম পর্যবেক্ষণ করে মুরগির ভ্রূণের ক্রমবিকাশ বুঝতে চেষ্টা করেন এবং '*On the Generation of Animals*' গ্রন্থে ভ্রূণের বিকাশের ধাপগুলোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন (যদিও সেখানে আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের দৃষ্টিতে অনেক ভুল-ত্রটি রয়েছে)। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর ভ্রূণ যে এভাবেই ক্রমান্বয়ে বড় হয় এরিস্টটল তা জানতেন। আর আজকালকার মুসলিম বুজুর্গরা অস্বীকার করতে পারবেন না, ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই আরবদের সাথে প্রাচীন গ্রিসের বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় ছিল। যাহোক, কোরানের উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় যে ভ্রূণের মধ্যে হাড়-মাংস ইত্যাদি সংযোজনের পর প্রাণসঞ্চারের কথা বলা হচ্ছে। অথচ আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞানের ভাষ্য হচ্ছে, এককোষী অবস্থা (Zygote) থেকেই ভ্রূণ জীবন্ত-সপ্রাণ অবস্থায় থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকশিত হবার পর নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয় না। আর হাড় সৃষ্টির পর মাংস সৃষ্টি হয়, এ কথাও ঠিক নয়, বরং এগুলো এককোষী অবস্থা থেকে বহুকোষী অবস্থায় একই সাথে ক্রমবিকশিত হতে থাকে।[৯৬] (দ্রষ্টব্য : *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার*, পৃষ্ঠা ২৫)। আবার কোরান শরিফে দেখি বলা হয়েছে :

> "Now let man but think from what he is created! He is created from a drop emitted—Proceedings from between the backbone and the ribs." (Translated by YUSUFALI) মানুষ বোঝার চেষ্টা করুক কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বেগবান পানি হতে, যাহা পিঠ (মেরুদণ্ড) ও পাঁজরের অস্থিসমূহ হতে বাহির হয়। (সুরা ৮৬, তারিক, আয়াত ৫-৭)।

এই আয়াত দুটির পিছনে যুক্তি দেখানো হয় যেহেতু ভ্রূণ অবস্থায় শুক্রাশয় (Testis) পিঠের (মেরুদণ্ড) কাছাকাছি থাকে এবং পরে তা অণ্ডকোষের থলিতে (Scrotum) নেমে আসে অতএব 'পিঠের ও বক্ষের (পাঁজর) অস্থিসমূহ' বলতে শুক্রাশয় বোঝানো হয়েছে। একে আসলে 'যুক্তি' না বলে 'অপযুক্তি' বলাই ভালো। কারণ শুক্রাশয় যখন ভ্রূণাবস্থায় মেরুদণ্ড বা পিঠের ঐ অংশের কাছাকাছি থাকে তখন সে বীর্য বা শুক্র উৎপাদন করতে পারে না। শুক্রাশয় যথাস্থানে (অণ্ডকোষের থলিতে) নেমে আসার পরই কেবল শুক্র বা বীর্য উৎপাদন করতে পারে এবং তা হয় ছেলেদের বয়সন্ধিতে (Puberty) পৌঁছানোর পর। যদি শুক্রাশয় কোনো কারণে অণ্ডকোষের থলিতে নেমে আসতে ব্যর্থ হয় (মাঝে মাঝে এ ধরনের সমস্যা হয়, যাকে Undescended testis বলে) তাহলে ঐ শুক্রাশয়ে আর শুক্র উৎপাদিত হয় না। (দ্রষ্টব্য : *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার*, পৃষ্ঠা ২১)।

কোরানের এক জায়গায় আল্লাহ বললেন : "ইন্নামা-আমরুহু...কুন ফায়্যাকুন", অর্থাৎ আল্লাহর কোনোকিছু সৃষ্টির ইচ্ছে হলে শুধু বলেন 'কুন', ব্যস হয়ে যায়। (সুরা ৩৬, ইয়াসিন, আয়াত ৮২)। দারুন ম্যাজিক! কিন্তু দুনিয়াকে কেন 'দারুল ইসলাম' বানাতে এবং মানুষকে আল্লাহর অনুগত করতে স্বয়ং নবী এবং তাঁর বান্দাদের তরবারি হাতে যুদ্ধের ময়দানে নামতে হয়? এখানে কি আল্লাহ 'কুন' বলতে পারেন না? 'কুন' বললেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়! যাহোক, কোরানের অন্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে আল্লাহর সময় লেগেছে পুরো ছয় দিন। প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র দেখিয়ে মুহাম্মদ প্রমাণ করতে চাইলেন ওসব আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্টিতে আরববাসীর কোনো অবজেকশন ছিল না। এই আল্লাহ তাদেরই আল্লাহ, যার উপাসনা করে আসছে তারা বিভিন্ন মূর্তি-পাথর, দেব-দেবীরূপে আবিষ্কার করে মুহাম্মদের জন্মের বহু আগে থেকেই। অবজেকশনটা হলো, মুহাম্মদ যে সেই আল্লাহর নবী তার প্রমাণ চাই। এতো কিছু বলা, এতো কিছু দেখানোর পরও এরা অলৌকিক (সাধারণ লোকের অসাধ্য) প্রমাণ বা নিদর্শন ছাড়া মুহাম্মদকে নবী বলে মানতে রাজি নয়; তাই উপায় বের করতেই হবে। মক্কাবাসীরা বলতে লাগলো এসব সেকেলে পৌরাণিক কাহিনী। আসলে এগুলি তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কিতাবেরই কথা; খ্রিস্টান-ইহুদি ধর্মের বিজ্ঞ কবি-সাহিত্যিক ও ধর্মগুরুরা 'কোরানের আয়াত' রচনা করতে মুহাম্মদকে সহায়তা করছে, তাঁকে (মুহাম্মদ) সকাল-সন্ধ্যা নুহা-আব্রাহাম-মুসা-যিশুর কাহিনী পাঠ করে শোনানো হয়। স্বাভাবিকভাবে এর জবাবে কোরানের আয়াত তৈরি হল : "অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। সে

[৯৬] বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন : http://www.bible.ca/islam/islam-myths-embryology.htm

(মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' ওরা তো সীমালঙ্ঘন করে ও মিথ্যা বলে। ওরা বলে, 'এগুলো তো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।" (সুরা ২৫, ফুরকান, আয়াত ৪-৫)। মুহাম্মদ তৌরাত-জবুর-ইঞ্জিল শরিফের বাণী কার কাছ থেকে জেনেছিলেন, কোরানে প্রবেশ করিয়েছিলেন, আর কারা সম্পাদনা করেছিলেন কোরান, তা আরবের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। মক্কাতে আবদিয়াস বেন সালোম নামে একজন বিজ্ঞ রাব্বীর (ইহুদি ধর্মগুরু) সাথে মুহাম্মদের বন্ধুভাব ছিল। ঐ রাব্বী তাঁকে (মুহাম্মদ) ইহুদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শোনাতেন, ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতেন; যেগুলো পরে মুহাম্মদের কোরান প্রণয়নের সময় কাজে লেগেছিল। তফসিরকারক আব্বাসী ও জালালায়েনের মতে, এই রাব্বী পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নূতন নাম 'আবদুল্লাহ ইবন সালোম' রাখেন। ধারণা করা হয়, ৪৬নং সুরা আহ্কাফের ৮নং আয়াতে 'সাক্ষী' হিসেবে এই ইহুদি রাব্বীর কথাই বলা হচ্ছে। এমনকি হিজরতের পর প্রথম দিকে মদিনাতে যখন ইহুদিদের সাথে সদ্ভাব ছিল তখন তিনি প্রায়ই সেখানকার ইহুদিদের উপাসনালয় 'সিনাগগ'-এ উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শুনতেন। (দ্রষ্টব্য : *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, পৃষ্ঠা ১৯৪ এবং *A Dictionary of Islam*, page 193)। যাহোক, মুহাম্মদ এসব অস্বীকার করে সহজেই একটি কৌশল বের করে ফেললেন। 'আল্লাহর নামে' আরববাসীর প্রতি ভীষণ শক্ত একটি চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে দিলেন : "আম য়্যাকুলু-নাফতারাহু কুল ফা'তু বি আ'শরি ছুয়ারিম মিছলিহি...ইন কুনতুম ছাদিক্বিন", বাংলা হচ্ছে : "তারা কি বলে সে (মুহাম্মদ) এ কোরান বানিয়েছে? বলো, তাহলে এর মতো দশটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে খুশি তাকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সুরা ১১, হুদ, আয়াত ১৩)। আবার "এই কোরান এমন নয় যে আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ রচনা করতে পারে, ...তারা কি বলে সে (মুহাম্মদ) এ কোরান রচনা করেছে? বলো, তবে এর মতো এক সুরা আনো...।" (সুরা ১০, ইউনুস, আয়াত ৩৭-৩৮)।

৭

এবার কবিতার মালজোড়া প্রতিযোগিতা হবে, আল্লাহ বনাম মানুষ। আল্লাহ (মুহাম্মদ) এই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তার মক্কি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে। তখন তিনি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন, কাজটা ঠিক হলো কি-না। মদিনায় এসে বুঝতে পারলেন তার চ্যালেঞ্জ করা ভুল হয়নি। আল্লাহ বলেন : "ওয়া ইজা তুত্লা আলাইহিম আয়াতুনা কালুকাদ্ সামিনা লাওনাশাউ লাকুলনা মিছলাহাজা ইনহাজা ইল্লা আছাতিরুল আউওয়ালিন।" মানে হচ্ছে, "আর যখন তাদের কাছে আমার বাণী পড়ে শুনানো হয়, তারা বলে—আমরা এর আগেই শুনেছি, আমরাও ইচ্ছে করলে এর মতো বলতে পারি। এ তো পুরাকালের উপকথা বৈ কিছু নয়।" (সুরা ৮, আনফাল, আয়াত ৩১)। 'এর মতো দশটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো' বলে মুহাম্মদ এখানে যা বলেছিলেন তা হলো, ইংরেজি 'আই ডোন্ট নো'-এর আরবি কি বলো? কোরানের অনুরূপ কিছু লিখলে তৌরাত, জবুর, বাইবেল হয়, আর তৌরাত, জবুর, বাইবেলে যা আছে তা-ই কোরান! (দেখুন সুরা ৮৭, আ'লা, আয়াত ১৮-১৯)। সুতরাং তালগাছ সব সময়ই আমাদের প্রফেট মুহাম্মদের। পারস্য দেশ ভ্রমণকারী কোরায়েশ গোত্রের বিখ্যাত সাহিত্যিক-গায়ক-চারণকবি নাদির বিন আল-হারিস (কিছুকাল আল-হিরার লাখমিদ রাজার দরবারের রাজকবি ছিলেন) মুহাম্মদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। উল্লেখ্য, পারস্য ছিল তখন শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-মানে, শিল্পকলায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মেষপালক-পুরোহিত মক্কাবাসীর চেয়ে অনেক উন্নত। পারসিয়ানদের প্রতি চিরদিনই প্রফেট মুহাম্মদের তীব্র হিংসা ছিল। কবি নাদির 'ফেরদৌসি' নামে সুন্দর একটি কবিতা লিখে এক গণজমায়েতে পাঠ করে শুনালেন। তিনি প্রায়ই গর্ব করে বলতেন কোরানে যেভাবে আদ-সামুদ-লুত-নুহ-সাবা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কাহিনী বলা হয়েছে, তার থেকে অনেক আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সুন্দর করে রুস্তম, ইসফানদার প্রমুখ পারস্য সম্রাটের কাহিনী তিনি বলতে পারেন। মক্কাবাসীরা কবি নাদিরের গান-কবিতা-বক্তব্য আগ্রহ নিয়ে-মনযোগ দিয়ে শুনতো। মুহাম্মদ কবিকে তার হটলিস্টে রাখলেন; কারণ আরবের এই জনপ্রিয় কবি নাদিরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে তিনি বিব্রত-চিন্তিত। কোরানের আয়াত নিয়ে এসে বললেন : "মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ অজ্ঞ লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয় ও আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে। ওদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন ওদের কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন ওরা দেমাকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা এ শুনতে পায়নি, যেন ওদের কান দুটো বধির। সুতরাং ওদের নিদারুণ শাস্তির সংবাদ দাও।" (সুরা ৩১, লুকমান, আয়াত ৬-৭)। কৌশলগত কারণে শুধু হুমকি প্রদান করে নবীজি তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকলেন। কপাল ভালোই বলতে হয় আমাদের নবীজির, বছর দুয়েক যেতে না যেতে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও গেলেন। মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে কবি নাদির বিন হারিস বন্দী হলে নবীর আদেশে চতুর্থ খলিফা হযরত আলি বিন আবু তালিব তরবারি দিয়ে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেন (দ্রষ্টব্য : *The History of al-Tabari*, Translated by McDonald & Watt, vol. VII, page 65); যথারীতি কবি নাদির বিন হারিসকে হত্যা করার কিছু আগে কোরানের আয়াত তৈরি হল : "তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা।' এ তো সত্য নয়, ওদের কৃতকর্ম ওদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে। সেদিন ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তারপর ওরা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর বলা হবে, এ-ই সেই যা তোমরা অস্বীকার করতে।" (সুরা ৮৩, মুতাফ্ফিফিন, আয়াত ১৩-১৭)। মক্কায় থাকতে নিজের রাজনৈতিক-

অর্থনৈতিক-লোকবল না থাকার দরুন আমাদের নবীকে বাধ্য হয়ে শুনতে হয়েছিল : 'আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বাদ দিয়ে দেব?' (সুরা ৩৭, সাফ্‌ফাত, আয়াত ৩৬); জবাবে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' করে বলা হয়েছিল, এ কোনো কবির রচনা নয়, যদিও তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। (সুরা ৬৯, হাক্‌কা, আয়াত ৪১)। কবিরা বিভ্রান্ত, কবিরা লক্ষ্যহীনভাবে উপত্যকায় ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়, ওদের কথাবার্তার ঠিক-ঠিকানা নেই। (সুরা ২৬, শোআরা, আয়াত ২২৪-২২৬)। কিন্তু মদিনায় এসে নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ পূরণ করার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পেয়ে-আদায় করে এবার কি বিভ্রান্তদের 'সঠিক পথে' আনতে, লক্ষ্যহীনকে 'লক্ষ্যবদ্ধ' করতে, 'উচিৎ শিক্ষা' দেবার সুযোগ হাতছাড়া করা যায়? অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন 'ধূর্ত' রাজনীতিবিদ আমাদের প্রফেট এবং তাঁর সাহাবিরা ভালোই জানতেন-বুঝতেন 'রতনে রতন চেনে...'। তিনি এবং কতিপয় দক্ষ-অনুগত কবি-সাহাবি দ্বারা রচিত, কথিত আল্লাহর ওহি 'কোরান' সম্পর্কে জনগণের সামনে যে কোনো মুহূর্তে 'গুমোর ফাঁস' কিংবা 'হাটে হাড়ি ভেঙে' দিতে পারে একমাত্র মক্কা-মদিনার কবিরাই; সেটা পারবে না অন্য কোনো রাজনীতিবিদ, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী কিংবা কাবা ঘর, চার্চ বা সিনাগগের কোনো পুরোহিত। আরব জাতির ইতিহাস থেকে দেখতে পাই মরুর বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে অদৃশ্য বন্ধন গড়ে তুলেছিল আরবের কবিতা। প্রাক-ইসলামি যুগের কবিরা আমজনতার জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ্যভাবে অবলোকন করে রচনা করতেন মরু জীবনের সুখ-দুঃখ, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাহস, বিশ্বস্ততার মহিমা, আতিথিয়েতা, আত্মত্যাগ, দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, নারীদের প্রতি মুক্ত প্রেম-ভালোবাসা, মদ পানের আনন্দ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে। আরবের লোকজনের কাছে কবির মর্যাদা অন্য অনেকের চেয়ে বেশি, অনেক বেশি শ্রদ্ধার-সম্মানের। অনেক কবিই আরবের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিচরণ করতেন, মানুষের দ্বারা সংবর্ধিত হতেন, মানুষেরা তাঁদের কাছ থেকে কবিতাগাথা শুনতে ভালোবাসতো। কোনো আরব পরিবারে কবি এসে উপস্থিত হলে ঐ বাড়িতে ভূরিভোজনের সাথে সাথে প্রতিবেশী মহিলারা বাজনা বাজিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে কবিকে বরণ করে নিত, কারণ বাড়িতে কবির পদধূলি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। আশেপাশের প্রতিবেশীরা মিলে উৎসবের আয়োজন করতো। অনেকেই মনে করতো কবিরা হলো ভাবালু, খেয়ালি, তারা ম্যাজিক জানে। লোকেরা কাউকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য কবির সাহায্য প্রার্থনা করতো, এমন কি শান্তি ও মঙ্গল প্রার্থনার সময়ে। সেকালে মরুবাসী আরবেরা তিনক্ষেত্রে বড় করে আনন্দোৎসব করতো; যথা এক, কবিকে সামনে পেলে, দুই, পুত্রসন্তানের জন্ম হলে, তিন, ঘোটকীর (স্ত্রী ঘোড়া) বাচ্চা প্রসব হলে। তাদের অত্যন্ত প্রচলিত লোকবাণী হচ্ছে, কবিদের বাণী মরুর উপর দিয়ে দিয়ে তীরের চেয়ে দ্রুত বেগে উড়ে বেড়ায়। ইসলামপূর্ব আরবে নিয়মিত কবিতা প্রতিযোগিতা হতো, সাথে তর্ক-বির্তক, তাৎক্ষণিকভাবে রচিত কবিতা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো। ইসলাম যতোই নিজের কর্মকাণ্ডকে 'ন্যায্যতা' দানের জন্য আগের যুগকে 'আইয়াম জাহেলিয়াত' (বর্বরতার যুগ) বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুক না কেন, ইতিহাসে পাই ঐ সময় সেখানে যথেষ্ট মুক্তচিন্তার পরিবেশ বিরাজ করছিল। দক্ষিণের নাজরান শহর, মক্কার কাছের মাজনাতে, আরাফাত পাহাড়ের নীচে ধুউল মাজাজে কবিতা মেলা হতো; তবে সবচেয়ে বড়ো ও আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা হতো মক্কার পূর্বে নাখালা উপত্যকার পাশে বাণিজ্য নগরী 'ওকাজ'-এ। ধু-আল-কাদা মাসে সাতদিনব্যাপী (ভিন্নমতে বিশদিন) ওকাজে বিশাল মেলার আয়োজন করা হতো; বলা বাহুল্য এ মাসে আরববাসীর কাছে হত্যা-মারামারি-হানাহানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ওকাজের মেলা সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদবাক্য হচ্ছে, 'ওকাজ আজকে যা বলে, সারা আরবে আগামীকাল তার পুনরাবৃত্তি হয়।' এই ওকাজের মেলা আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোত্র, বহু ধর্মের মানুষের সমন্বয়শীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ; সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মিলন মেলা। মুক্ত আলোচনা, যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক, জনপ্রিয় কবিদের 'কাসিদা' (গীতিকবিতা) প্রতিযোগিতা ছিলো মেলার (সাহিত্য সম্মেলন) অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। স্বাভাবিকভাবেই এই সাহিত্য সম্মেলনের ফলাফল সারা আরব পেনিনসুলার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো। এখানে এসে কবিতা পাঠ করা কবিদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার, জীবনের আরাধ্য একটি বিষয়। বিজয়ী কবিতাকে পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে পর্দার কাপড়ে লিখে কাবা ঘরসহ আরো দেব-দেবীর মন্দিরের দেওয়ালে টানিয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল ঐ সময়। আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েসসহ আমর ইবনে কুলসুম, তারাফা, অন্তরা, নাবিঘা, জুহাইর, আশা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিদের মোয়াল্লাকাত বা ঝুলন্ত কবিতা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে কাবা ঘরের দেওয়ালকে অলংকৃত করেছে। এমন কী প্রফেটের অন্যতম 'ওহি' লেখক আরবের বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন রাবিয়া ইবনে জাফর আল-আমিরির কবিতাও এই তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। তাই নবীজির কাছে কবিদের চেয়ে বড় শত্রু তো আর কেউ হয় না। (৬৩০ সালে) মক্কা দখলের পর তো দেখি নবীজি সুযোগ পেয়েই আরবের 'অলিম্পিক' হিসেবে পরিচিত সুদীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা ওকাজের মেলাসহ অন্যান্য কবিতা উৎসব বন্ধ করে দেন। (৬২৪ সালে বদর যুদ্ধের পর) প্রফেট মুহাম্মদ মদিনার অঘোষিত সম্রাট হয়ে গেছেন। David Samuel Margoliouth-এর ভাষায় : "He bacame a captain of bandit." (*Mohammed and The Rise of Islam*, Page 63)। তাঁর সমালোচনা কোনোভাবেই আর বরদাশ্‌ত যোগ্য নয়। ঘোষণা করলেন : "আল্লাহ আর তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে ও তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে ছুড়ে ফেলে দেবেন, সেখানে সে থাকবে চিরকাল; আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।" (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ১৪)। নিজের রাজনৈতিক অভিলাষ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করতে হলে প্রথমে কোরানকে 'আল্লাহর বাণী' এবং তিনি শেষ 'নবী' বা 'রসুল' হিসেবে আরববাসীর মস্তিষ্কে চিরতরে গেঁথে দিতে হবে; এজন্য অবশ্যই 'বিয়ের প্রথম রাতেই বিড়াল মারা' শুরু করতে হবে। তাই হটলিস্ট তৈরি করে 'আল্লাহ-রসুলের মনে আঘাত দেওয়ার' অভিযোগ তুলে আরবের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিককে 'সাইজ' করার সিদ্ধান্ত নিলেন।[৯৭] এরই ধারাবাহিকতায় কবি

[৯৭] প্রফেট যে শুধু তাঁর বিরোধিতাকারী কবিদেরই তুলোধোনা করেছিলেন তা নয়, গান-বাজনার প্রতিও তিনি প্রচণ্ড বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন।

নাদিরের মতো আরেক কবি উকবা বিন আবু মুয়াতও হন পরবর্তী টার্গেট। মার্চ মাসে বদরের যুদ্ধে (৬২৪ খ্রিস্টাব্দে) আবু মুয়াত বন্দী হন। এই কবি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ মক্কায় থাকাকালীন তিনি নাকি মুহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে 'উত্তেজক' কবিতা রচনা করেছিলেন। নবীর জীবনীকার ইবন ইসহাক জানিয়েছেন, নবী মুহাম্মদ যখন কবি আবু মুয়াতকে হত্যা করতে আদেশ দেন, তখন কবি নবীর কাছে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে জানতে চান, আমি মারা গেলে আমার সন্তানদের কে দেখাশোনা করবে? নবী উত্তর দিলেন, দোজখ! সঙ্গে সঙ্গে নবীর এক অনুসারী তরবারি দিয়ে উকবা বিন আবু মুয়াতের ধড় থেকে মস্তক বিছিন্ন করে দেয়। (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩৮, বুক নম্বর ১৯ নম্বর ৪৪২১, ৪৪২২ এবং Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, page 308)। নবীজি এই পরিষ্কার ঠাণ্ডামাথায় হত্যাযজ্ঞ যথারীতি 'আল্লাহর দোহাই' দিয়ে ঐশীনির্দেশ হিসেবে চালিয়ে দিলেন : "It has not been for any prophet to take captives until he has slaughtered in the land." দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রুনিপাত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবীর পক্ষে সমীচীন নয়। (সুরা ৮, আনফাল, আয়াত ৬৭)।

বদর যুদ্ধের আশাতীত, অকল্পনীয় সাফল্য মুহাম্মদের জন্যে সারা আরব বিশ্বকে তাঁর পদানত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। বদর যুদ্ধের পর থেকে মুহাম্মদ হয়ে গেলেন নবীর মুখোশ পরা এক 'স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়ক'। সুতরাং তিনি (মুহাম্মদ), যারা তাঁর সমালোচনা করেছিল, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মতের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল অথবা আগামীতে করতে পারে বলে তাঁর মনের মধ্যে সন্দেহ ছিল এমন বেশ কিছু লোককে গুপ্তহত্যার উদ্যোগ নিলেন। গুপ্তহত্যার তালিকায় ছিলেন মদিনার বিভিন্ন গোত্র-নেতা, আর বেশির ভাগই কবি-সাহিত্যিক। আমরা রাজনীতি আর ক্ষমতা দখলের ইতিহাস থেকে দেখেছি, যুগে যুগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসকদের জন্য গুপ্তহত্যা সহজ এবং অতি পরিচিত একটি পথ। যার মাধ্যমে শত্রু নিধন করে ক্ষমতার রাস্তা পরিষ্কার ও টেকসই করা যায়। এই পন্থায় অতি তাড়াতাড়ি শত্রু নিধন হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্তব্দ করা হয়, বিরোধেরও অবসান হয়। আমাদের প্রফেট মুহাম্মদও সেই পথে হেঁটেছেন নানা সময়ে। প্রফেট মুহাম্মদ এবং তাঁর সাহাবি কর্তৃক নৃশংসভাবে সকল হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে এখানে দেয়া সম্ভব নয়। হাদিস এবং অন্যান্য ইসলামিক সূত্র থেকে এরকম সামান্য কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, যা অবশ্যই 'শান্তি'র ধর্ম ইসলামের রসুল মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সংঘটিত 'সহনশীলতা' আর 'শান্তি কায়েমের' হিমশৈলের শীর্ষাংশ মাত্র!

কবিরা কি ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারেন? সম্ভবত! বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ফলেই সাধারণ মানুষ থেকে একটু সহজেই তাঁরা বুঝতে পারেন, ধারণা করতে পারেন একজন উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? বদর যুদ্ধের পরই মক্কা-মদিনার বেশিরভাগ অমুসলিম কবিই এক বাক্যে ইসলামের নবী মুহাম্মদের বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁদের কাছে নবীজির স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেছে, মক্কা এবং মদিনার জন্য আশু বিপদ অপেক্ষা করছে এটা তাদের কবিতার মাধ্যমে মক্কা-মদিনার অধিবাসীদের বুঝাতে লাগলেন। বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে মক্কার নাম না-জানা এক কবি ব্যথিত চিত্তে লিখেন :

সম্মান রাখতে তারা (বদরে মৃত কোরায়েশরা) দিল প্রাণ
আগন্তুকের কাছে স্বজনকে তারা করেনি দান।
তোমাদের তো নতুন বন্ধু এখন 'গাসসান'[৯৮]!
তারা নতুন বন্ধু খোঁজে না মক্কায়,
বরং বলে, কি নির্লজ্জ এরা, হায়!
রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা বড় অপরাধ
ন্যায্যবিচারে তোমরাই পাবে না রেয়াত। (দ্রষ্টব্য : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ১৭৮)।

তাঁর সময়ে আরবের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারসহ বিদেশি সঙ্গীতের বেশ প্রভাব ছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হতো চারচৌকা খঞ্জনি (দাফ), সানাই, 'নে' নামের কাঠের তৈরি লম্বা বাঁশি। প্রাক-ইসলামি যুগের বেশিরভাগ কবিই তাদের রচনাগুলি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে প্রচার করতেন, যা নবীজির কাছে চরম বিরক্তিকর ছিল। নবীজি একবার গানের বাজনাকে 'শয়তানের মুয়াজ্জিন' বলে ঘোষণা করেন। কারণ মুয়াজ্জিনের মতো ওই যন্ত্রও নাকি মানুষকে শয়তানের উপাসনা করতে আহ্বান করে। তাই তো পনেরশত বছর ধরে অধিকাংশ মুসলিম আইন-বিশেষজ্ঞ, ধর্মতাত্ত্বিক, আলেম-ওলামা গান-বাজনার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। কেউ কেউ তো বাজনা শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। আরবদেশে একটি পরিচিত প্রবাদবাক্য হচ্ছে : 'মদ হল দেহ, গান হল আত্মা এবং আনন্দ হল তাদের কাচ্চা-বাচ্চা।' (দ্রষ্টব্য : *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ২৫৬)। বাংলাদেশেসহ সারা বিশ্বের ইসলামি মৌলবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কেন সবসময় থিয়েটার, পথনাটক, যাত্রা, সিনেমা, কনসার্ট ইত্যাদি সৃষ্টিশীল শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার প্রতি খড়গহস্ত, এবং এগুলোর সাথে জড়িতদের কথায়-কথায় 'কাফের-মুরতাদ' ঘোষণা করে তার একটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে নবী মুহাম্মদের জীবনাচরণ অতিমাত্রায় অন্ধভাবে অনুসরণ করা।

[৯৮] সম্ভবত 'গাসসান' শব্দটি দিয়ে দক্ষিণ আরবের এক উপজাতীয় বংশের কথা বলা হচ্ছে। এই উপজাতির প্রাক্তন প্রধান আমর জাইকিয়া ইব্ন-আমির মা-আল-সামা। গাসসানদের একটি অংশ মদিনায় দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল আর একটি অংশ সিরিয়াতে। (দ্রষ্টব্য : ফিলিপ. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৭২-৭৫ এবং *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৫৬।

মদিনার ইহুদি কবি আসমা বিনতে মারোয়ান বদর যুদ্ধের পরপরই 'ইসলাম' নিয়ে মুহাম্মদের মনোভাব বুঝতে পেরে মদিনাবাসীকে হুঁশিয়ার করে কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারলেন : "যে ব্যক্তি ধর্মের নাম ভাঙিয়ে স্বজাতি-স্বগোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে, তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে পারে; সে হয়তো এতোদিন মদিনাবাসীর আশ্রয়ে থেকে-খেয়েও কিছুদিন পর যেকোনো উছিলায় মদিনাবাসীকেই হত্যা করবে। মদিনাবাসীর ওপর ছড়ি ঘোরাবে।" আসমা মদিনার ইহুদি বনি খাতমা গোত্রের অধিবাসী; তাঁর স্বামীর নাম ইয়াজিদ বিন জায়েদ এবং পাঁচটি সন্তান নিয়ে তাঁদের সংসার। আসমা বিনতে মারোয়ান কবিতা লিখে ইসলাম, মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের আচরণের নিন্দা জানাতেন পাশপাশি মুহাম্মদ সম্পর্কে মদিনাবসীর নিঃস্পৃহ ভূমিকারও কঠোর উপহাস করতেন। আরবি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত আসমা বিনতে মারোয়ানের এরকম একটি কবিতা নিম্নে তুলে ধরা হল :

I despise Banu Malik and al-Nabit
And Auws and Banu al-Khazraj.
You obey a stranger who is none of yours,
Who is not of Murad or Madhhij.
Do you expect good from him after the killing of your chiefs
Like a hungry man waiting for a cook's broth?
Is there no man of pride who would attack him by surprise
And cut off the hopes of those who expect aught from him?

মুহাম্মদ তাঁর মিশনের প্রথম দিকে ইহুদি রীতি অনুসরণ করে হিব্রু শব্দ 'নাবী' (Nabit) ব্যবহার করতেন, পরবর্তীতে ইহুদিদের সাথে বিরোধ বাঁধলে 'নাবী' বা নবী শব্দটি ত্যাগ করে আরবি শব্দ 'রসুল' ব্যবহার করতে শুরু করেন। (*ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, পৃষ্ঠা ১৯৪, ১৯৭)। এই কবিতায় উল্লেখিত বানু মালিক, আউস, বানু আল-খাজরাজ, মুরাদ, মাদ্‌হিজ ইত্যাদি মদিনার বিভিন্ন গোত্রের নাম, যারা নানাভাবে মুহাম্মদ এবং মক্কা থেকে আসা তাঁর অনুসারীদের সহযোগিতা করতো। এই গোত্রভুক্ত লোকেরা 'আনসার' হিসেবে পরিচিত ছিল। উল্লেখ্য নবীজির মদিনাতে হিজরতের আগে থেকে বানু আউস এবং বানু খাজরাজের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী তিক্ত সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। কবিতাটি শুনতে পেয়ে মুহাম্মদ খুবই ক্ষিপ্ত হলেন। আসমা বিনতে মারোয়ানের কবিতার জবাবে প্রফেট মুহাম্মদের নিয়োগকৃত অফিসিয়াল কবি হাসান বিন থাবিত আরেকটি কবিতা লেখেন। নিম্নে সেই কবিতাটিও (আরবি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত) তুলে ধরা হল :

Banu Wa'il and Banu Waqif and Banu Khatma
Are inferior to Banu al-Khazraj.
When she called for folly woe to her in her weeping,
For death is coming.
She stirred up a man of glorious origin,
Noble in his going out and in his coming in.
Before midnight he dyed her in her blood
And incurred no guilt thereby.

কবিতার জবাবে কবিতা লেখে উত্তর দেওয়ার কৌশলে নবী মুহাম্মদ এখন আর সন্তুষ্ট নন।[৯৯] কবি আসমা বিনতে মারোয়ানকে চিরতরে নিশ্চুপ করে দেওয়ার জন্য মদিনার 'মুকুটহীন সম্রাট' মহানবী মুহাম্মদ ঘোষণা দিলেন : কে আছ? এই মারোয়ান কন্যাকে হত্যা করতে পারবে? সঙ্গে সঙ্গে উমায়ের বিন আদিয়া আল-খাতমি নামের নব্য-মুসলমান হাত তুললেন। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের (মার্চ মাস), রমজান মাসের ২৫ তারিখের রাত্রিতে আসমার বাড়িতে চুপিসারে প্রবেশ করে উমায়ের বিন আদিয়া। সেখানে পাঁচ শিশু সন্ত

[৯৯] অবশ্য আমরা হাদিস থেকে দেখতে পাই, তিনি নিজেই মদিনার ইহুদি গোত্র বানু কোরাইজাকে ব্যঙ্গ করে আক্রমণাত্মক ভাষায় কবিতা লেখার জন্য অফিসিয়াল কবি হাসান বিন থাবিতকে নির্দেশ দেন। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৪৪৯)। এবং প্রফেট মুহাম্মদের জীবনীকারক ইবনে ইসহাক জানিয়েছেন তখন প্রফেট ইহুদিদের 'বানরের ভাই' বলেও গালিগালাজ করতে লাগলেন। (দ্রষ্টব্য : Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad*, page 461-62)।

ানসহ শয্যায় শায়িত আসমাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করেন উমায়ের। পরের দিন ভোরে ফজরের নামাজে আসমার মৃত্যুর সংবাদ শুনে মুহাম্মদ খুবই উল্লাসিত হলেন এবং উমায়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। এই ঘটনার পরপরই বানু খাতমা গোত্রের সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কারণ তারা ইতোমধ্যে ইসলামের জোর দেখতে পেয়েছে। (দ্রষ্টব্য : Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad*, page 675-676)। কারো কারো ভাস্য মতে মার্চ মাসে কবি আসমা বিনতে মারোয়ানকে হত্যার পর এপ্রিল মাসে একশত বছরের বৃদ্ধ কবি আবু আফাকে হত্যা করা হয় মুহাম্মদের আদেশে। কারণ, তাঁর অপরাধ তিনিও নাকি ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লিখে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতেন। বদর যুদ্ধের আগে কবি আবু আফাককে নবীজি একবার কবিতা আর না-লেখার জন্য সাবধান করে দেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরই ঘোষণা দেন, কে এই বদমায়েশটাকে হত্যা করতে পারবে? সলিম বিন উমায়ের নামের আরেক সাচ্চা ঈমানদার নবীর ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে গেলেন এবং তরবারি দিয়ে আবু আফাককে হত্যা করেন। (দ্রষ্টব্য : Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad*, page 995)। (কোনো কোনো ইসলাম গবেষক বলছেন, বদর যুদ্ধের পর মার্চ মাসে কবি আফাককে হত্যা করা হয় এবং এই হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন আসমা বিনতে মারোয়ান। তাই কবি আফাক হত্যার প্রতিবাদস্বরূপ আসমা একটি কবিতা রচনা করেন, যে কারণে তাঁকে (আসমাকে) মুহাম্মদের আদেশে হত্যা করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, আগে আসমা বিনতে মারোয়ানকে হত্যা করা হয়েছিল, পরে বৃদ্ধ কবি আবু আফাককে। যাই হোক, এই দুই হত্যাকাণ্ড 'কার আগে কে' হয়েছে এ নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত না নিতে পারলেও, এটা নিশ্চিত যে, তাঁদের উভয়কেই স্যাটায়ারধর্মী কবিতা লেখার অপরাধে নবী মুহাম্মদের আদেশে হত্যা করা হয়েছিল।) বৃদ্ধ কবি আবু আফাকের পর টার্গেট হলেন মদিনার ইহুদি কবি কাব বিন আল-আশরাফ। কবি আশরাফের পিতা তাঈ গোত্রের এবং তাঁর মা ইহুদি নাদির গোত্রের। মক্কাবাসীর সাথে মদিনার এই কবির ভালো সম্পর্ক ছিল, তাই বদর যুদ্ধে কয়েকজন পরিচিত মক্কাবাসীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা লিখলেন। কবিতাটি তিনি মক্কাতে প্রচার করেন কিন্তু খবরটি কোনোভাবে নবীর কানে পৌঁছে যায়। কিছুদিন পর সেপ্টেম্বর মাসে (৬২৪ সালে) কাব যখন 'বোকার মতো' মদিনাতে ফিরে এলেন, এরপর? এর পরের ঘটনা আমরা হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহর (রাঃ) কাছ থেকেই জেনে নিই : "আল্লাহর রসুল (দঃ) বললেন, কে পারবে কাব বিন আল-আশরাফকে হত্যা করতে, যে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের মনে আঘাত দিয়েছে? মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, হে আল্লাহর রসুল (দঃ), আপনি আমাকে অনুমতি দেন, আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? রসুল বললেন, হ্যাঁ অনুমতি দেওয়া হল। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, তাকে খুন করতে যদি মিথ্যা বলা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়, আমি কি তা করতে পারবো? রসুল বললেন, হ্যাঁ তুমি তা করতে পারো। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা দুজন সঙ্গী (আবু বিন জবর আল-হারিস বিন আউস এবং আব্বাদ বিন বশির) নিয়ে কাব বিন আল-আশরাফের কাছে গিয়ে বললেন, ঐ মানুষটি (নবী মুহাম্মদ) আমাদের কাছে কর (ট্যাক্স) দাবি করছে, সে আমাদেরকে বড়ই জ্বালাতন করছে। কাব বললেন, আল্লাহর কসম ঐ লোকটির উপদ্রবে তোমাদের জীবন অতীষ্ঠ হয়ে ওঠবে। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, যেহেতু তাকে (নবী মুহাম্মদকে) আমরা মেনে নিয়েছি, তাই সহজে ছেড়ে আসতে পারি না, আমরা এখন দেখার অপেক্ষায় আছি কোন পথে কিভাবে তার ধ্বংস হয়। আমরা এসেছি তোমার কাছে, তুমি যদি এক বোঝা খাদ্য কর্জ দিয়ে সাহায্য করো। কাব বিন আল-আশরাফ বললেন, ঠিক আছে, তবে তোমাদের কোনো কিছু আমার কাছে বন্ধক রাখতে হবে। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, কি দিতে হবে বলো? কাব বিন আল-আশরাফ বললেন, তোমাদের নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখতে পারো। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা এবং তাঁর সঙ্গীরা জবাব দিল, তা কিভাবে? তুমি তো এই আরবের একজন বিখ্যাত সুপুরুষ। কাব বললেন, তাহলে তোমার সন্তানদের? মাছলামা এবং তাঁর সঙ্গীরা বললেন, তা কিভাবে হয়? লোকেরা আমাদের কি বলবে? সামান্য কিছু খাদ্যের জন্য নিজের সন্তান পর্যন্ত বন্ধক রেখে দিলে? বরং আমরা আমাদের অস্ত্র তোমার কাছে জামানত রাখবো। কাব বিন আল-আশরাফ রাজি হলেন। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা যাবার আগে বললেন, আমরা আগামীকাল আসবো। পরেরদিন গভীর রাতে তারা আসলেন। পথিমধ্যে মুহাম্মদ বিন্ মাছলামা তার সঙ্গীদেরকে বললেন, আমি যখন কাবের মাথায় দুহাতে চেপে ধরবো তখনি তোমারা তাকে আক্রমণ করবে। কাব ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, এতো গভীর রাতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কাব বললেন, কোথাও না? আমার বন্ধুরা এসেছে একটু সাহায্য চায়। কাব বিন আল-আশরাফকে দেখে মুহাম্মদ বিন-মাছলামা বললেন, কি দারুন মিষ্টি সুগন্ধ তোমার চুলে, আমি কি একটু শুঁকে দেখতে পারি? সহাস্য মুখে গর্বিত কণ্ঠে কাব বললেন, আরব দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী আমার ঘরে, তাই। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা চুলের সুগন্ধ শুঁকার ভান করে চুলসহ কাবের মাথা শক্ত করে দুহাতে চেপে ধরেন। সাথে-সাথেই সঙ্গীদ্বয় দুদিক থেকে কাবের দুবাহু বরাবর তরবারি ঢুকিয়ে দেয়। তারপর মুহাম্মদ বিন-মাছলামা, কাব বিন আল-আশরাফের মস্তক কেটে নবীর পায়ের কাছে নিয়ে রাখলেন।" (ঈষৎ সংক্ষেপিত)। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৩৬৯ এবং *Why I am not a muslim*, Page 94-95)। আচ্ছা, আল্লাহর মনে সত্যি কি আঘাত লেগেছিল? নিরাকার আল্লাহর মন তাহলে আছে?

ইবন ইশহাকের বর্ণনানুযায়ী, কিনান বিন আল-রাবীকে নবীজির কাছে নিয়ে আসা হলো, যার হস্তগত ছিল বনু আন-নাদিরের কিছু সম্পদ। আল্লাহর রসুল (দঃ) ঐ সম্পদের ব্যাপারে কিনানকে জিজ্ঞেস করলেন। কিনান বললো, সে কিছুই জানে না। তারপর সাক্ষী হিসেবে একজন লোককে ডেকে আনা হলো। সাক্ষী (আসলে গুপ্তচর-লেখক) বললো যে, সে কিনানকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিদিন ঘুরাফেরা করতে দেখেছে। নবীজি বললেন, হে কিনান, যদি ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটির মাটির নীচে সম্পদ পাওয়া যায় তাহলে আমি তোমাকে খুন করবো। আল্লাহর রসুল (দঃ) ঐ জায়গার মাটি খোঁড়ার আদেশ করলেন। মাটির নীচে কিছু সম্পদ পাওয়া

গেলো। নবীজি বললেন, কিনান বাকি সম্পদ কোথায় বলো। কিনান উত্তর দিলো, আমি বলবো না। নবীজি তাঁর সাহাবিদেরকে বললেন, কিনানকে চরম যন্ত্রণাদায়ক, নিষ্ঠুরতম নির্যাতন করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সকল সম্পদ বের করে না দেয়। নবীজির আদেশ পেয়ে সাহাবি হজরত আল-জুবায়ের (রাঃ) জ্বলন্ত অগ্নিকাঠি দিয়ে কিনানের বুকে আঘাত করতে থাকেন। নির্যাতনের এক পর্যায়ে কিনানের যখন মৃতপ্রায় অবস্থা, নবীজি তাকে হজরত মুহাম্মদ বিন-মাছলামার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এবার তোমার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নাও। মুহাম্মদ বিন-মাছলামা কিনানের মস্তক কেটে দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন।[১০০]

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে খন্দকের যুদ্ধের পর নবী তাঁর দশ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মদিনার বানু কোরাইজা গোত্রকে পঁচিশ দিন অবরোধ করে রাখার পর দখল করে নেন। ইহুদি বানু কোরায়েজ গোত্রের লোকেরা তাঁদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে নির্বাসনে চলে যেতে রাজি হয় কিন্তু নবী মুহাম্মদ এভাবে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। তিনি বলেন, তাঁরা এক শর্তে বাঁচতে পারে, যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হয়। জানা যায় মাত্র একজন এই শর্ত মেনে নেয়। তাহলে যারা নবীর নির্দেশ মেনে নেয়নি, তাদের কি হলো? হজরত আবু সাঈদ আল্ কুদরী থেকে বর্ণীত : বন্দী কোরাইজা গোত্রের লোকজন সাহাবি হজরত সাদ ইবন মুয়াদের (আউস গোত্রের) রায় মেনে নিবেন বলে রাজি হলেন। রসুল মুহাম্মদ (দঃ) হজরত সা'দকে আসতে খবর পাঠালেন। সাদ একটি গাধায় চড়ে আসলেন। তিনি যখন মসজিদের নিকটে আসলেন, আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ মদিনার আনসারগণকে দাঁড়িয়ে সাদ এর প্রতি সম্মান দেখাতে বললেন। নবীজি হজরত সা'দকে বললেন, "কোরাইজা গোত্রের এই লোকজন তোমার দেয়া রায় গ্রহণ করবে বলে সম্মতি জানিয়েছে।" সাদ রায় দিলেন, "এদের সকল পুরুষকে মেরে ফেলা হউক এবং সকল নারী ও শিশুদেরকে দখলকৃত গনিমতের মাল হিসেবে গ্রহণ করা হউক।" মুহাম্মদ (দঃ) বললেন, "তুমি রায় দিয়েছো আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী।" (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৪৪৭)। সাদের গাধায় চড়ে আসা, তাঁকে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো এবং তাঁর রায় কি নবী মুহাম্মদের পূর্ব পরিকল্পিত নয়? সাদ নবীজির উগ্রবাদী-চরমপন্থী গ্রুপের অন্যতম সদস্য। বানু কোরাইজরা অনেক আগে থেকেই সাদ ইবন মুয়াদের চক্ষুশূল ছিল। তাছাড়া অবরোধ চলাকালীন সময়ে সাদ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। বানু কোরাইজ গোত্রের আটশ'র অধিক বন্দীকে হত্যা করার জন্য শহরের বাজারে খাল কাটা হয়েছিল। প্রত্যেক বন্দীর হাত পেছনে বেঁধে খালের ধারে নিয়ে পাঁচজনের গ্রুপ করে গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করা হয়। সারা দিন, সারা রাত ধরে বাতি জ্বালিয়ে চলে গণহত্যাকাণ্ড। এই নিষ্ঠুর, বিভৎস গণহত্যা সম্পর্কে ইসলাম এবং মুহাম্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল লেখকরাও বলেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চলাকালীন নাৎসি বাহিনীর নিষ্ঠুরতাকেও হার মানায়।[১০১] কোরাইজ গোত্রের ম্যাসাকারকে নবী চিরাচরিত ধারায় আল্লাহর আয়াত দিয়ে ঐশ্বরিক নির্দেশ বলে ঘোষণা করলেন : "কিতাবিদের মধ্যে যারা (ইহুদি বানু কোরাইজরা) ওদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি দুর্গ থেকে নামতে বাধ্য করলেন। তোমরা ওদের কিছুকে খতম করেছিলে ও কিছু বন্দী করেছিলে। আর তিনি তোমাদেরকে ওদের জায়গাজমি, ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী করলেন, আর উত্তরাধিকারী করলেন এমন এক দেশের যেখানে তোমরা এখনও পা দাও নি।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ২৬-২৭)। বানু কোরাইজ গোত্রের হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পর সাদ ইবন মুয়াদ মারা যান পূর্বের জখমের কারণে। মহানবী জানালেন সাদের মৃত্যুর জন্য নাকি আল্লাহর সিংহাসন আকাশে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল!

হজরত আবু জিনাদ থেকে বর্ণীত, আল্লাহর রসুল (দঃ) যখন ঐ লোকদের হাত-পা কেটে ফেল্লেন যারা তাঁর (নবীর) উট চুরি করেছিল এবং আগুনে পোড়া বর্শা-ফলক দিয়ে তাদের চক্ষু উপড়ে ফেল্লেন, আল্লাহ নবীজির উপর রাগান্বিত হলেন। (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ৩৮, নম্বর ৪৩৫৭)। সাবাস! আগুনে পোড়া বর্শা-ফলক দিয়ে তাদের চক্ষু উপড়ে ফেলার পরে আল্লাহ বুঝতে পারলেন, সামান্য উট চুরির শাস্তি হিসেবে হাত-পা কেটে চোখ উপড়ে ফেলা সঠিক নয়! এ সম্পর্কে *A Dictionary of Islam* থেকে জানা যায় : "the Prophet ordered their hands and their feet to be cut off as a punishment for theft, and their eyes to be pulled out. But the Prophet did not stop the bleeding, and they died." And in another it reads, "The Prophet ordered hot irons to be drawn across their eyes, and then to be cast on the plain of al-Madinah; and when they asked for water it was not given them, and they died."[১০২]

হজরত আলি (রাঃ) থেকে বর্ণীত, একজন ইহুদি রমণী প্রায়ই আল্লাহর রসুল মুহাম্মদকে (দঃ) ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো। একজন লোক ঐ মহিলার গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে টানতে থাকেন যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। নবীজি ঘোষণা দিলেন, "ঐ মহিলার জীবনের কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে না।" (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ৩৮, নম্বর ৪৩৪৯)।

[১০০] Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *The History of Al-Tabari*, Translated by Michael Fishbein, State University of New York Press (SUNY), N.Y., USA, Vol 8, Page 122.

[১০১] Karen Armstrong, *Muhammad: a Western Attempt to Understand Islam*, London, 1991, page 207.

[১০২] Thomas Patrick Hughes, *A Dictionary of Islam*, W.H. Allen & CO Publications, London, 1895, Page 64.

৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মক্কা দখলের পরও প্রফেট মুহাম্মদ আবারও কয়েকজন নির্বাচিত ব্যক্তিকে গোপনে হত্যার জন্য তালিকা প্রস্তুত করেন; কারণ মুহাম্মদের (দঃ) সন্দেহ ছিলো এরা একদিন তাঁর 'নবীত্ব' ও 'ইসলাম ধর্ম'কে মিথ্যা প্রমাণিত করে ফেলবে। এদের মধ্যে কয়েকজন মক্কার প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য, কেউ পেশাদার কবি-সাহিত্যিক, আবার কেউবা ক্রীতদাস। প্রফেটের গুপ্তহত্যার নির্বাচিত তালিকায় ১০ জন লোক ছিলেন তাদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী। নারীদের মধ্যে হলেন, (১) হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিন উতবা, (২) সারা (আমর ইবনে হাশিমের 'মুক্তদাসী'), (৩) ফারতানাহ্, (৪) কারিবাহ, আর পুরুষদের মধ্যে হলেন (৫) ইকরিমা বিন আবি জাহ্ল, (৬) হাব্বার ইবনে আল-আসওয়াদ, (৭) আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্ (কোরান লেখক ও পরবর্তীতে মিসরের গভর্নর), (৮) মিকাস ইবনে সাবাবা আল-লায়থি, (৯) আব্দুল্লাহ ইবনে হিলাল ইবনে খাতাল আল-আদ্রমি ও (১০) আল হুরায়েস ইবনে নুকায়েদ বিন ওহাব। (দ্রষ্টব্য : Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 'The Life of Muhammad', (translated in English by A. Guillaume), Oxford University Press, London, 1955, 2004, Page 136, 163, 181, 262, 308)। নারীদের মধ্যে ফারতানাহ্ ও কারিবাহ (তাঁরা উভয়েই আব্দুল্লাহ ইবনে হিলাল ইবনে খাতালের ক্রীতদাসী ছিলেন) প্রফেটের বিরুদ্ধে বেশ আগে 'স্যাটেয়ারধর্মী' গান গাওয়ার অভিযোগে হত্যার নির্দেশ দিলে একজনকে হত্যা করা হয়, আরেক জন দৌড়ে গিয়ে মুহাম্মদের পায়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চাইলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোরায়েশ বংশের অন্যতম উমাইয়া গোত্র নেতা হযরত আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের পর অস্ত্রের মুখে বাধ্য হয়ে 'ইসলাম' গ্রহণ করলে তাঁর স্ত্রী হিন্দা বিন উতবাকে খুন করানো থেকে বিরত থাকেন প্রফেট মুহাম্মদ।[+] অবশ্য মক্কা বিজয়ের কিছু আগে ৬২৮ সালের দিকে মক্কার একজন পেশাদার খুনি আমর ইবনে উমাইয়াকে নিয়োগ করেন প্রফেটের প্রধান শত্রু হযরত আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু খুনি আমর ইবন উমাইয়া বেশ কয়েকবার চক্রান্ত করেও হত্যা করতে ব্যর্থ হয়, শেষমেশ আবু সুফিয়ানের পরিচিত মক্কার তিনজন লোক খুন করে এবং একজনকে ধরে নিয়ে যায় মদিনাতে প্রফেট মুহাম্মদের কাছে। বানু আব্দুল মোত্তালেবের আমর বিন হাশেমের 'মুক্ত দাসী' সারা না-কী বিভিন্ন সময়ে প্রফেটের বিরক্তির কারণ ছিলেন, তিনিও অনেক অনুনয়-বিনয় করে মুহাম্মদের কাছ থেকে প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন। তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু পরে হযরত ওমর বিন আল-খাত্তাবের ঘোড়ার নীচে পদদলিত করে মারা হয়। (দ্রষ্টব্য : *The History of Al-Tabari*, vol 8, translated by Michael Fishbein, Page 179)। পুরুষদের মধ্যে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের বৈমাত্রেয় ভাই (foster brother) আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ একসময় প্রফেট মুহাম্মদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন এবং কোরান লেখায় দীর্ঘদিন মুহাম্মদের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। (দ্রষ্টব্য : *The Spirit of Islam*, page 295)। প্রফেট মুহাম্মদের দাবিকৃত 'আল্লাহর ওহি' কোরান লিখতে গিয়ে আবদুল্লাহ বিন সাদের আস্তে আস্তে সন্দেহ হয়। তিনি সন্দেহ করেন, এগুলোর কিছু কিছু মুহাম্মদ নিজেই বানিয়ে-বানিয়ে বলছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ী (মৃত ১২৮৬) তাঁর তাফসির '*আছরারুত্ তান্‌জিল ওয়া আছরারুত্ তা'য়ীল*' (Asrar ut-tanzil wa Asrar ut-ta'wil) গ্রন্থে বলেছেন, একদা মুহাম্মদ ওহি প্রাপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন ২৩ নম্বর সুরা মুমিনুনের ১২ থেকে ১৪ নম্বর আয়াত। এটুকু শোনার পরই আবদুল্লাহ বিন সাদ বলে উঠলেন, 'নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!', প্রফেট বললেন, লাগিয়ে দাও এই বাক্যটিও; লাগানো হলো। চমকে উঠলেন আবদুল্লাহ বিন সাদ। সন্দেহটি গাঢ় হল আরেকবার যখন এক আয়াতের শেষে মুহাম্মদ বললেন, 'এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ' (আরবিতে 'আজিজ', 'হাকিম')। আবদুল্লাহ বিন সাদ বাক্যটি সংশোধন করে পরামর্শ দিলেন 'এবং আল্লাহ সবজানেন ও বিজ্ঞ' (আরবিতে 'আলিম', 'হাকিম') লেখার জন্য। নবীজি অমত করলেন না, লিখতে বললেন। যদি আল্লাহর বাণীই কোরান হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই কারো পক্ষে পরিবর্তন-সংযোজন করা সম্ভব নয়, কিন্তু এ তো দেখি আবদুল্লাহর মতো একজন সাধারণ ব্যক্তিও আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করে ফেলছে। এরপর আবদুল্লাহ বিন সাদ প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় কোরায়েশদের পক্ষে যোগ দিলেন এবং প্রচার করতে লাগলেন : 'কোরান কোনোভাবেই আল্লাহর রচনা নয়, এটা প্রফেট মুহাম্মদ নিজেই তৈরি করছেন, এমন কি আমিও কয়েকটি আয়াত সংশোধন করে দিয়েছি।' (দ্রষ্টব্য : *Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*, page 98)। বলা হয়ে থাকে, ষষ্ঠ সুরা আনআমের ৯৩ নং আয়াত বিন সাদকে উদ্দেশ্য করেই রচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ১৬৭, ১৬৯)। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ে পর হটলিস্টে থাকা আবদুল্লাহ বিন সাদকে প্রফেট হত্যার নির্দেশ দিলে হজরত উসমান তাঁর এই বৈমাত্রেয় ভাইকে গোপনে আশ্রয় প্রদান করেন; এবং প্রফেটের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা আদায় করেন। নবী মুহাম্মদ তাঁর দুই মেয়ের স্বামী, জামাতা উসমানের অনুরোধ উপেক্ষা করে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারলেন না। ইবনে সা'দ তাঁর '*Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir*' গ্রন্থে (Vol 2, page 174) জানিয়েছেন, উসমান তাঁর ভাইকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর নবীজি তাঁর নিয়োজিত ঘাতককে বললেন, "উসমান যখন প্রাণভিক্ষা চাইছিল তাঁর ভাইয়ের, তখন আমি নীরব রইলাম, তুমি কেন তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ বিন সাদের গর্দান কেটে ফেল্লে না?" ঘাতক জবাব দিল, "হে আল্লার রসুল, বুঝতে পারিনি, আপনি আমাকে সামান্য একটা ইশারা দিলেই আমি সাদের ধড় থেকে মস্তক নামিয়ে ফেলতাম।" মুহাম্মদ পুনরায় বললেন, "নবী ইশারা দিয়ে কাউকে হত্যা করে না।" যাহোক, এই আবদুল্লাহ বিন সাদ আবার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর ভাই খলিফা উসমানের শাসনামলে

[+] বদরের যুদ্ধে প্রফেটের চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালেব এবং হজরত আলি মিলে আবু সুফিয়ান পত্নী হিন্দার পিতা উতবা, ভাই ওয়ালিদ এবং চাচা শেইবাকে হত্যা করলে প্রতিশোধ হিসেবে ওহুদের যুদ্ধে হযরত হামজার কলিজা ভক্ষণ করেন সুফিয়ান পত্নী হিন্দা। (দ্রষ্টব্য : *The Early History of Islam*, page 116 and http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hamza-ibn-'Abdul-Muttalib)।

মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন। আর বাকিদের কার কি হলো? খুব স্বল্প পরিসরে জেনে নেই : নবীজি মক্কায় প্রবেশের আগেই ইসলাম ধর্ম ত্যাগের কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে হিলাল ইবনে খাতাল আল-আদ্রমিকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তাই মক্কায় ১০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে মার্চ করে প্রবেশের সময় একজন নবীজিকে জানালো ইবনে খাতালকে আটক করে কাবা ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছে। নবী বলে উঠলেন, "যেখানেই পাও তাকে হত্যা করো!" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৫৮২)। আব্দুল্লাহ বিন সাদের মতো ইবনে খাতালের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। নবীর নির্দেশ শুনে আবু বারজাহ্ গিয়ে ইবনে খাতালের পেট কেটে ফেলেন। নবীজির জীবনীকারক ইবনে হিশাম জানিয়েছেন, মক্কায় থাকাকালীন একদা নবীজির সন্তান উটের পিঠে চড়ছিল, তখন আল হুয়ায়েস ইবনে নুকায়েদ বিন ওহাব উঠটিকে তাড়িয়ে দেয়। এ নিয়ে নবীজির সাথে ইবনে নুকায়েদ বিন ওহাবের কথা কাটাকাটি হয়। তখন না-কী ইবনে নুকায়েদ বিন ওহাব আমাদের দয়াল রসুল মুহাম্মদকে ইনসাল্ট করেছিল! তাই দীঘদিন দিন পর মক্কা দখল করে অনেক দিনের পুরানো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেবার কথা মনে পড়ে গেল। হজরত আলিকে নির্দেশ দিলেন, ঐ লোকটিকে হত্যা করার জন্য। হজরত আলি নুকায়েদ বিন ওহাবকে হত্যা করেন। মিকাস ইবনে সাবাবা মক্কাবাসী মুসলমান। তিনি নবীজির সাথে মদিনাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে কোনো এক 'আনসার' মিকাস ইবনে সাবাবার ভাই হিশামকে দুর্ঘটনাক্রমে মেরে ফেলে। ভাতৃহত্যার বিচার তিনি নবী মুহাম্মদের কাছে চান। নবীজি বলেন, বিচার হবে এবং তোমার প্রতিশোধও নেওয়া হবে, অপেক্ষা করো। কিন্তু মিকাস ইবনে সাবাবা তখন ঐ 'আনসার'কে হত্যা করে ফেলে। এ ঘটনায় দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় মদিনাবাসী মুসলমানদের মধ্যে। অনেকেই এ ধরনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানায়। আস্তে আস্তে ইবনে সাবাবার সাথে অন্যান্য মুসলমানের মনোমালিন্য এবং কোন্দল দেখা দেয়। পরবর্তীতে মিকাস নবী মুহাম্মদের 'সঙ্গ' ত্যাগ করে মক্কাতে ফিরে গিয়ে 'কাফের' প্যাগানদের দলে যোগ দেয়। মক্কার দখল শেষ হলে মিকাস ইবনে সাবাবাকে 'ইসলাম ধর্ম ত্যাগের কারণে' হত্যা করা হয়। কারণ নবীজি বলেছেন : "Whoever changed his Islamic religion, then kill him." (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৮৪, নম্বর ৫৭)। হাব্বার ইবনে আল-আসওয়াদ মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়েমেনে আশ্রয় নেন; কিন্তু গুপ্তঘাতক তাকে ইয়েমেন গিয়ে হত্যা করে। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৬৬২ এবং বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৬, নম্বর ৮১৭)।

মক্কায় থাকাকালীন কোরানে মুহাম্মদ বলেছেন : "আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো মুজুরি চাই না।" (সুরা ২৫, ফুরকান, আয়াত ৫৭)। মদিনায় এসে কোরানে যুদ্ধের নামে অর্থ সংগ্রহ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, মিথ্যা স্বর্গের লোভনীয়-লাস্যময়ী জীবন ও যুদ্ধপ্রেরণা প্রাধান্য পায়। পূর্বেকার বহু নবীদের কাহিনী দিয়ে ভর্তি কোরান শরিফের কোথাও কিন্তু একটিবারও উল্লেখ নেই যে, মুহাম্মদের পূর্বে কোনো নবী-রসুল সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আরবি 'সলম' ধাতু হতে উৎপন্ন 'ইসলাম' শব্দের বাংলা অর্থ হলো আত্মসমর্পণ এবং শান্তি। তবে ব্যাপক প্রচারে পৃথিবীর বেশিরভাগ মুসলমানেরা গর্বে বুকের ছাতি ফুলিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করেন ইসলাম মানেই 'শান্তি' ('আত্মসমর্পণ' শব্দটি অনেকে ব্যবহার করেন না, কারণ অন্যের কাছে নিজের 'স্বাধীনতা-স্বকীয়তা-আত্মবোধ' বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করলে 'শান্তি' কিভাবে পাওয়া যায়, তা যে কোনো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে প্রশ্নসাপেক্ষ)। কিন্তু ইসলাম জন্মের পর থেকেই মহানবী মুহাম্মদ, খলিফা, সাহাবিদের জীবন-কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলে মনে প্রশ্ন জাগে ইসলাম মানে কি 'শান্তি'? শান্তির সংজ্ঞা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। এখানেও শুনতে পাই 'দুষ্ট লোকেরা' বলছে : এই 'শান্তি' মানে কি সেই শান্তি, ঐ যে ১৯৭১ সালে এদেশের কিছু দালাল, পাকিস্তান বাহিনীর পা-চাটা গোলাম 'শান্তি কমিটি' প্রতিষ্ঠা করে 'ইসলাম' রক্ষার ধুয়া তোলে এ দেশের লক্ষ-লক্ষ মা-বোনকে জোর করে হানাদার খান সেনাদের লালসা মেটাবার জন্য তুলে দিয়েছিল, কোটি মানুষের স্বাধীনতা-মুক্তির স্বপ্নকে পদদলিত করে লাখো মুক্তিসেনাকে হত্যা করেছিল, ধরিয়ে দিয়েছিল, লুটপাট-ডাকাতি-অগ্নিসংযোগ-ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কিংবা ধরেন, বর্তমানে আমেরিকা যেভাবে আফগানিস্তানে-ইরাকে লক্ষ মানুষকে হত্যা করে, ইজরাইল প্যালেস্টাইনসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ট্যাঙ্ক, কামানের গোলা দিয়ে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যে ধরনের 'শান্তি' প্রতিষ্ঠা করে চলছে, 'ইসলাম' মানে কি সেই ধরনের 'শান্তি'? দুর্বল হৃদয়ের মুসলমানদের দুষ্ট লোকদের কথায় কান দেবার দরকার নাই! তবে যারা সত্যসন্ধানী-যুক্তিমনস্ক, নিজেদের পবিত্র ধর্মানুভূতিকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রামে পাঠিয়ে দেড় হাজার বছর ধরে চেপে যাওয়া ইতিহাসকে খোলসা করে জানতে হলে তারা নিজ দায়িত্বে ভেবে দেখতে পারেন। মিলিয়ে নিবেন সেই যে বদরযুদ্ধ থেকে আরববাসীর জন্যে গজবের সূচনা হয়েছিল, পনেরশত বছর পর আজও 'ইসলামিক ব্রাদারহুড', 'হামাস' 'আলকায়েদা', 'হরকাতুল জেহাদ', 'লস্করই তৈয়বা', 'জামাতুল মুজাহিদিন', 'জৈশে মুহাম্মদ' ইত্যাদি নামে-বেনামের নবী মুহাম্মদ অনুগামী-অনুসারীগণ সাধারণ মানুষের দুর্বল ধর্মীয় অনুভূতি 'ইসলাম'কে হাতিয়ার করে কিভাবে ভয়ঙ্কর 'ইসলামি সন্ত্রাস' চালিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বজুড়ে ইসলামি খেলাফত নামের 'আরব সাম্রাজ্যবাদ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। চুপি চুপি বলে রাখি, এমনি এমনিই তো আর ইসলাম বিশেষজ্ঞ Sir William Muir বলেননি[১০৩] :

[১০৩] Sir William Muir, *The Life of Mahomet*, Vol 4, Smith, Elder, & Co., London, 1861, Page 322.

> "The sword of Mahomet, and the Coran, are the most fatal enemies of Civilization, Liberty, and Truth, which the world has yet known."

আমাদের নতুন প্রজন্ম, আমাদের আগামী দিনের শিশুরা কি এরপরও 'বোকার স্বর্গের' সন্ধানে মাথা খুঁড়ে মরবে মসজিদ-মাদ্রাসা বা মক্তবের অন্ধকার কোণে? কোরান-হাদিস, বেদ-গীতা-উপনিষদ-বাইবেলসহ দুনিয়ার তাবৎ ধর্মগ্রন্থ বর্জন করে বিজ্ঞান-যুক্তি-মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের শিশুদের দীপ্ত-উজ্জ্বল মাথাটাকে পচন-দূষণ থেকে, বৌদ্ধিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে বাঁচাতে হবে। ওরাই একদিন ধর্মীয়-সন্ত্রাসমুক্ত, সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণামুক্ত আগামী দিনের শান্তিময় সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলবে। আগামী প্রজন্মের জন্য আমি শুধু আড়াই হাজার বছর আগের দার্শনিক-মনীষী-বিদ্রোহী গৌতম বুদ্ধের (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব) চমৎকার এবং অত্যন্ত আধুনিক যুক্তিসঙ্গত উপদেশ তুলে ধরছি[১০৪] :

> "O Kalamas, not by hearsay, not by tradition, not by customary, not by the authority of books, not by dialectics, not by what others do, not by grandeur, not by the glamour of a philosophical view, and not out of respect for your teacher, but, O Kalamas, be guided by your own knowledge and conviction."

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

[১০৪] শফিকুর রহমান, *হিউম্যানিজম*, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১০৭।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের জন্ম-বিকাশ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

"There are no boundaries or chains for freedom of thinking...To deny secularism is to ignore the essence of modern civilization...To call for a religious state is to ignore human rights...To call for a return to the Islamic Khelafa is to ignore history...Oh, Reader of future times: read what we wrote, learn how a human being can take a stance, how we crafted with our pens a new age of enlightenment, and how words are more powerful than bullets." অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতার কোনো সীমারেখা নেই, অথবা কোনো শিকল...সেক্যুলারলিজমকে অস্বীকার করা মানে আধুনিক সভ্যতার মৌলিক গুণাবলীকে উপেক্ষা করা...ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মানে মানুষের মানবিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করা...ইসলামি খেলাফতে ফিরে যওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে ইতিহাসকে অস্বীকার করা...হে আগামীদিনের পাঠকেরা, পাঠ করো আমরা কি লিখেছি, শিখো কেমন করে একজন মানুষের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, কেমন করে আমাদের কলম নতুন যুগের আলোকায়ন সূচিত করেছে, কেমন করে শব্দ গুলির থেকেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। —মিশরীয় মানবাধিকার কর্মী, লেখক ফারাজ ফাদা (Faraj Fada, ১৯৪৬-১৯৯৬)।

(১)

কোরায়েশ বংশের দুই শাখায় নবী মুহাম্মদ ও হজরত ওসমানের জন্ম। তাঁদের দুজনরেই পূর্বপুরুষ আবদে মনাফ। আবদে মনাফের দুই পুত্র ছিলেন : আবদে শামস ও আবদে হাশিম। আবদে শামসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া নেতৃত্বের দাবি করায় চাচা আবদে হাশিমের সাথে বিবাদ বাঁধে। এই বিবাদে কোরায়েশ বংশ দুই দলে বা গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়; হাশিমি গোত্র ও উমাইয়া গোত্র। বিবাদের মূল কারণ সম্পদ। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ভাগাভাগি করা হয় এইভাবে—কাবা ঘরের স্বত্বাধিকার ও তত্ত্বাবধান এবং হজ (দেব-দেবী দর্শন) মৌসুমে আয়কৃত অর্থের মালিকানা থাকবে হাশিমি গোত্রের হাতে। আর দেশ প্রতিরক্ষা-প্রশাসন ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানা উমাইয়া দলের হাতে। পরবর্তীতে উমাইয়া বংশ বুঝতে পারলো এই ক্ষমতা ভাগাভাগিতে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। নবী মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম পূর্ববর্তী আরবে যুদ্ধবিগ্রহ বা ধর্মীয় জেহাদ তেমন ছিল না বললেই চলে। নগর শাসনে উমাইয়াদের অর্থোপার্জন, কাবা গৃহের আয়ের তুলনায় ছিল অতি নগন্য। ধনে-মানে উমাইয়া গোত্র, হাশিমিদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়লো। কিন্তু তারা সামরিক বিভাগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে ছিল। এবার অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণে বুদ্ধিমান উমাইয়াগণ ঝাপিয়ে পড়লো ব্যবসা-বাণিজ্যে। কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে, অর্থোপার্জনে প্রচুর উন্নতি করে, উপরন্তু বহির্বিশ্বের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। উমাইয়া ও হাশিমি দুই দলের মধ্যকার বৈষম্য, বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ দিনদিন বাড়তে থাকে। আর তা এক পর্যায়ে হাশিমি দলের অন্যতম শক্তিশালী নেতা, একাদশ সন্তানের জনক আব্দুল মোত্তালিবের সময়ে এসে চরমাকার ধারণ করে। আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ ও আবু তালিবের ঔরসে যথাক্রমে মুহাম্মদ (দঃ) ও হজরত আলির (রাঃ) জন্ম।

উমাইয়ার দুই পুত্র ছিলেন। হারিব ও আবুল আস। হারিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আবু সুফিয়ান আর আসের ঘরে হাকাম ও আফ্ফান। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের যে বছর ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা মক্কা আক্রমণ করেন, সে বছর হাশিমি গোত্রের আব্দুল্লাহর গৃহে মুহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তার ছয় অথবা সাত বৎসর পর উমাইয়া বংশের আফ্ফান পত্নী উর্দির গর্ভে হজরত উসমানের (রাঃ) জন্ম হয়। শিশু বয়সে যেমন মুহাম্মদ (দঃ) পিতা আব্দুল্লাহকে হারিয়ে চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন, হজরত উসমান (রাঃ) ও কিশোর বয়সে পিতা আফ্ফানকে হারিয়ে চাচা হাকামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উমাইয়া ও হাশিমিদের আত্মকলহ, গোত্রীয় সংঘাত, বহুঈশ্বরবাদ আর ধর্মীয়-উপাসনালয়ের মালিকানা জবর-দখল নিয়ে আরব যখন অবনতির চরম পর্যায়ে তখনই বিপরীতমুখী মুক্তবুদ্ধি এবং উদার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একদল মুক্তমনার আবির্ভাব ঘটে। যাদের তৎকালীন সময়ে 'হানিফ' নামে আখ্যায়িত করা হতো।[১] মুহাম্মদ (দঃ) তখন যুবক। ওয়ারাকা বিন- নওফল ও জায়েদ ইবনে আমর বিন- নওফল[২] ছিলেন সেই 'হানিফ' দলের

[১] আরো দেখুন : Richard Bell, *Who Were The Hanifs?*, *Muslim World*, Volume XXIX, 1949, Page 120-125; The internet version can be read at: http://answering-islam.org/Books/Bell/hanifs.htm

[২] আমরা প্রবন্ধে জায়েদ ইবনে আমর বিন- নওফলকে সংক্ষেপে জায়েদ বিন আমর নামেই অভিহিত করব।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। 'হানিফি' গোষ্ঠীর সদস্য হলেন মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ এবং উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথ প্রমুখ। উল্লেখ্য, এঁদের মধ্যে ওয়ারাকা বিন নওফল প্রফেট মুহম্মদের প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ও নবী মুহাম্মদের (দঃ) 'ইসলাম-প্রচারের' ধর্মগুরু; জানা যায়, তিনি খাদিজা ও মুহাম্মদের (দঃ) বিয়ের ঘটকও ছিলেন। খলিফা ওমরের চাচা জায়েদ ইবনে আমর আরবের পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পরবর্তীতে তিনি এই পৌত্তলিক ধর্মমত ত্যাগ করে একেশ্বরবাদের চর্চার অংশ হিসেবে 'আব্রাহামিয় মতবাদ' গ্রহণ করেন। জায়েদ ইবনে আমর তাঁর গোত্রের পৌত্তলিকতা, মূর্তি পূজা, নারী-শিশু হত্যাকে ঘৃণা করতেন। সারা রমজান ধরেই তিনি মক্কার 'হেরা' নামক পাথরের পাহাড়ের গুহায় উপাসনা করতেন, যা পরবর্তীতে আমাদের নবী মুহাম্মদেরও উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান হয়ে দাঁড়ায়। এমন কী হাদিস থেকে জানা যায়, (৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে) নবী মুহাম্মদ (দঃ) যখন পৌত্তলিক দেব-দেবীর উপাসনা করতেন, কোরবানি দেওয়া মাংস রান্না করে জায়েদের জন্য নিয়ে যেতেন তার সাথে খাওয়ার জন্য তখন এই জায়েদ বিন আমরই মুহাম্মদকে তিরষ্কার করতেন এবং পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থেকে একেশ্বরবাদ চর্চার পরামর্শ দিতেন। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬৭, নম্বর ৪০৭)। হানিফ দল এক সময় মক্কার প্রভাবশালী 'পৌত্তলিক ধর্মে'র ওপর প্রকাশ্যে অনাস্থা ঘোষণা করে বসে। ফলে কোরায়েশ বংশের রোষে পড়ে তাদের অনেককেই দেশান্তরী হতে হয়। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাজ্য আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) পালিয়ে যান এবং সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন; তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে (উমাইয়া গোত্র নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাকে পরবর্তীতে বিয়ে করেন)। এবং উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথও কোরায়েশদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাইজেন্টাইন রাজ্যে গমন করেন; তিনিও সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন। ওয়ারাকা বিন- নওফল ও জায়েদ বিন-আমর ছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) অতি প্রিয়ভাজন। এই দুই ব্যক্তিই ছিলেন পরবর্তীতে মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্ম 'ইসলাম' আবিষ্কারের প্রথম ও প্রধান সহায়ক। ওয়ারাকা বিন-নোফেল ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কেতাবে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি হিব্রু থেকে আরবি ভাষায় খ্রিস্টানদের গসপেল (ইঞ্জিল কেতাব) অনুবাদ করেছেন (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬০, নম্বর ৪৭৮ এবং বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ১, নম্বর ৩) আর জায়েদ ইবনে আমর ছিলেন মূলত একজন কবি ও সাহিত্যিক। কোরানের অনেক কাব্যিক রূপ, ছন্দ ও শব্দচয়ন জায়েদ ইবনে আমরের কাছ থেকে অনেকাংশেই ধারকৃত[৩]। হানিফ সম্পর্কে ইসলাম বিশেষজ্ঞ Aloys Sprenger-এর মত হচ্ছে : 'Islam is the fruit of Hanif Tradition.' মুহাম্মদ (দঃ) যদিও জন্মের পর থেকেই পিতৃমাত স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, লালন-পালন হয়েছিলেন দাদা-চাচার কাছে কিন্তু তিনি 'নিরক্ষর' ছিলেন, এ বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। (প্রথম অধ্যায়ের 'মুহম্মদ (দঃ) কি নিরক্ষর ছিলেন?' অংশ দ্রষ্টব্য)। চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রায়ই সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সাথী হতেন, এবং ব্যবসার হিসাব-নিকাশের পূর্ণ দক্ষতার কারণেই বিত্তশালী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী খাদিজা মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম 'ইসলাম' প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। মক্কা নগরীতে আগুন জ্বলে উঠলো। হাশিমি বংশোদ্ভূত মুহাম্মদের (দঃ) এই নতুন ধর্ম ঘোষণায় অপমানবোধ করলো উমাইয়া দল, আর মুহাম্মদের (দঃ) স্বীয় গোত্রের লোকজন পৌত্তলিকতার অবসানের দুশ্চিন্তায়, দেব-দেবীর কল্যাণে কাবা গৃহ থেকে বিপুল আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় হলো উৎকণ্ঠিত। এদিকে হজরত উসমান (রাঃ) চাচা হাকামের সহযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর উন্নতি করার ফলে দেশ-বিদেশে সুপরিচিতি লাভ করেন। ব্যবসার সূত্র ধরেই একদিন মক্কার ব্যবসায়ী আবু বকরের (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

হজরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবেগপ্রবণ, কিছুটা সরল প্রকৃতির সুদর্শন যুবক। ধনে-মানে উসমান (রাঃ) সুখী হলেও মনে-প্রাণে সুখ ছিল না। পিতা আফ্ফানের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা উর্দি (ওরয়া) যে লোকটিকে বিয়ে করেন, উসমান তাকে সহ্য করতে পারতেন না। মনের দুঃখে একদিন ঘর ছেড়ে মক্কায় চলে আসেন। উসমান প্রফেট মুহাম্মদের প্রথম কন্যা রোকেয়াকে ভালোবাসতেন এবং মনে-মনে তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করতেন। কিন্তু যখন একদিন শুনতে পেলেন রোকেয়ার বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেছে, উসমান (রাঃ) খুবই দুঃখ পেলেন। একদিন সেই দুঃখ মোচনের সুবর্ণ সুযোগটি সৃষ্টি করে দিলেন তাঁর নব্য ব্যবসায়ী বন্ধু আবু বকর (রাঃ)। মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম 'ইসলাম' ঘোষণার পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই চল্লিশ বছর বয়স্কা, দু'বার বিবাহিতা, বিপুল সম্পদের অধিকারিণী খাদিজাকে বিয়ে করেন। মুহাম্মদ (দঃ) ভালোভাবেই জানতেন, বাহুবল ও অর্থবল ছাড়া তাঁর নতুন ধর্ম 'সূতিকা ঘরে'ই মারা যাবে; যেমনটা হয়েছে হানিফদের অবস্থা। তাই আপন কন্যাদ্বয়কে আপন চাচার সন্তান ওত্‌বা এবং ওতাইবা ইবনে আবু লাহাব নামের দুই অমুসলিম সহোদর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেন। উম্মে কলসুম বিবাহকালে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। নবী কন্যাদ্বয়ের বিবাহ ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক অবশ্যই ছিল না; কারণ আবু লাহাব বা তার দুই পুত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, এমন কী এই ধর্মকে তারা মেনে নিতে পারেননি, তাদের আশঙ্কা ছিল এটি (ইসলাম) তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাই ওত্‌বা

[৩] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন : Abul Kasem, *Who Authored the Qur'an?—an Enquiry*, http://www.mukto-mona.com/Articles/kasem/quran_origin.htm

এবং ওতাইবা মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্মের সংবাদ শুনে নবীজির প্রতি তাদের তীব্র অনাস্থাই শুধু প্রকাশ করলো না উপরন্তু তাঁর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) অন্তরে খুবই দুঃখ পেলেন কিন্তু কিছু করার শক্তি ছিল না, শুধু অভিশাপ দেওয়া ছাড়া। ('সুরা লাহাব' দ্রষ্টব্য)। রোকেয়াকে নিয়ে উসমানের (রাঃ) মনের গোপন বাসনা আবু বকর (রাঃ) জানতেন এবং নবী কন্যাদ্বয়ের তালাক হয়ে যাওয়ার সুবাদে 'উসমানের বাসনার' সংবাদটা তিনি (আবু বকর) মুহাম্মদের (দঃ) কানে পৌঁছালেন। নবী মুহাম্মদও এই ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বাহুবল অর্জনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এবারে অর্থবলের সুযোগটা হাতছাড়া করা যায় না। মুহাম্মদ (দঃ) উসমানকে নবপ্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্ত মেনে নিলে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন। উসমানও খুশি মনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রোকেয়ার সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। আরবের একটি ধনাঢ্য-সম্ভ্রান্ত পরিবারে, 'সোনার চামচ' মুখে নিয়ে যে উসমানের জন্ম, সেই উসমান এমন কাণ্ড করে বসবেন উমাইয়া বংশের কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। চাচা হাকামের, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উসমানের বিয়ে দেওয়ার সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নববধূকে নিয়ে তায়েফের রাজপ্রাসাদে উসমানের আর যাওয়া হলো না। কিছুদিন পরেই তিরস্কার আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মক্কা থেকে বিতাড়িত অনেক নব্য মুসলিম দলের সাথে নববধূকে নিয়ে উসমান পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাষ্ট্র আবিসিনিয়ায় গমন করেন। দরিদ্র দেশ আবিসিনিয়ায় উসমান ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। আবিসিনিয়ায় প্রায় পাঁচ-ছয় বছর সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অবস্থানকালে, ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে, একদিন রোকেয়ার কাছে খবর আসলো, এককালের আরবের স্বনামধন্য মহিলা, অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, মা জননী খাদিজা রোগাক্রান্ত হয়ে, ঔষধ-পথ্যবিহীন অবস্থায় মারা গেছেন। মাতৃশোকে রোকেয়ার শুধু মনই ভাঙেনি, তাঁর দেহও ভেঙে যায়; তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মুহাম্মদ কোরায়েশ কর্তৃক তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কায় রাতের অন্ধকারে বিশ্বস্ত সহযোগী আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মদিনাভিমুখে পালিয়ে যান। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'হিজরত' বলা হয় এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তীতে হিজরিসন গণনা শুরু করা হয়।[৪] তখন মুহাম্মদের (দঃ) বয়স ছিল তিপ্পান্ন আর তাঁর প্রচারিত ধর্মের চলছিল তেরো বছর। মদিনায় এসেই মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর এতোদিনকার বৈরাগী লেবাসের অন্তরালে লুকায়িত রাজনৈতিক ইসলাম প্রকাশের প্রস্তুতি নেন। এক হাতে তসবিহ্ আর এক হাতে তলোয়ার!

(২)

হযরত উসমান হিজরি দুই সনে (৬২৪ খ্রিস্টাব্দে) আবিসিনিয়া থেকে স্বস্ত্রীক মদিনার পথে যাত্রা করেন। পীড়িত, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের রোকেয়া তখন গর্ভবতী। পথিমধ্যে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু সে শৈশবেই মারা যায়। রোকেয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হতে থাকে। কিছুদিন পর রোকেয়া যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তখন তাঁর তের বছরের তৈরি তিনশতো তেরোজন অনুসারী সৈনিক নিয়ে, মদিনা থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর প্রান্তে যুদ্ধরত। মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া থেকে মক্কাভিমুখী একদল কোরায়েশ বণিকের (আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে) পথ রুখে দাঁড়ান[৫]। যুদ্ধের জন্য মুসলমানগণ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। হঠাৎ আক্রমণে বণিকদল হতভম্ব হয়ে যায়। বাহক মারফত মক্কার কোরায়েশগণ জানতে পারলো যুদ্ধ ব্যতীত বণিকদলকে প্রফেট বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বদর প্রান্তে সংঘটিত হলো ইসলামের ইতিহাসের 'সর্বপ্রথম' যুদ্ধ[৬]।

---

[৪] প্রফেট মুহাম্মদের মৃত্যুর ছ'বছর পরে ৬৩৮ সালে দ্বিতীয় খলিফা ওমর গ্রিক ও রোমানদের জীবনযাত্রা বিবেচনা করে, হিজরতের তারিখ থেকে মুসলিম যুগ 'হিজরি সাল' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন। এই যুগ বা বর্ষ শুরু করার নির্ধারিত দিনটি হয় যে চান্দ্র মাসে হিজরত হয়েছিল ঐ মাসের প্রথম তারিখ থেকে। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল (জুলাই) মাসের ১৫/১৬ তারিখে মুহাম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। আরববাসীর চান্দ্র বছর ব্যবহার করার যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা হলো ৩৩টি সৌর বছরে চান্দ্র বছর হবে ৩৪টি। এখন অবশ্য আন্তর্জাতিক সুবিধার জন্য প্রায় সব মুসলিম দেশ গ্রেগরিয়ান সৌর ক্যালেন্ডারের সাথে মিলিয়ে অনুসরণ করে থাকেন। (দ্রষ্টব্য : বেঞ্জামিন ওয়াকার (সা'দ উল্লাহ্ অনূদিত), *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, সময় প্রকাশনী, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১২৩। এবং স্যর সৈয়দ আমীর আলী, *এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯২), ২০০৫, পৃষ্ঠা ১০)।

[৫] এ প্রসঙ্গে মুহম্মদের প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাক বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন (পৃঃ ২৮৯), 'when the apostle heard about Abu Sufyan returning from Syria, he summoned the Muslims and said, 'This is the Quraysh caravan containing their property. *Go out to attack it, perhaps God will give it as a prey.*'

[৬] ইসলামের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বদরের যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে 'সর্বপ্রথম' যুদ্ধ বলা হলেও মহানবী (দঃ) বদরের 'যুদ্ধের' আগেও শত্রুপক্ষের উপর বিভিন্ন চোরাগোপ্তা হামলা (আরবীতে বলে গাজওয়া) চালিয়েছিলেন। প্রথম হামলাটি তিনি করেছিলেন ৬২৩ খ্রীস্টাব্দে মদীনায় হিজরতের নয় মাসের মাথায় এক কোরায়েশ কাফেলার উপর। তবে হামলাটির নেতৃত্বে মুহম্মদ ছিলেন না, নেতৃত্বে ছিলেন মুহম্মদের চাচা আব্দুল মুত্তালিব। হামলার উদ্দেশ্য ছিলো নেহাতই ধন সম্পদ লুটপাট। কিন্তু সেই হামলা সফল হয় নি। পরবর্তী কয় মাসে মুহম্মদ আরো কিছু হামলা পরিচালনা করেন; এর মধ্যে বোয়াতের হামলা, কাহারের হামলা, ওয়াদ্দানের হামলা, সাফওয়ানের হামলা, নাখালার হামলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মুসলমানদের পক্ষে স্বয়ং মুহাম্মদ মুহাম্মদ (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে। বদর প্রান্তর সত্তরটি তাজা প্রাণের রক্তে রঞ্জিত হলো। আর এই রক্তের মাঝে খোঁজে পেল কিশোর ইসলাম বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার অপূর্ব স্বাদ। উসমান (রাঃ) সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। সেনাপতি মুহাম্মদ (দঃ) সত্তরজন মানুষকে খুন ও ততোধিক মানুষকে বন্দী করে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। বিজয়ীর বেশে গর্বিত সৈন্যদল নিয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যখন মদিনায় গৃহে ফিরলেন, রোকেয়া তখন এই পৃথিবীতে আর নেই। রোকেয়ার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হলো, বিজয় উৎসব করা নবীজি মুহাম্মদের (দঃ) আর হলো না। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা (সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তার) বাস্তবায়নের পথে উৎসাহ ও আশা সঞ্চারিত হলো। মুহাম্মদ (দঃ) অতিসত্তর আরেকটি যুদ্ধের আয়োজনে মনোনিবেশ করলেন। আর পত্নী বিয়োগে শোকাহত উসমান (রাঃ) কিছুদিন পরেই পুরোদমে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। ব্যবসায় সুপরিচিত উসমান (রাঃ) পূর্ব অভিজ্ঞতায় রাতারাতি প্রচুর উন্নতি করলেন। এতোদিনে, কিশোর বয়সে তালাক প্রাপ্ত মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় কন্যা উম্মে-কলসুম পূর্ণ যুবতী। উসমান (রাঃ) কলসুমের প্রেমে পড়লেন। নবীজির কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ধনে-মানে, রূপে-গুণে অতুলনীয় উসমানের (রাঃ) প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হলো। নবী মুহাম্মদের (দঃ) দুই কন্যার পাণি গ্রহণের কারণে উসমান (রাঃ) 'যিন্নুরাইন' অর্থাৎ যুগল নূরের অধিকারী উপাধি পেলেন।

প্রথম যুদ্ধের মাত্র এক বছর পরেই, হিজরি তৃতীয় সনে (৬২৫ খ্রীস্টাব্দ), মদিনা থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে ওহুদ প্রান্তরে কোরায়েশদের সাথে মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। তারপর ৬২৭ খ্রীস্টাব্দে আহজাবের (খন্দকের)যুদ্ধ। ইসলামের এই প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে মুসলমানেরা আর্থিক দিক দিয়ে তেমন সুবিধা করতে না পারলেও বদরের যুদ্ধের পর পরই মুহম্মদ বনি কুয়ানুকা গোত্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের বাস্তুচ্যুত করেন। আর ওহুদের পর আক্রমণ করেন বনি নাদিরের ইহুদী ট্রাইবকে। তখন আব্দুলাহ বিন উবেহ্‌র জোরজবরদস্তির কারণে বড় ধরণের রক্তপাত এড়ানো গেলেও ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে আব্দুলাহ বিন উবেহ্‌কে এড়িয়ে গিয়ে মহানবী বনি কুরাইজার ইহুদী গোত্রের উপর যে নৃশংসতা চালান তা ইতিহাসে সত্যই বিরল। ৮০০ থেকে ৯০০ আত্মসমর্পণকারী বন্দিকে পিছমোড়া করে বেঁধে জবাই করে হত্যা করা হয়। মুহম্মদ (দঃ) নিজেও এই তান্ডবলীলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে দু'জন ইহুদী নেতার শিরোচ্ছেদ করেন। বনি কুরাইজার ত্রাসের পর ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ করেন খাইবারের আরেকটি ইহুদী গোত্রকে। এই 'যুদ্ধ'গুলোতে শিশু ইসলাম শুধু রক্তই পান করলো না, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অমৃতস্বাদও গ্রহণ করলো। যুদ্ধে বিজয়ী মুসলমানগণ প্রচুর সম্পদ লাভ করলেন এবং শত্রুপক্ষের অনেক শিশু-কিশোর, নর-নারীকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন। মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন, 'যুদ্ধ এবং লুণ্ঠন একটি অকল্পনীয় লাভজনক ব্যবসা'। কোরায়শগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। ইসলাম ত্রাসের সৃষ্টি করলো সারা আরববিশ্বে। ষষ্ঠ হিজরিতে মুহাম্মদ (দঃ) বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনি-মুত্তালিক গোত্রের ইহুদিদেরকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইহুদিগণ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের বহু নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। নিজ শহরের বাইরে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ 'আত্মরক্ষামূলক' হয় না।

মুহম্মদ (দঃ) এর যুদ্ধগুলো কি আদপেই আত্মরক্ষামূলক ছিলো?

মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস হল, মহানবী মুহম্মদ (দঃ) তার জীবনে যে সমস্ত যুদ্ধ সম্পন্ন করেছেন, তার বেশিরভাগই বোধ হয় আত্মরক্ষামূলক ছিলো। তারা ভাবেন, মক্কার কাফেররা মুহম্মদকে মারার জন্য সব সময় মুখিয়ে থাকত, তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই বোধ হয় তাকে বাধ্য হয়ে মাঝে সাঝে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হত। কিন্তু এ ব্যাপারটি একদমই সত্য নয়। মুহাম্মদ কর্তৃক বেশিরভাগ যুদ্ধই ছিল আসলে 'অফেন্সিভ'।[৭] বনি-মুত্তালিক গোত্র বা সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে বাড়ি ফেরার পথে কোরায়েশ বণিকদল মদিনা আক্রমণ করে নাই। নবীজি যে রাতের আঁধারে সৈন্যদল মরুযাত্রী উটের কাফেলায় 'অফেন্সিভ' আক্রমণ চালাতেন, তার প্রমাণ রয়ে গেছে অনেক হাদিসে। এমন একটি হাদিস পাঠকের সুবিধার্থে দেওয়া হল :

সে হিসেবে বদরের যুদ্ধ ইসলামের অষ্টম কিংবা নবম যুদ্ধ। ওয়াদ্দানের যুদ্ধ থেকে মহানবী সরাসরি সেনাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পাঠকেরা এ প্রসঙ্গে Sir Willam Muir এর A Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira বইটি দেখতে পারেন। এ ছাড়া মুক্তমনায় আবুল কাশেমের 'The Root of Terrorism a la Islamic style ' প্রবন্ধটিতেও বদরের যুদ্ধের আগে ঘটা আরো আটটি হানা-যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যাবে।

[৭] আল তাবারির বর্ণনা থেকে দেখা যায়, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবনে প্রায় ষাটটির মতো যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন; এর মধ্যে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া সবগুলোই ছিল আক্রমণাত্মক (incursion)।

'Ibn 'Aun reported: I wrote to Nafi' inquiring from him whether it was necessary to extend (to the disbelievers) an invitation to accept (Islam) before meeting them in fight. He wrote (in reply) to me that it was necessary in the early days of Islam. **The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu Mustaliq while they were unaware and their cattle were having a drink at the water.** He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Juwairiya bint al-Harith. Nafi' said that this tradition was related to him by Abdullah b. Umar who (himself) was among the raiding troops." (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১, বুক ১৯, নম্বর ৪২৯২)[৮] ।

এমন কি তিনি শিশু এবং নারীদেরও রেহাই দিতেন না -

It is reported on the authority of Sa'b b. Jaththama that the Prophet of Allâh (may peace be upon him), when asked about the women and children of the polytheists being killed during the night raid, said: They are from them.[belong to them][৯]

কোরানে বলা আছে্ 'তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী (দাস, দাসী এবং যুদ্ধবন্দিনী)- আলাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন" (৪:২৪) । এই আয়াতের ব্যখ্যায় জালালান বলেন- "অর্থাৎ, যাদেরকে তারা যুদ্ধের ময়দানে আটক করেছে, তাদের সাথে সহবাস করা তাদের জন্যে বৈধ, যদি তাদের স্বামীগণ জীবিতও থাকে" । এই সুরার বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখি মহানবীরর বিভিন্ন যুদ্ধের দলিলে । কিভাবে যুদ্ধবন্দীদের ভাগাভাগি করা হত তার বর্ননা বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায় (যেমন, সহি বুখারিঃ ভলিউম-৫, বুক নং-৫৯, হাদিস নং-৬৩৭দ্রঃ) । বানু কুরাইজা নামক ইহুদি গোত্রটির সমস্ত পুরুষ সদস্যদের হত্যা করার পর তাদের ধনসম্পত্তি ও নারীগন মুসলমানদের দখলে আসে । ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি, মুসলমানগণ যখন বানু হাওয়াজিন গোত্রকে পরাজিত করে, প্রায় ৬ হাজার নারী ও শিশু বন্দী হয় মুসলমানদের হাতে । নারীদেরকে জিহাদিদের মধ্যে যথারীতি বন্টন করে দেয়া হয় । রায়হানা নামের এক সুন্দরী ইহুদিনীকে নবী নিজের জন্যে নির্বাচিত করেন । রায়তা নামের সুন্দরী বন্দিনীটি হযরত আলীর ভাগে পড়ে, জয়নাব নামের আরেক যুদ্ধবন্দী নারী পড়ে হযরত ওসমানের ভাগে । নারী-মাংসের এক ভাগ হযরত ওমরের ভাগ্যেও জুটেছিল, তবে ভাগটি তিনি নিজে না নিয়ে ভোগ করার জন্যে তা প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেন বলে কথিত আছে । শুধু রায়হানা নয়, জাওয়াহিরা এবং সাফিয়া নামের আরও দুই রক্ষিতা ছিল নবীর । জওয়াহিরা তার হাতে আসে বানু আল-মুস্তালিক অভিযান থেকে, সাফিয়া আসে খায়বারের বানু নাজির গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান থেকে । এমনকি যুদ্ধজয়ের পর স্বামীর সামনে স্ত্রীকে বলৎকার করার নির্দেশ দিতেও মহানবী কুন্ঠিত হন নি । সুনান আবু দাউদঃ বুক নং-১১, হাদিস নং-২১৫০:

আবু সাইদ আল খুদরি বলেন- "হুনায়েন যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসুল (দঃ) আওতাসে এক অভিযান পাঠান । তাদের সাথে শত্র"দের মোকাবেলা হলো এবং যুদ্ধ হলো । তারা তাদের পরাজিত করল এবং বন্দী করল । রাসুলুল্লাহর (দঃ) কয়েকজন অনুচর বন্দিনীদের স্বামীদের সামনে তাদের সাথে যৌনসঙ্গম করতে অপছন্দ করলেন । তারা (স্বামীরা) ছিল অবিশ্বাসী কাফের) । সুতরাং মহান আল্লাহ কোরাণের আয়াত নাজেল করলেন- "সমস্ত বিবাহিত স্ত্রীগণ (তোমাদের জন্যে অবৈধ); কিন্তু তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী (যুদ্ধবন্দিনী)- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন" ।

[৮] Also see: Sahih Bukhari, Vol. 3. Book 46, Number 717;
[৯] Sahih Muslim Book 019, Number 4321, 4322 and 4323.

এবারে (৬২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে) মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের মন-মানসিকতা ও শক্তি পরীক্ষার লক্ষ্যে চৌদ্দ শত সৈন্যসামন্ত নিয়ে মক্কা নগরী দখলের আয়োজন করলেন। মক্কা শহর থেকে সাত মাইল দূরে হোদায়বিয়ার উপত্যকায় এসে তারা আর অগ্রসর হলেন না। অনেক দেরিতে হলেও মক্কাবাসী দেখতে পেলো 'সন্ন্যাসী-বৈরাগী' লেবাসের ভেতরে লুকায়িত নবী মুহাম্মদের রাজনৈতিক চেহারা। এক সাথে চৌদ্দশত সৈন্য নিয়ে মুহাম্মদের (দঃ) আগমন সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ আগে থেকেই সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। মহানবী তার দলবল নিয়ে মক্কাভিমুখে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে এসে তাবু গাড়লেন আর মুহাম্মদের (দঃ) বার্তা-বাহক হয়ে হযরত উসমান কোরায়েশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন যে, তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন কাবা ঘর দর্শন করতে। মুহম্মদ (দঃ) কৌশলে কোরায়েশদের এক ধরনের ভুল ধারণা দিতে চাইলেও তার মূল উদ্দেশ্য যে আসলে ছিলো মক্কা দখল, তা মুহম্মদের প্রথম জীবনিকার ইবনে ইসহাকের ভাস্য থেকে স্পষ্ট হয়[১০] -

> 'The apostle's companions had gone out without any doubt of occupying Mecca because of the vision which the apostle had seen, and when they saw the negotiations for peace and a withdrawal going on and what the apostle had taken on himself, they felt depressed almost to the point of death.'

এদিকে হজরত উসমানের ফিরতে দেরী হচ্ছিলো। এর মধ্যে মহানবীর তাবুতে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে উসমানকে কোরায়েশরা মক্কায় বন্দী করেছেন। খবর পেয়ে মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠলেন। আকাশিয়া বৃক্ষের নিচে নবীজির হাতে হাত রেখে মৃত্যু-শপথ নিলেন, মক্কা জয় না করে তারা ফিরে যাবেন না; ইসলামের ইতিহাসে এই শপথ 'বায়াতে রেদওয়ান' নামে অভিহিত। (দ্রষ্টব্য : সুরা ৪৮, ফাত্হ্, আয়াত ৪৮)। এর মধ্যেই উসমান ফিরে আসলেন এবং হজ (দেব-দেবী দর্শন) উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কতিপয় উপজাতীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে আপাতত দুইপক্ষ মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেল। তারা উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন, যা ঐতিহাসিক 'হোদাইবিয়া সন্ধি' নামে পরিচিত। আরব বিশ্বে মুহাম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী অপ্রতিরুদ্ধ এক বিরাট মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তারা বিনা যুদ্ধে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তারিখে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এসে মক্কা নগরী দখল করে নেন। বদর থেকে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে কমপক্ষে নয়টি যুদ্ধে মুহাম্মদ (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আরাফাতের ময়দানে তিনি তাঁর শেষ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণের দুই মাস পরেই ৬৩ বছর বয়সে রসুল মুহাম্মদ (দঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, তখন আবু-বকর তনয়া, নবীজির প্রিয় পত্নী আয়েশার বয়স আঠারো।

(৩)

মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরপরই অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করে বসেন মুহাম্মদের সর্বকনিষ্ঠ এবং প্রিয় পত্নী আয়েশার পিতা হজরত আবু বকর (রাঃ)। ক্ষমতার মোহে 'মক্কা থেকে পালিয়ে এসে মদিনায় আসন গেড়ে বসা' কোরায়েশ নেতাগণ মদিনার আনসারিদের কথা ভুলে গেলেন। মদিনাবাসীর কোনো দাবি ও প্রতিবাদ তারা কানেই তুললেন না। মদিনার মুসলমান নেতা হজরত সাদ (রাঃ) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, খলিফা নির্বাচিত হবে মদিনার আনসারিদের ভেতর থেকে। মদিনাবাসী শেষ পর্যন্ত মক্কার একজন এবং মদিনার একজন করে দুই খলিফা মেনে নিতে রাজি হলেন। তাদের এ দাবিও প্রত্যাখ্যান করা হলো। মদিনার ঘরে-বাইরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। হজরত আলি (রাঃ) ও মুহাম্মদের (দঃ) কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা (রাঃ) নবনির্বাচিত আবু বকরকে (রাঃ) প্রথম থেকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। প্রফেটের মেয়ে ফাতিমা ও তাঁর চাচা আব্বাস মুহাম্মদের (দঃ) মালিকানা, মদিনা ও খায়বারে রক্ষিত কিছু সম্পত্তি দাবি করায় এ নিয়ে আবু বকরের সাথে তাদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস পর বিভিন্ন সামাজিক দিক চিন্তা করে হযরত আলি (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) খেলাফত মেনে নেওয়ায় ঐ বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

আবু বকরের শাসনামলে, মুহাম্মদের (দঃ) সময়ের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত মানুষগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বিভিন্ন রাজ্যের অমুসলিম সরকারগণ তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপিত এতোদিনের 'জিজিয়া' কর দিতে অস্বীকার করলো। আরবের চতুর্দিকে বিদ্রোহের

[১০] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p. 505

ঝাণ্ডা উড়তে দেখা গেল; অসন্তুষ্টি ও ধর্মত্যাগের হিড়িক লেগে গেল। মুহাম্মদের (দঃ) দশ বছরের সংঘাতময় অশান্তির জীবন থেকে মানুষ মুক্তি চাইলো। অনেক নব্য মুসলমান তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ফিরে গেলো। বাহরাইনের শক্তিশালী বনু-বকর গোত্রের লোকজন (যারা প্রাণ রক্ষার্থে মুহাম্মদের (দঃ) সময়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল) প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করলো। কিছু ওম্মান বংশীয় লোকেরাও ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিল। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে হযরত আবু বকর জনগণের ওপর স্বৈরাচারী স্টিমরোলার চালিয়ে দিলেন। সেনাপতির দায়িত্বে নিয়োগ করলেন দুধর্ষ সাহাবি খালিদ বিন ওয়ালিদকে। উল্লেখ্য, ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে 'মুতা' যুদ্ধে নবীর জায়েদ ইবনে হারিথ নামের পালক পুত্র (ক্রীতদাস), হযরত আলির বড় ভাই জাফর, 'যোদ্ধা কবি' হিসেবে পরিচিত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নিহত হয়েছিলেন; পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো যোদ্ধারা। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ (দঃ) নিজেই সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁর (মুহাম্মদের) মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে।

প্রথম খলিফা নির্বাচন কি কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘটেছিলো?

মুসলিমদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, নবীজীর ওফাত-এর পর সর্বপ্রথমে হজরত আবুবকরকে খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করে তার পরে বোধ হয় তারা নবীজীর শেষকৃত্য করেছিলেন। আমাদের দেশে ইসলামের ইতিহাসে তাই পড়ানো হয়, যদিও এর স্বপক্ষে নিভুরযোগ্য কোন সুত্র নেই। ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য মুহম্মদের প্রথমদিককার জীবনীকারদের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে গন্য করা হয়। কারণ তাদের বর্ণনা অতিরঞ্জন এবং বিকৃতিমুক্ত। মুহম্মদের প্রথম জীবনীকার হচ্ছেন ইবনে ইসহাক। তার বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম ছিলো 'সিরাত-আল-নবী' বা সংক্ষেপে 'সিরাত'। এছাড়া, ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় সবচেয়ে প্রমান্য দলিল হিসেবে গন্য করা হয় ইবনে সাদের তাবাকাত, সহি বুখারি, এবং তারিখ আল্ তাবারি'র তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুককে। আমরা সে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ পুঁজি করেই এগুবো। সহি বুখারি ৮ম খন্ড, হাদিস নং ৮১৭; সিরাত (পৃঃ ৬৮৪); এবং তারিখ আল তাবারির তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুককের রেফারেন্স থেকে পাওয়া বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে,

- খলিফা নির্বাচন মোটেই 'গণতান্ত্রিক' কোন প্রক্রিয়ায় হয়নি, বরং তুমুল হট্টগোলের মধ্যে হঠাৎ করেই হয়েছিল।
- জনগণ আগে থেকে মোটেও অবগত ছিলো না, এবং
- দশ জন আশারা মোবাশ্শারা-র মধ্যে ঘটনাক্রমে মাত্র চার জন উপস্থিত ছিলেন, বাকি ৬ জন এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

নবী (দঃ) এর মৃত্যুর পরেই যখন সবাই নবীজীর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করছিলেন, তখন ওমরের কাছে খবর এল যে আনসাররা বনু সাদ' গোত্রের চত্বরে একজোট হয়ে নেতা বানাবার কথাবার্তা বলছে। ওমর উদ্বিগ্ন হয়ে নবীর ছুটে বাসায় এসে আবুবকরকে নিয়ে ছুটলেন বনু সা'দ-এর চত্বরে। পথে আরো দু'জন আশারা মোবাশশারা'র সাথে দেখা হলে তাঁরাও সঙ্গে চললেন। তারপর বাকি ৬ জন আশারা মোবাশশারা ও বেশীর ভাগ সাহাবীর অনুপস্থিতিতে এবং জনগণকে আগে থেকে কিছুই না জানিয়ে মাত্র কিছু লোকের উপস্থিতিতে তুমুল গালাগালি ও ঝগড়ার মধ্যে হজরত ওমর একেবারে হঠাৎ আবুবকরকে খলিফা ঘোষণা করে দিলেন। এই ঘটনা উপস্থিত জনগনের মধ্যে নিদারুন ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল যা মারামারি ধাক্কাধাক্কিতেও রূপ নেয় বলে বিবৃত আছে। এমনকি ওমরের দেয়া ভাষণেও এই আকস্মিক বা 'হঠাৎ করে' ঘটে যাওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। সহী বুখারির একটা দীর্ঘ হাদিসে (Volume 8, Book 82, Number 817) এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুহাম্মদের (দঃ) সেই অসম্পূর্ণ কাজটি পূর্ণ করতে, আবু বকর (রাঃ) প্রথমেই আক্রমণ করলেন সিরিয়ার ওপর। ইরানের খসরু পারভেজ, যিনি একসময় প্রফেট মুহাম্মদকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবু বকর (রাঃ) তাঁকেও শায়েস্তা করার লক্ষ্যে ইরান আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলেন। অনেক মুসলমান নেতাগণ এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। আবু বকরের (রাঃ) নির্দেশে

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) বেপরোয়া হয়ে আরবের একের পর এক গোত্রের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালাতে থাকেন। এক সাথে আবু বকরের (রাঃ) কমান্ডারগণ ছড়িয়ে পড়েন চতুর্দিকে; বাহরাইনে গেলেন আলা বিন হাদরামি, ইরানের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে বাইজেনটাইন পর্যন্ত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইরাকের উত্তর সীমান্তে আয়াজ বিন গানম। মাত্র দুই বছর তিন মাসের স্বৈরশাসনে আবু বকর গোটা আরবভূমিকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করেন। নিজেদের চৌদ্দপুরুষের ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে যায় ইহুদি, খ্রিস্টান, প্যাগান, অগ্নি উপাসক জরথুস্ত্রবাদীরা। অনেকেই পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় বিকল্প পথ হিসেবে তরবারির নিচে মাথা পেতে দেয়। আবার অনেকেই রাতের অন্ধকারে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ফেলে প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের সন্তান-সন্ততিসহ আরব থেকে বিতাড়িত হয়। এতে সারা আরবভূমি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় অর্থাৎ আরবে একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোনো ধর্মের স্থান রইল না। এরপর হযরত আবু বকর মৃত্যুর পূর্বে নিজের পছন্দমত নিযুক্ত করে যান আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক, যিনি নবীজি জীবিত থাকতে লৌহমানব হিসেবেই খ্যাত ছিলেন; হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)।

ওমর (রাঃ) মসনদে বসেই ইরাক ও ইরান নামক দুটি দেশকে একেবারে তছনছ করে দিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদের চেয়েও ভয়ঙ্কর, উবায়েদ, তালহা, জুবায়ের, আব্দুর রহমান, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও মোতানার মতো আরবের ত্রাসের হাতে তুলে দেন সামরিক ভার। ইরাক ও ইরানের কতো শত জীব, কতো মানুষ আর পশু যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের তলোয়ারের নিচে প্রাণ দিয়েছিল তার সঠিক হিসাব হয়তো কেউ কোনোদিন আর জানতে পারবে না। মোটামুটি সাড়ে দশ বছর শাসন-শোষণ করে মৃত্যুর পূর্বে ওমর তাঁর নিজের ও আবু বকরের একনায়কতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ ও তাঁর (ওমরের) পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে। তারা দুইজন অন্ধকার ঘরে গোপন বৈঠক করে নিয়ে এলেন নবী মুহাম্মদের দুই কন্যার স্বামী, উমাইয়া বংশের আফফানের পুত্র সত্তর বছর বয়স্ক হযরত উসমানের (রাঃ) নাম। হজরত আলি (রাঃ) চিৎকার করে বল্লেন—'আমি মানি না, এটা প্রহসন, ধর্মের নামে মিথ্যাচার, অন্যায়, এটা প্রতারণা!'

আরবি নববর্ষ, হিজরি ২৪ সনের মহর্‌রমের পহেলা তারিখ, ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর উসমান (রাঃ) ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসেবে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত সৈয়দ আমির আলির ভাষায় : "ধার্মিক এবং সৎ হলেও হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন অতিবৃদ্ধ ও দুর্বলচেতা মানুষ, প্রশাসনের ক্ষেত্রেও অনুপযুক্ত। অচিরেই তিনি পরিবারবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন, যা অনুমানই করা গিয়েছিল।" (দ্রষ্টব্য : *এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ স্যারাসিনস*, পৃষ্ঠা ৪৫)। উসমানের খেলাফত লাভে যারপর নাই খুশি হলো মক্কার উমাইয়াগণ, বিব্রতবোধ করলো হাশিমিগণ। পরপর তিনজন খলিফা ক্ষমতায় আসার পর, মক্কা থেকে আগত শরণার্থীদের দূরাভিসন্ধি সম্বন্ধে অভাগা মদিনাবাসীদের বুঝতে বাকি রইলো না। তারা বুঝতে পারলো, কোরায়েশগণ মদিনা দখল করে নিয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোতে মদিনাবাসীর কোনো স্থান নেই। এতদিন পরেও প্রফেট মুহাম্মদের (দঃ) কথিত 'সাম্যবাদী' ইসলাম মক্কা-মদিনার মুসলমান ও উমাইয়া-হাশিমিদের ভেতরকার বৈষম্য দূর করতে পারলো না। খলিফা উসমানের খেলাফতের মাধ্যমে এবার ইসলামের ঘরে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, যা হজরত আয়েশার যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয়। এই প্রবেন্ধর শেষভাগে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

উসমান (রাঃ) ক্ষমতা লাভের পরপরই এক বিরাট কাণ্ড করে বসেন। অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবিদের মতে যা ছিল, রসুল মুহাম্মদের সংবিধান 'আল-কোরানে'র পরিপন্থী। খলিফা উসমানকে একসাথে তিনটি খুনের এক আসামীর বিচার করতে হয়। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) ছেলে হজরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) একদিনে তিনটি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরকম : হজরত ওমরের কাছে, ফিরোজ আবু লুলু নামের এক ব্যক্তি, তার ওপর আরোপিত করের পরিমাণ কমানোর আবেদন জানায়; পারসিয়ান দেশের ফিরোজকে মুসলমানগণ এক যুদ্ধে বন্দী করে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিলেন। দাসত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ফিরোজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মে ফিরে যায়। হজরত ওমর (রাঃ) ফিরোজের 'কর কমানোর' অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কুফায় বসবাসকারী ফিরোজ কাঠমিস্ত্রি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সে মদিনায় চলে আসে। একদিন ওমরকে নির্জন মসজিদে পেয়ে ছুরি দিয়ে ছয়টা আঘাত করে এবং সে নিজেও আত্মহত্যা করে। ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার তিনদিন পর ওমর (রাঃ) মারা যান। পরদিন হজরত ওমরের ছেলে ওবায়দুল্লাহ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রথমে পারস্য থেকে আগত হরমুজান ও হজরত সাদের (রাঃ) ক্রীতদাস জুফাইনাকে খুন করেন। হরমুজান ও জুফাইনাকে খুন করে ওবায়দুল্লাহ ফিরোজের বাড়িতে যান। ফিরোজকে না পেয়ে তার মেয়েকে তিনি খুন করেন। একসাথে তিনজনকে হত্যার কারণ হিসেবে কথিত আছে, খলিমা ওমর যেদিন আহত হন, তার আগের দিন সন্ধ্যায় কোনো এক নির্জন স্থানে ওমর পুত্র ওবায়দুল্লাহ তাদের তিনজনকে একত্রে কানাকানি করতে দেখেছেন! হযরতের উসমানের খেলাফতকালে দ্বিতীয় খলিফা ওমর পুত্র দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার বসলো। পৃথিবী আজ এত বড় নৃশংস হত্যার ইসলামি আইনের সুবিচার দেখতে চায়। খলিফা উসমানের মুখের দিকে চেয়ে আছে মজলুম ওয়ারিশগণ। কোরান-হাদিস সামনে নিয়ে বসেছেন হজরত আলিসহ বেশ কয়েকজন শরিয়া বিশেষজ্ঞ সাহাবি। (তবে বলে রাখা ভালো কোরান-হাদিস তখনো পুস্ত

াকাকারে তৈরি হয়ে যায়নি; বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরো টুকরো কোরানের মেটারিয়েল বা আয়াতের হস্তলিপি ও মুহাম্মদের (দঃ) মুখের কথা ও কাজ যে যেভাবে শুনেছেন, বুঝেছেন, দেখেছেন তাই শরিয়ার আইন বলে মানতেন)। গণরায় হয়েই গেছে। ফিকাহ্ শাস্ত্রকারগণ একমত যে, দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের পুত্র ওবায়দুল্লাহর নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড হবে; কারণ, নিহত তিন ব্যক্তির একজন পারস্য থেকে আগত হরমুজান ছিলেন মুসলমান। শরিয়ত অনুযায়ী একজন মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। দ্বিতীয়জন একজন সাহাবির ক্রীতদাস। তৃতীয়জন একজন নারী, যে খলিফা ওমরের খুন সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং জড়িত নয়। হজরত আলি অপরাধী ওবায়দুল্লাহর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষে তার অভিমত প্রকাশ করলেন। সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস ও তাঁর মতো, হজরত ওমরের কয়েকজন গুণধর অনুগত বিচার চলাকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে হজরত আলির দেওয়া রায়ের প্রতিবাদ করলেন। খলিফা উসমান কোরান-হাদিস অনুসরণ করলেন না। শরিয়া আইন ও বিশ্ববিবেককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হজরত ওবায়দুল্লাহকে দণ্ডমুক্ত করে দিলেন। খলিফা ওমরের শত্রুরা বেজায় খুশি হলেও দুঃখিত হলো মদিনাবাসী। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মদিনার বিখ্যাত মুসলিম কবি জিয়াদ ইবনে লবিদ খলিফা উসমান, ঘাতক ওবায়দুল্লাহ ও শরিয়া আইনের ওপর ব্যঙ্গ করে এক কবিতা রচনা করলেন, লোকে প্রকাশ্যে মদিনার রাস্তায়-রাস্তায় সেই কবিতা আবৃত্তি করলো অনেক দিন। ব্যঙ্গ কবিতার খবর হযরত উসমানের কানে পৌঁছলে কবি জিয়াদ ইবনে লবিদকে ধরে নিয়ে এসে বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য সাবধান করে দিলেন।

কিছুদিন পরেই মদিনায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। ডাকাতি আর লুটের মালের গুদাম শূন্য হতে চলেছে। রাষ্ট্র আর চলে না। সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হলো মদিনাবাসী। তারা পেশায় ছিল কৃষিজীবী। লুটের ব্যবসায় অভ্যস্থ ছিল না, তাই তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। গনিমতের মাল (নারী ও সম্পদ) তাদের ভাগ্যে জুটতো না। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণের জীবিকা ছিল মেষ-ছাগল চড়ানো ও কাবা ঘরের সেবাযত্ন করা। আজ কোরায়েশগণ ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশরসহ সারা আরব-বিশ্বের প্রায় প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারি পদে অধিষ্ঠিত। মেষ পালক-পুরোহিত থেকে রাষ্ট্রনায়ক। প্রায় স্বপ্নের মতোই বদলে গেল আরবের মানচিত্র। দখলকৃত দেশে দেশে কোরায়েশ শাসকগণ অগণিত ক্রীতদাসীভোগ, অবাধ সম্পদের প্রাচুর্যে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। মদিনা থেকে উসমানের (রাঃ) কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ট্যাক্স পাঠাতে চিঠি লিখলেন দখলকৃত রাজ্যের গভর্নরদের কাছে। কিছুকিছু এলাকার অমুসলিম সরকারগণ ট্যাক্স পাঠানো তো দূরের কথা, তারা ইসলামি শাসন অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। স্বয়ং মুসলিম সরকার, মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) খলিফা হযরত উসমানের চিঠির উত্তরে জানালেন : 'উষ্ট্রী এর বেশি দুধ দিতে অপারগ।' তিনিই সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস, যিনি হজরত ওমরের খুনি পুত্র ওবাদুল্লাহকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য খলিফা উসমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবার খলিফা উসমান (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তিনি হজরত আমর ইবনুল আসকে পদচ্যুতির আদেশ দিলেন। তাঁর স্থলে পৌর্ট সাঈদের সামরিক শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহকে সমগ্র মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। প্রসঙ্গত এখানে হজরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ (রাঃ) সম্পর্কে পূর্বের একটি ঘটনার বর্ণনা 'পুনরায়' উল্লেখ করছি : ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মক্কা দখলের পর মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর কয়েকজন (আট/দশজন) সঙ্গী-সাথী, সহকর্মী ও এককালের শুভাকাঙ্ক্ষীদের হত্যার তালিকা তৈরি করলেন। আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ তাদের একজন। তাদেরকে হত্যা করা হবে; কারণ মুহাম্মদের (দঃ) সন্দেহ হলো এরা একদিন তাঁর 'নবীত্ব' ও 'ইসলাম ধর্ম'কে মিথ্যা প্রমাণিত করে ফেলবে।

কোরানের প্রথম সংকলক আবদুল্লাহ্ বিন সাদ কেন মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন?

আবদুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ মুহাম্মদের (দঃ) মুখে বলা কোরান মাঝে মাঝে লিখে রাখতেন। মুহাম্মদ (দঃ) মাঝে মাঝে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ঘটনায় কিছুকিছু পরিবর্তন করে ফেলতেন, এবং আব্দুল্লাহ বিন সাদ সেটা ধরে ফেলতেন। আব্দুল্লাহ বিন সাদের মনে কোরানের অলৌকিকত্ব নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। আস্তে আস্তে সন্দেহ গাঢ় হলে তিনি কৌশলে নবীজির সামনেই কোরানের আয়াত সংশোধন করে ফেলেন; কিন্তু এতে নবীজি কোনো দ্বিমত করলেন না। তখন আব্দুল্লাহ বিন সাদের কথিত 'আল্লাহর বাণী' কোরানের ওপর থেকে বিশ্বাস ওঠে যায় এবং প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে মক্কার কোরায়েশ বংশের পৌত্তলিকদের সাথে যোগ দেন। কপাল ভাল যে, মক্কা অভিযানের পরপরই নবীজির তৈরি করা হত্যা তালিকায় সর্বাগ্রে থাকা আব্দুল্লাহ বিন সাদের নাম সৎভাই (*টমেতরে বরতেভরে*) হজরত উসমান আগেই জেনে গিয়েছিলেন। হজরত উসমান মুহাম্মদের (দঃ) কাছে আবদুল্লাহ বিন সাদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। মুহাম্মদের (দঃ) আদেশ পেয়ে ঘাতক শাণিত তরবারি হস্তে

শিরোপরে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর দুই মেয়ের স্বামী, জামাতা উসমানের অনুরোধ উপেক্ষা করে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারলেন না; চুপ করে রইলেন। আবদুল্লাহ বিন সাদ (রাঃ) প্রাণ ভিক্ষা পেলেন। নবীজির এক সময়কার প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত কোরান লেখক আবদুল্লাহ বিন সাদের 'অপরাধের' প্রমাণ আজো কোরানেই আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ী (মৃত ১২৮৬) তাঁর তাফসির '*আছরারুত্ তান্‌জিল ওয়া আছরারুত্ তা'য়ীল*' (Asrar ut-tanzil wa Asrar ut-ta'wil) গ্রন্থে বর্ণনা করেন[১১] : একদিন মুহাম্মদ (দঃ) সুরা আলমুমিনুন এর ১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত বাক্যগুলো (আয়াত) লিখার জন্যে আবদুল্লাহ বিন স'াদকে বললেন। বাক্যগুলো ছিল : 'আর আমরা নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে।' (আয়াত ১২)। 'অতঃপর আমরা তাকে বীর্যরূপে এক নিরাপদ অবস্থান স্থলে স্থাপন করি।' (আয়াত ১৩)। 'এরপর আমরা বীর্যকে তৈরি করেছি একটি জমাট রক্তপিণ্ডে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে মাংসপিণ্ড তৈরি করেছি, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে হাড় তৈরি করে, অতঃপর হাড়গুলোকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি।' (আয়াত ১৪)। রসুল মুহাম্মদ ১৪নং বাক্যটুকু বলার পর আব্দুল্লাহ বিন সাদ তাঁর সাহিত্যিক ভাষায় বলে উঠলেন, 'নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!' প্রফেট বললেন, 'এই বাক্যটাও লাগিয়ে দাও।' আবদুল্লাহ বিন সাদ হতবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন বিষয়টা কি, আমার মুখের কথা অল্লাহর বাণী হয় কিভাবে? আস্তে আস্তে আবদুল্লাহ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে কোরান মুহাম্মদ বানিয়ে বানিয়ে তৈরি করছেন, এসব কোনো ঐশীবাণী নয়।[১২] এরপর তিনি নবীজি এবং কোরানের ওপর আস্থা না রাখতে পেরে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নবী মুহাম্মদ থেকে দূরে সরে গেলেন।[১৩]

এখন আমরা সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আসের (রাঃ) পরিচিতিটুকুও জেনে নিলে পরবর্তী ঘটনা ঝুঝতে সুবিধা হবে। হজরত ওমর (রাঃ) যখন ইরাক দখলের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, লোকে বললো, আবু বকরের (রাঃ) আমলের সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ছাড়া ইরাক দখল করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, খালিদ বিন অলিদের চেয়েও বিচক্ষণ শক্তিশালী সেনাপতি আমার আছে। তিনি হজরত আমর ইবনুল আসের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। আমর ইবনুল আস শুধু ইরাকই নয়, পশ্চিম সিরিয়া, জেরুজালেমও দখল করে নেন। হজরত ওমর (রাঃ) খুশি হয়ে তাকে মিশর দখল করার দায়িত্ব দেন। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে আমর ইবনুল আস প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের চেয়েও পরাক্রমশালী যোদ্ধা। আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে তিনি খলিফা ওমরকে (রাঃ) চিঠি লিখলেন : "আমিরুল মুমেনিন, আজ আমি এমন একটি জাতিকে আপনার দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলাম, যারা কোনোদিন পরাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। এমন একটি নগরী আপনার পদতলে উপহার দিলাম, যে নগরীতে চার হাজার প্রাসাদ ও চার হাজার হাম্মাম (গোসলখানা) রহিয়াছে। চারশত ভোজনাগার ও প্রমোদালয় আছে, যেখানে এসে গ্রিক-রাজপুত্রগণ পানাহার ও চিত্তরঞ্জন করিতো। এই নগরীর এক প্রান্থে সুপ্রসিদ্ধ সিরাপিয়াম, যার ভিতরে দেবী সিরাপার মন্দির ও আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পাঠাগার অবস্থিত। অপর প্রান্থে বিখ্যাত সিজারির মন্দির, যাহা মিশর বিজয়ী খ্যাতনামা জুলিয়াস সিজারের সম্মানে রাণী ক্লিওপেট্রা কতৃক নির্মিত হইয়াছিল।" চিঠি পেয়ে খলিফা ওমর (রাঃ) যারপর নাই খুশি হলেন। প্রায় চৌদ্দমাস যুদ্ধ করে আমর ইবনুল আস (রাঃ) রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন হিজরী বিশ সনে। গ্রিকগণ এ পরাজয় মেনে নিতে পারলো না। তাদের সম্রাট হিরোক্লিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে, আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি নেন।

(৪)

[১১] '*The Secrets of Revelation and The Secrets of Interpretation*' edited by H. O. Fleischer, 2 vols., Leipzig, 1846-1848; indices ed. W. Fell, Leipzig, 1878.

[১২] Abdu'llah bin Sa'ud bin Abi Sarih was an amanuensis of the Prophet. And, when the words descended 'We created man of fine clay;' and when the words were finished. Then brought We forth him by another creation;' 'Abdu'llah exclaimed 'Blessed therefore be God the most excellent of Makers. He has created man in a wonderful manner.' Upon this (Muhammad) said, 'Write those (words) down, for so it has descended.' But 'Abdu'llah doubted and said, 'If Muhammad speak truth, then on me also has inspiration descended as upon him; and if Muhammad speak falsely, then verily I but speak as he did.' Please see: http://www.mukto-mona.com/Articles/akash/abdulla_bin_sad.pdf

[১৩] আরো দেখুন : Al-Wahidi Al-Naysaboori, '*Asbab Al-Nuzul*' (*Great Commentaries on the Holy Qur'an*), Beirute's Cultural Libary Edition, "Tub'at Al-Maktabah Al-thakafiyyah Beirute", Page 126.

পাঁচ বছর পর হিজরি পঁচিশ সনের কথা। ইতোমধ্যে উসমান (রাঃ) কর্তৃক আমর ইবনুল আস মিশরের শাসন কর্তৃত্ব হতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছেন। গ্রিক সম্রাট কনস্টানটাইন, এক বছরের মধ্যে শুধু আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দখলদার মুসলিমদিগকে বিতাড়িত করেননি, সমগ্র মিশরকেও মুসলিম শাসনমুক্ত করে ফেলেন। বিপদে পড়লেন খলিফা উসমান (রাঃ)। বাধ্য হয়ে সাহাবি আমর ইবনুল আসের শরণাপন্ন হলেন এবং মিশর পুনরুদ্ধারের অনুরোধ জানালেন। প্রায় বিনা যুদ্ধেই আমর ইবনুল আস মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া পুনরায় মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসেন। খলিফা উসমান বাধ্য হয়ে আমর ইবনুল আসকে মিশরের সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে দেন; কিন্তু গভর্নর থাকলেন আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ। মিশরে গর্ভনর আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ ও সেনাবাহিনী প্রধান আমর ইবনুল আসের দ্বৈত শাসন শুরু হলো। এই দুই সাহাবি একে অপরের চক্ষুশূল ছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাঁরা একে অপরের ব্যাপারে পরস্পর-বিরোধী নির্দেশ জারি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটির তদন্তের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং খলিফা উসমান। হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদের অভিযোগ হলো : 'হজরত আমর ইবনুল আস গ্রিকদের সাথে যুদ্ধকালে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে, সাধারণ মানুষের বাড়িঘর লুণ্ঠন করে প্রচুর মালামাল আত্মসাৎ করেছেন। অনেক গ্রিক নারীকে তাঁর ব্যক্তিগত দাসীরূপে রেখে দিয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করছেন।' পক্ষান্তরে আমর ইবনুল আসের (রাঃ) অভিযোগ হলো : 'আবদুল্লাহ বিন সাদ ঔদ্বত্যপূর্ণ ও রুক্ষ চরিত্রের মানুষ। তিনি নবীজির অভিশপ্ত লোক এবং কোরানকে 'আল্লাহর বাণী' বলে বিশ্বাস করেন না।' আবদুল্লাহ বিন সাদের ওপর আনীত শেষোক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে সম্ভবত হজরত উসমানের চেয়ে বেশি কেউ জানতেন না। তিনি তাঁর দুধভাইকে তিনদিন নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে মুহাম্মদের (দঃ) কতলাদেশ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। খলিফা উসমান বিচারে হজরত আমর ইবনুল আসকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে আবারো বহিষ্কার করে উসমান যেন সর্পের গর্তে হাত দিলেন। হজরত আমর ইবনুল আস, খলিফা উসমানের স্বজনপ্রীতিতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সিংহের মতো গর্জে উঠলেন। তিনি সোজা মদিনায় চলে এলেন। এবার প্রতিশোধ গ্রহণের পালা। আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে হযরত উসমান ক্ষমতায় আসার মাত্র এক বছরের মধ্যে একদিকে রাষ্ট্রের যেমন অভ্যন্তরীণ বিরোধ, অঙ্গরাজ্যের গভর্নরদের কর প্রদানে অনিয়ম, অন্যদিকে হাশিমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যকার তিক্ততা এবং সর্বোপরি মদিনায় খাদ্যাভাবে খলিফা ভীষণ চিন্তিত হলেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন সিরিয়ার গভর্নর (উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান পুত্র) হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)। পরামর্শ দিলেন আর্মানিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এশিয়া মাইনর আক্রমণ করতে হবে। উসমান (রাঃ) ক্ষমতায় আরও কিছুদিন থাকার ভরসা পেলেন, অন্তত আয়ের একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল; কারণ যুদ্ধ মানেই প্রচুর গনিমতের মাল অর্জন। হজরত মুয়াবিয়ার কথামতো খলিফা উসমান কুফার সালমান বিন রুবাইয়াকে আট হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হতে নির্দেশ দেন। আর্মানিয়ার পথে সেনাপতি সালমান (রাঃ) তাঁর দল নিয়ে সিরিয়া বাহিনীর সাথে মিলিত হন। পারস্য ও গ্রিসের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চল আর্মানিয়া চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির দৃষ্টিগোচরে ছিল। আর্মানিয়ার স্বাধীনচেতা অধিবাসীদের কেউই বেশিদিন আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এ দেশ পারস্য ও গ্রিস কর্তৃক বহুবার অধিকৃত হয়েছে। হজরত ওমরের (রাঃ) মুসলিম বাহিনী যখন গ্রিকদের হাত থেকে অঞ্চলটি দখল করে, তখনও আর্মানিয়াগণ জানতো, এ অধীনতা সাময়িক। খলিফা উসমানের সময়ে তারা মদিনায় কর পাঠানো বন্ধ করে দিল। হিজরি পঁচিশ সনের শেষের দিকে সিরিয়া ও ইরাকের সম্মিলিত বিরাট মুসলিম সেনাবাহিনী আর্মানিয়ার পর্বতমালা অতিক্রম করে তার অভ্যন্তরীণ মালভূমি এলাকায় এসে উপনীত হয়। ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর মাত্র কিছুটা দিন আর্মানিয়ানগণ শান্তিতে ছিল। আবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো পাহাড়ি অঞ্চল। স্বাধীনচেতা আর্মানিয়ানগণ দেশমাতৃকার জন্যে অকাতরে জীবন দিতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসলো। ক্ষুধার্ত সিংহের মতো তাঁদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো মুসলিম সৈন্যগণ। লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমদের তেজস্বী তলোয়ারের নিচে গলা পেতে দিল আর্মানিয়ার সহস্রাধিক তাজা প্রাণ। পাহাড়ের শ্বেতবর্ণের ঝর্ণারাশি রঙিন হলো আর্মানিয়ানদের রক্তের স্রোতধারায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হারে কর দেবার শর্তে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। আর্মানিয়া দখল করে মুসলিম সেনাবাহিনী স্বদেশে ফিরে গেলেন না। তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ পুরোদমে চালিয়ে গেলেন। বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল মুসলমানগণ অতি সহজেই আর্মানিয়ার পশ্চিম দিকে তিফলিশ নগরী দখল করে কৃষ্ণসাগর তীরে এসে পৌঁছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে লেভান্ট শহর। এখানে গ্রিকদের সাথে তাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলিম সৈন্যদের গতিরোধ করার মতো শক্তি সম্ভবত তখনকার পৃথিবীতে কারো ছিল না। সুতরাং তারা এখানেও জয়ী হলেন। দেশের পর দেশের, যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কৃষ্টি ও সনাতন সভ্যতা ধ্বংস করে মুসলমানগণ আত্মতৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু কাসপিয়ান থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, আরব জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। হজরত ওমরের আমলের দখলকৃত কিছু কিছু এলাকায় তাঁর জীবিত থাকাকালেই বিদ্রোহ চলছিল। তন্মধ্যে পারস্যের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত ওমরের (রাঃ) যুগের পলাতক পারস্য সম্রাট ইয়াযদ্‌গার্দ খলিফা উসমানের শাসনকালে মুসলমানদের হাত থেকে স্বদেশ পুনুরুদ্ধারের প্রস্তুতি নিলেন। অষ্টাশি বছর বয়স্ক ইয়াযদ্‌গার্দকে 'সিংহ-রূপী' মুসলমানদের সম্মুখ হতে 'মূষিক ছানা'র মতো পালিয়ে খোরাসানে আশ্রয় নিতে হলো। খোরাসান ছিল

পারস্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এলাকা। হজরত উসমান (রাঃ) ঘোষণা দিলেন, যে আগে খোরাসানে প্রবেশ করতে পারবে, সেই হবে সেখানকার শাসনকর্তা। সুতরাং মুসলিম বাহিনী এলাকাটি দখল করে নিতে আর দেরি করলেন না। এ ছিল ছয়শত একান্ন খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

ভূমধ্যসাগর, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলভাগ বিধৌত করায়, সাগরবক্ষ হতে উল্লিখিত দুই মহাদেশের উপকূলবর্তী জনপদসমূহের ওপর আক্রমণ করার স্বপ্ন হজরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) রাত দিন তাড়া করতো। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব মেডিটারেনিয়ান এলাকায় অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপটি দখলের অভিপ্রায় তাঁর বহুদিনের। হজরত ওমরের সময়ে মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস, পাকিস্তান (তখনকার সময়ের ভারতবর্ষ) ও ভারতের কিছু সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তখন তাঁর সেনাপতি আমর ইবনুল আসের পরামর্শে হজরত মুয়াবিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খলিফা উসমানের কাছে হজরত মুয়াবিয়া আবার সাইপ্রাস দ্বীপ দখলের প্রস্তাব পাঠালেন। জলযুদ্ধে মুসলিমদের অদক্ষতার কথা স্মরণ করে খলিফা উসমান সংকিত হলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার সাইপ্রাস দখলের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। যুদ্ধের অনুমতি দিলেন সত্য, তবে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। উসমান তাঁর খেলাফতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন : বিগত অনেক যুদ্ধে বিভিন্ন এলাকার অমুসলিম, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কিছুকিছু লোক শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর বিশ্বাস এরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে একদিন ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করবে। খলিফার এই বিশ্বাস মোটেই অমূলক ছিল না। ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছিল যে যুদ্ধই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়।

মুহম্মদ (দঃ) এবং তার পরবর্তী খলিফাদের সময়কালে সংঘটিত যুদ্ধ

মুহম্মদের জীবনীকারদের দেয়া তথ্যের সাপেক্ষে জানা যায় যে মহানবী তার জীবনের শেষ ২৩ বছরে প্রায় সত্তুর থেকে একশতটি হানা যুদ্ধের (Raid) সাথে জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে সতের থেকে উনত্রিশটি যুদ্ধে তিনি নিজে নেতৃত্ব দেন। নীচে মুহম্মদের (দঃ) সময়ের এবং তার পরবর্তী প্রধান প্রধান যুদ্ধগুলোর তালিকা দেয়া হল-

৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - বোয়াতের যুদ্ধ
৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - কাহারের যুদ্ধ
৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - ওয়াদ্দানের যুদ্ধ
৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - সাফওয়ানের যুদ্ধ
৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - জুল আশিরের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - নাখালার যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বদরের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বনি সালিমের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - 'ঈদ-উল-ফিতর' এবং 'জাকাত উল ফিতর'-এর যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বনি কায়নুকার যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বনি সাওয়িকের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - ঘাটফানের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বাহরানের যুদ্ধ
৬২৫ খ্রীস্টাব্দ - ওহুদের যুদ্ধ
৬২৫ খ্রীস্টাব্দ - হামরা-আল আসাদের যুদ্ধ
৬২৫ খ্রীস্টাব্দ - বনি নাদিরের যুদ্ধ
৬২৫ খ্রীস্টাব্দ - জাতুর রিকা যুদ্ধ
৬২৬ খ্রীস্টাব্দ - বাদরু উকরা যুদ্ধ
৬২৬ খ্রীস্টাব্দ - জুমাতুল জানদালের যুদ্ধ

৬২৬খ্রীস্টাব্দ - বনি মুস্তালিকের যুদ্ধ
৬২৭খ্রীস্টাব্দ - আহজাবের/ খন্দকের যুদ্ধ
৬২৭খ্রীস্টাব্দ - বনি কুরাইজার যুদ্ধ
৬২৭খ্রীস্টাব্দ - বনি লাহয়ানের যুদ্ধ
৬২৭খ্রীস্টাব্দ - খাইবারের যুদ্ধ
৬২৮খ্রীস্টাব্দ - হুদায়বিয়ার ক্যাম্পেইন
৬৩০খ্রীস্টাব্দ - মক্কা দখল
৬৩০খ্রীস্টাব্দ - হানসিনের যুদ্ধ
৬৩০খ্রীস্টাব্দ - তাবুকের যুদ্ধ

৬৩২ সালে মুহম্মদ (দঃ) মৃত্যুবরণ করলে প্রথম খলিফা হন মুহম্মদের শ্বশুর আবু বকর (রাঃ) । তার নেতৃত্বে অনেকগুলো আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হয় । তার মধ্যে আছে -

৬৩২খ্রীস্টাব্দ- ওমান (দাবার যুদ্ধ), ইয়েমেন, ইয়ামাহ এবং উত্তর আরবের যুদ্ধ ।
৬৩৩খ্রীস্টাব্দ- সিরিয়া, মাহারা, হাদ্রামাউত, কাজিমা, ওয়ালাজা, উলিস এবং আনবারের যুদ্ধ ।
৬৩৪খ্রীস্টাব্দ- পারশিয়া, সিরিয়ার যুদ্ধ, বাসরা, ডামাস্কাস এবং আজনাদিনের যুদ্ধ ।

৬৩৪ সালে আবু বকর (রাঃ) মারা গেলে, মুহম্মদের আরেক শ্বশুর এবং সহযোদ্ধা হজরত ওমর (রাঃ) খলিফা হন । তার সময়ে ওমরের নির্দেশে যে যুদ্ধগুলো পরিচালিত হয় তা হল -

৬৩৪খ্রীস্টাব্দ- নামারাক এবং সাকাটিয়ার যুদ্ধ ।
৬৩৫খ্রীস্টাব্দ- ব্রিজ, বুয়াইব, দামাস্কাস এবং ফালের যুদ্ধ ।
৬৩৬খ্রীস্টাব্দ- ইয়ারমুক, কাদিসিয়া এবং মাদাইনের যুদ্ধ ।
৬৩৬খ্রীস্টাব্দ- জালুলার যুদ্ধ ।
৬৩৮খ্রীস্টাব্দ- ইয়ারমুক, জেরুজালেম এবং জাজিরার যুদ্ধ ।
৬৩৯খ্রীস্টাব্দ- খাজিস্তান এবং মিশরের লড়াই ।
৬৪১খ্রীস্টাব্দ- নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ ।
৬৪২খ্রীস্টাব্দ- পারশিয়ার যুদ্ধ ।
৬৪৩খ্রীস্টাব্দ- আজারবাইজানের যুদ্ধ ।
৬৪৪খ্রীস্টাব্দ- ফার এবং খারানের যুদ্ধ ।

হজরত ওমর ৬৪৪ সালে নৃশংসভাবে নিহত হবার পর ক্ষমতায় বসেন হজরত উসমান (রাঃ) এবং ইসলামের নামে যুদ্ধ চালিয়ে যান -

৬৪৭খ্রীস্টাব্দ- সাইপ্রাসের যুদ্ধ যুদ্ধ ।
৬৫১খ্রীস্টাব্দ- বাইজেন্টাইনের লড়াই ।
৬৫১খ্রীস্টাব্দ- উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের বিস্তার ।

খলিফা উসমানকেও হত্যা করা হয় ৬৫৬খ্রীস্টাব্দে । মহানবী তনয়া ফাতিমার স্বামী হজরত আলীর ক্ষমতা লাভ । এ সময় ইসলামের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এমনই ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, মুসলিমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে লজ্জাজনক যুদ্ধে জড়িয়ে পরে । এর মধ্যে অন্যতম হল-

৬৫৬খ্রীস্টাব্দ- হজরত আলী এবং মহানবীর স্ত্রী আয়েশার মধ্যকার 'জামালের যুদ্ধ' ।

৬৫৭খ্রীস্টাব্দ- হজরত আলী এবং মুয়াবিয়ার মধ্যকার 'সিফফিনের যুদ্ধ' ।

এ ছাড়া আরো যে ক'টি যুদ্ধ হজরত আলীর সময়ে সংগঠিত হয় সেগুলো হল -

৬৫৮খ্রীস্টাব্দ- হজরত নাহরোয়ানের যুদ্ধ ।
৬৫৮খ্রীস্টাব্দ- মিশরের যুদ্ধ ।

হজরত আলী ৬৬১খ্রীস্টাব্দে বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে নিহত হলে, একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন মুয়াবিয়া । মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে 'ইসলামী সাম্রাজ্য' বিস্তৃত হতে থাকে পুরোদমে -

৬৬২খ্রীস্টাব্দ- মিশর ইসলামের পদানত ।
৬৬৬খ্রীস্টাব্দ- সিসিলি আক্রমণ ।
৬৬৭খ্রীস্টাব্দ- কনস্টানটিপোল আক্রমণ ।
৬৮৭খ্রীস্টাব্দ- কুফার যুদ্ধ ।
৬৯১খ্রীস্টাব্দ- দের-উল-জালিকের যুদ্ধ ।
৭০০খ্রীস্টাব্দ- উত্তর আফ্রিকায় সামরিক ক্যাম্পেইন ।
৭০২খ্রীস্টাব্দ- দের-উল-জামিলার যুদ্ধ ।
৭১১খ্রীস্টাব্দ- স্পেন আক্রমণ
৭১২খ্রীস্টাব্দ- সিন্ধুর লড়াই ।
৭১৩খ্রীস্টাব্দ- মূলতানের লড়াই ।
৭১৬খ্রীস্টাব্দ- কনস্টানটিপোল দখল ।
৭৩২খ্রীস্টাব্দ- ফ্রান্সের যুদ্ধ ।
৭৪০খ্রীস্টাব্দ- নোবেলের যুদ্ধ ।
৭৪১খ্রীস্টাব্দ- উত্তর আফ্রিকায় বাগদুয়ারার যুদ্ধ ।
৭৪৪খ্রীস্টাব্দ- আইন আল জারের যুদ্ধ ।
৭৪৬খ্রীস্টাব্দ- ডুপার ঠাত্তার যুদ্ধ ।
৭৪৮খ্রীস্টাব্দ- রেয়'র যুদ্ধ ।
৭৪৯খ্রীস্টাব্দ- ইশফাহান এবং নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ ।
৭৫০খ্রীস্টাব্দ- জ্াবের যুদ্ধ ।
৭৭২খ্রীস্টাব্দ- উত্তর আফ্রিকায় জানবির যুদ্ধ ।
৭৭৭খ্রীস্টাব্দ- স্পেনের সারাগোসার যুদ্ধ ।

অনুমতি পেয়ে হজরত মুয়াবিয়া সারা দেশে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সৈনিক আহ্বান করলেন । জলযুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হলো । রাজধানীতে মানুষ দলে দলে সৈনিকের খাতায় নাম লেখানোর তোড়জোড় পড়ে গেল । কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট শক্তিশালী নৌবহর গড়ে উঠলো । হজরত আবদুল্লাহ বিন-কায়েস আল হারেসির নেতৃত্বে আল্লাহর নাম নিয়ে, হিজরি আটাশ সনে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস উপকূলে এসে পৌঁছে । গ্রিক নৌ-বাহিনীর সাথে পরদিন শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ । প্রথম দিনের যুদ্ধেই মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন-কায়েস তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হলেন । খবর পেয়ে মদিনায় খলিফা উসমান চিন্তিত হলেন । তাড়াতাড়ি মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন সাদকে সাইপ্রাস অভিমুখে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন । মিশর থেকে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ সৈন্য নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে গেল । অল্পদিন পরে মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলিত নৌ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গ্রিকবাহিনী পরাজয় বরণ করে । বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ মুয়াবিয়া সাইপ্রাস অধিবাসীগণের ওপর জিজিয়া কর ধার্য না করে রাষ্ট্রের ওপর বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) কর আরোপ করেন । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেন । মুয়াবিয়ার পরামর্শে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ নৌবহর বোঝাই করে যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন কায়েস অন্য একটি যুদ্ধে মারা যান । জীবিতকালে হজরত আবদুল্লাহ বিন কায়েস কমপক্ষে ৫০টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যুদ্ধলব্ধ বাড়তি সম্পদও আসতে থাকলো। কিন্তু এই লুটের সম্পদ দেশের উন্নয়ন বা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যবহার হলো না। ক্ষমতা ও সম্পদ দুটোই রইলো কোরায়েশদের হাতে। দিনদিন শাসক ও শোষিতের মধ্যকার বৈষম্য বাড়তেই থাকলো। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সৈন্যগণ ধ্বংস ও লুটের কাজে লিপ্ত রইলো আর এদিকে রাজ্যের অভ্যন্তরে শাসকগণ ভোগবিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া যখন হজরত উসমানকে আর্মানিয়া আক্রমণ করতে পরামর্শ দেন, প্রায় একই সময়ে মিশরের আব্দুল্লাহ বিন সাদ ত্রিপলি (বর্তমানে লিবিয়ার রাজধানী) আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। আমর ইবনুল আসের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে তাকে অপেক্ষা করতে হলো অনেকদিন। হজরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ পুনরায় ত্রিপলি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন এবং উসমানকে সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানান। খলিফা হযরত উসমান মদিনা থেকে একদল বিশেষ যোদ্ধা ত্রিপলি অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এক পর্যায়ে রণভঙ্গ দিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ যখন পশ্চাদগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মদিনা থেকে আগত তেজস্বী বীর কোরায়েশ যোদ্ধা হজরত জোবায়ের, আবদুল্লাহ বিন সাদকে একটি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন : "মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করা হউক, যে ব্যক্তি ত্রিপলির গভর্নর গ্রিগেরিয়াসের মাথা কেটে আনতে পারবে, তাঁকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও সেই সাথে গ্রিগেরিয়াসের সুন্দরী যুবতী কন্যা দান করা হবে।" যেই ঘোষণা সেই কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিগেরিয়াসের মাথাটা দ্বিখণ্ডিত করে মুসলিম সেনাশিবিরে হাজির করা হলো। সাথে বন্দিনী সেই অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী গ্রিগেরিয়াসের বীরকন্যা, যিনি অস্ত্র হাতে সব সময় পিতার পাশে-পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার বণ্টনে মুসলিম সেনাপতির কোনো অসুবিধা হয়নি, সমস্যাটা হলো সেই মেয়েকে নিয়ে। একটিমাত্র মেয়ের দিকে হা করে তৃষ্ণার্থ চোখে তাকিয়ে আছে এক পাল কাম ক্ষুধার্ত সৈন্য। রাজকন্যা নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। গ্রিগেরিয়াসের বীরকন্যা পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুকেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন। কোনো মুসলিম সৈন্যের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

ত্রিপলি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যে বিপুল ধনরত্ন লাভ করেন, তা দেখে খলিফা উসমান (রাঃ) খুশিতে আত্মহারা হয়ে, বিজয়ী বীরনেতা আব্দুল্লাহ বিন সাদকে (রাঃ) 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধে এতো সম্পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি। নিয়মানুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব খাতে জমা হওয়ার কথা। প্রফুল্লতায় বিভোর উসমান (রাঃ) এই বিপুল সম্পদের প্রায় সবটুকুই আবদুল্লাহ বিন সাদকে ও তাঁর নিজস্ব মন্ত্রী মারওয়ানকে দিয়ে দেন। তবে এ ছাড়া খলিফার কোন উপায়ও ছিল না। বাইতুলমাল শূন্য রাষ্ট্র-পরিচালনায় যখন উসমান (রাঃ) হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন আর্মানিয়া ও ত্রিপলি যুদ্ধই তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র সহায় ছিল। তাই খলিফা নিজেই ত্রিপলির যুদ্ধপূর্বে আব্দুল্লাহ বিন সাদকে, যুদ্ধে জয়ী হলে এরূপ সম্পদ বণ্টনের অঙ্গীকার করেছিলেন। বিষয়টা জনগণ প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারলো না। উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ বিন সাদ ও মারওয়ান এরা দু-জনই ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং খলিফা হজরত উসমানের (রাঃ) আত্মীয়। ত্রিপলি জয় করে মুসলিম সৈন্যদল আলজিরিয়া ও মরক্কো দখল করে নেয়। এবার মরক্কোর উত্তরে সমুদ্রের অপর পাড়ে ফুলে-ফলে ভরা শস্য-শ্যামলা তরুরাজি আচ্ছাদিত, লোভনীয় স্পেন ভূমির ওপর তাদের দৃষ্টি পড়লো। সংবাদ পেয়ে খলিফা উসমান লোভ সামলাতে পারলেন না। তড়িঘড়ি করে মদিনা থেকে একদল সৈন্যসহ আব্দুল্লাহ বিন নাফে বিন হাসিন ও আব্দুল্লাহ বিন নাফে বিন আবদে কায়েস নামক দুজন পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে স্পেন অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। কোরায়েশ মরু-দস্যুরা তখনো জল-দস্যুতার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাই সমুদ্র-পাড়ে এসে তারা স্পেন দখলের আশা আপাতত ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। আব্দুল্লাহ বিন সাদ যখন সাইপ্রাস উপকূলে জলযুদ্ধে ব্যস্ত, হজরত মুয়াবিয়া তখন স্থলযুদ্ধে কনস্টানটাইন দখল করতে বেরিয়ে পড়েন। কনস্টানটাইন দখল করতে মুয়াবিয়া (রাঃ) দু'বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কিন্তু ঐ বছরই তিনি আর্জরুম প্রদেশের অন্তর্গত হাস আল-মুরাত নামক এলাকাটি দখল করতে সক্ষম হন।

খলিফা উসমানের শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা কেমন ছিল তা জানার লক্ষ্যে এবারে কুফা ও বসরার প্রতি একটু নজর দেয়া যাক। হজরত ওমরের (রাঃ) আমলে কুফার গভর্নর ছিলেন হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। খলিফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে একটি মহৎ কাজ করে গেলেন; সরকারি সম্পদের অপচয়কারী, চরম অমিতব্যয়ী মাত্রাতিরিক্ত সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) কুফার গভর্নর পদ থেকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে হজরত মুগিরা ইবনে শোবাকে (রাঃ) নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভাগা সাধারণ কুফাবাসীর দুর্গতি দূর হলো না। হজরত মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) অত্যন্ত রুক্ষ-কঠোর ঔদ্বত্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বৈষম্যমূলক অশ্লীল আচরণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র ও জনগণের প্রতি চরম অবজ্ঞার খবর খলিফা উসমানের কানে পৌঁছিলে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে মুগিরা ইবনে শোবাকে (রাঃ) গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু জনগণকে হতাশ করে হজরত উসমান আবার সেই সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। হজরত সাদ (রাঃ) সুযোগ বোঝে পূর্বের চেয়েও অধিক বিলাসী হয়ে উঠলেন। শুধু তা-ই নয়, এবারে তিনি বাইতুলমাল থেকে বিপুল পরিমাণের সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে বসলেন। তখন বায়তুলমালের কোষাধক্ষ্য ছিলেন সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। উল্লেখ্য বর্তমান কুফার গভর্নর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ইসলাম পূর্ব মক্কায় আকাবা ইবনে আবু

মুইতের ছাগল রাখাল ছিলেন। বায়তুলমালের অর্থ নিয়ে গভর্নর ও কোষাধক্ষ্যের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য ও ঝগড়া হলো। একে অন্যের প্রতি গালাগালি, রূঢ় ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে শেষ পর্যন্ত গভর্নরের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ, খলিফা উসমানের দরবারে উপস্থাপিত করা হলো। বিচারে হজরত সাদ দোষী সাব্যস্থ হলেন। এবারে কুফার গভর্নর পদে যিনি নিযুক্ত হলেন, তিনি হলেন খলিফা উসমানের বৈপিত্রীয় ভাই, খ্যাতনামা বীর অলিদ ইবনে ওকবা (রাঃ)। আগুন ধরে গেল কোরায়েশ-হাশিমী গোত্রের গায়ে। কুফার নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা অলিদ ইবনে উকবা ছিলেন নবীজি মুহাম্মদের (দঃ) প্রাণের শত্রু কবি উকবা বিন আবু মুয়াতের পুত্র। নবীজির সাথে একবার একটি ঘটনা কুফাবাসীর জানা ছিল : ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের হাতে উকবা বন্দী হয়ে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভরা সুরে নবীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি (উকবা) মারা গেলে তাঁর সন্তানগণ কি খাবে? উত্তরে নবীজি বলেছিলেন, দোজখের আগুন! (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩৮, বুক নম্বর ১৯ নম্বর ৪৪২১, ৪৪২২)। সেই উকবার ছেলে অলিদকে, অসৎ চরিত্রের লোক হিসেবে মানুষ আগে থেকেই জানতো। ক্রোধে, ঘৃণায় কুফাবাসী বারবার খলিফা উসমানের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল পেলো না। অলিদের কঠোর দমননীতির সামনে সাধারণ মানুষ মাথানত করতে বাধ্য হলো। অন্যায়, অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সীমায় এসে হজরত অলিদ (রাঃ) একদিন জনতার ফাঁদে ধরা পড়ে যান। মদ্যপানে অভ্যস্ত হজরত অলিদ (রাঃ) নেশাগ্রস্থ হয়ে একদিন এমনভাবে ঘুমিয়েছিলেন যে, কিছু লোক তাঁর হাতের আঙুল থেকে রাষ্ট্রীয় সীলযুক্ত একটি আংটি খুলে, অসৎ চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ, মদিনায় খলিফার কাছে নিয়ে যায়। তাছাড়া তিনি একদিন নেশায় বিভোর হয়ে মসজিদে ইমামতির সময়ে ফজরের নামাজ, ফরজ দুই রাকাতের জায়গায় চার রাকাত পড়িয়েছেন বলেও তারা খলিফার কাছে অভিযোগ করে। এ নিয়ে সারা দেশে বিক্ষোভ ঠেকাতে খলিফা বাধ্য হয়ে হজরত অলিদকে পদচ্যুত করেন। এরপর থেকে হজরত অলিদ আর কোনোদিন খলিফা উসমানকে সুনজরে দেখেননি। এবার খলিফা উসমান কুফার মসনদে বসালেন কোরায়েশ বংশের তরুণ বীরযোদ্ধা হজরত সাইদ বিন আল আসকে। এই ব্যক্তির ভেতর কোরায়েশসুলভ অমানবিক, দুশ্চরিত্রের অভাব মোটেই ছিল না। কোরায়েশদের ঔদ্ধত্য, অহমিকা কুফাবাসীর জানা ছিল। আগের সকল শাসকের চেয়ে নতুন গভর্নর ভয়ানকরূপে প্রকাশ হলেন। তিনি স্থানীয় অমুসলিম তো দূরের কথা, অকোরায়েশ মুসলিমদেরকেও হীন মর্যাদার, পশুপ্রকৃতির বলে খলিফাকে পত্র দ্বারা অবহিত করলেন এবং বললেন, এদেরকে তিনি লৌহদণ্ড দিয়ে শায়েস্তা করবেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, একমাত্র কোরায়েশবংশই সম্ভ্রান্ত, শালীন ও উচ্চমর্যাদার দাবি করতে পারে। একটি বৈঠকে সাইদ বিন আল আস যখন বললেন : 'সোয়াদ উপত্যকাটি একচেটিয়া কোরায়েশ বংশের লোকদের জন্য রক্ষিত' উপস্থিত জনগণ সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো। তারা বললো : এই বিশাল মুসলিম-সাম্রাজ্য বিস্তারে কুফা ও বসোরাবাসীর অবদান ভুলে গেলে কোরায়েশদের ভালো হবে না। সারা দেশ জুড়ে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। মদিনায়, মিশরে, কুফায় সর্বত্র সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধুই উমাইয়া বংশের লোক। যে হাশিমি বংশে মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম, যাঁর জন্ম না হলে ইসলাম জন্ম নিতো না, সেই হাশিমি গোত্র এমন আস্ফালন বরদাশত করবে কেন? তারা খলিফার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিতে থাকলো। এই বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উসমান (রাঃ) কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। ইত্যবসরে বসোরার একটু খোঁজ নেয়া যাক।

(৫)

ইসলামের ইতিহাসের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব হজরত হাসান বসোরি (রাঃ) ও তাপসী হজরত রাবেয়া বসোরির (রাঃ) জন্মস্থান এই বসোরা। মুক্তবুদ্ধি চর্চার মুতাজিলা মতবাদও এই ইরাকের বসোরা হতে উদ্ভূত। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কুফার পরেই বসোরার স্থান। কুফা ইরাকের উত্তরাঞ্চলের ও বসোরা দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল। বসোরার শাসনকর্তা এখান থেকে দক্ষিণ পারস্য, বেলুচিস্তান ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত শাসন চালাতেন। কুয়েতের দক্ষিণাঞ্চলও বসোরার শাসনাধীন ছিল। হিজরি ২৪ সনে হজরত ওমর (রাঃ) সাহাবি হজরত আবু মুসা-আশআরিকে (রাঃ) বসোরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। একনাগাড়ে বহুদিন অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আবু মুসা-আশআরি হয়ে ওঠেন এক ভয়ানক আত্মম্ভরী স্বৈরশাসক। একটি এলাকা দখলের প্রস্তুতিকল্পে আবু মুসা-আশআরি মসজিদে জেহাদের ফজিলত বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে, পায়ে হেঁটে জেহাদের ময়দানে গেলে প্রচুর সোয়াব অর্জন করা যায়। লোকে বললো, তাঁর কথায় মিথ্যাচার আর হটকারিতা আছে। পরদিন ভোর বেলা অবাক বিস্ময়ে সাধারণ জেহাদিগণ প্রত্যক্ষ করলো, গভর্নর আবু মুসা-আশআরি (রাঃ) রাজকীয় পোষাকে তেজী ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। চল্লিশটি গাধা তাঁর যুদ্ধ-সরঞ্জাম বহন করছে। কিছু লোক তাঁর পথ রুখে দাঁড়ালো। আবু মুসা আশআরি (রাঃ) ঐ লোকদের নীচ, হীনমনা, বদজাত বলে ধমকালেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিলেন। পূর্বে তাঁর অসীম ক্ষমতার অহমিকা ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ট হয়ে জনগণ বিদ্রোহ করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আবু মুসা (রাঃ) তাঁর আত্মীয়স্বজনদেরকে অত্যাধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্রকে, সুবিধা প্রাপ্ত ও সুবিধা বঞ্চিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেন। সুবিধা বঞ্চিত দল সংগঠিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মদিনা পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। একটি নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের লক্ষণ টের পেয়ে খলিফা উসমান (রাঃ) হিজরি ২৯ সনে, আবু মুসা-আশআরিকে (রাঃ) গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। গৃহযুদ্ধ ঠেকানো গেল কিন্তু বসোরাবাসীর দুঃখ দূর

হলো না। এবারে বসোরার ক্ষমতায় বসলেন খলিফা উসমানের (রাঃ) মামাতো ভাই হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির। এই লোকটি খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের চেয়েও ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিলেন। ক্ষমতায় বসেই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অ-কোরায়েশদের অধিকার নিষিদ্ধ করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর অমানবিক কঠোর শাসননীতি সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিমজগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কোরায়েশ বনাম অকোরায়েশ। একদিকে যেমন খলিফা উসমানের (রাঃ) রাজ্য-বিস্তার, বিভিন্ন দেশ-এলাকা দখল ও দখলকৃত এলাকায় বিদ্রোহ দমনকার্য চলতে থাকলো, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে, হজরত উসমানের ক্ষমতাসীন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের (দঃ) হাশিমি বংশ, আরবদের বিরুদ্ধে অনারব, কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অকোরায়েশ, শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের বেঁচে থাকার সংগ্রাম অব্যাহত রইলো।

হজরত উসমান কর্তৃক এ যাবৎ মিশর, কুফা ও বসোরার ক্ষমতাচ্যুত শাসকগণ যখন দলবদ্ধ হয়ে খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন, উসমান (রাঃ) তখন বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতায় আরো কিছুদিন টিকে থাকার লক্ষ্যে, কোরান সংকলনের উদ্যোগ নেন। সেই ওমরের (রাঃ) খুনী পুত্রের বিচার থেকে আজ পর্যন্ত প্রজাগণ খলিফা উসমানের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরানের শরিয়া আইন অনুসরণের উদাহরণ দেখেনি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষ খলিফার কোরান সংকলনের উদ্যোগে সন্দিহান না হয়ে পারলো না। তবে হজরত উসমান তাঁর সৎভাই, মিশরের অধিপতি, 'আল্লাহর বাণী' কোরানের অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহকে (রাঃ) কোরান সংকলন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলেন না।

নবী মুহাম্মদ (দঃ) লিখতেও পারতেন, পড়তেও পারতেন; হাদিসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[১৪] কিন্তু নিজে হয়তো কোরান লেখেন নাই। ঐ সময়ের একটা রেওয়াজ প্রচলিত ছিল বড় বড় কবিরা নিজেরা তাদের কবিতা লিখতেন না, বরং অনুগত-অনুসারী এবং অন্য পেশাদার কবির মাধ্যমে নিজেদের কবিতা-বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন, তাদের দিয়ে মুখস্ত করাতেন, ঘনঘন পুনরাবৃত্তি করাতেন, যা বংশ পরম্পরায় টিকে থাকতো; যেমন প্রাক-ইসলামি যুগের বিখ্যাত কবি ধু-রামা (মৃত ৬৩৮) নিজে লিখতে-পড়তে জানতেন না বলে জানা যায়, কিন্তু রাবীরা (নিয়োগকৃত পেশাদার কবি) তাঁর কাছ থেকে মুখে শুনে-শুনে কবিতা মুখস্ত করে নিতেন এবং সেই কবিতা বংশপরম্পরায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। নবী মুহাম্মদও নিজে না লিখে তাঁর মুখনিঃসৃত কথা-কবিতা-বক্তব্য 'স্বর্গীয় বাণী' বলে দাবি করতেন, তাই তার অনুগত-অনুসারী উপস্থিত শ্রোতা যে যেভাবে পারেন স্মরণ রাখার চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ তাঁর কথা পাথরে, খেজুর পাতায়, গাছের পাতা থেকে বিশেষভাবে তৈরি কাগজে, পশুর চামড়ায় ও কাঠের টুকরোয় লিখে রাখতেন (কাতিব), এমনকি অনেকেই মুখস্তও করে রাখতেন (হাফেজ)। তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কেতাব অনুসারী এবং হানিফদের কাছ থেকে নানা সময়ে মুহাম্মদের (দঃ) শুনা ঘটনাবলী ও মুহাম্মদের (দঃ) কাছ থেকে মানুষের ঐ শুনা কথা, বিভিন্ন বস্তুতে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাক্যসমূহই পবিত্র কেতাব 'আল-কোরান'। কোরান রচনায় মুহাম্মদকে (দঃ) যারা সাহায্য করেছিলেন তাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরানের কাব্যিক ছন্দ, শব্দ-বিন্যাস, এবং একেশ্বরবাদের ধারণা পর্যন্ত তৎকালীন এবং ইসলাম পূর্ববর্তী আরবিয় একাধিক কবি-সাহিত্যিক ও হানিফ মতাবলম্বী, ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ধারকৃত; তা তৎকালীন আরববাসী অনেকেই জানতেন। শুধু কোরানের বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে দলে দলে অভাবী-নিরন্ন মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। কোরানের থেকেও চমৎকার লোককাহিনী, উপদেশ, নীতিমালা, বিভিন্ন ধরনের একেশ্বরবাদী ধ্যানধারণা, মনোহর কাব্য-সাহিত্য সারা আরব জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল; এগুলোকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ না করে পিতৃপুরুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য-লোকাচার ত্যাগ করে দলে দলে 'শান্তিবাদী' ইসলাম গ্রহণ করার অবশ্যই 'ভিন্ন কারণ' রয়েছে। সমালোচকেরা ইতিহাস থেকে বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে উল্লেখযোগ্য 'ভিন্ন কারণ'গুলো চিহ্নিত করেছেন : 'তরবারির জোর' আর 'যুদ্ধলব্ধ নারী-সম্পদের ভাগ পাওয়া'। এ 'ভিন্নকারণ' নিয়ে অনেকের ভিন্নমত থাকতেই পারে; তবে আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে আমরা পূর্ববর্তী বক্তব্যের রেশ ধরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামপূর্ব আরবের বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েসের কবিতার সাথে কোরানের আয়াতের সংমিশ্রণ নিয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি[১৫] : খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কিন্দার রাজপরিবারের যুবরাজ ইমরুল কায়েস (মৃত সম্ভব্য ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ) প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের শ্রেষ্ঠ সাতজন কবিদের একজন। আরবের অত্যন্ত উত্তম গীতিকাব্য 'মোয়াল্লাকাত' (ঝুলন্ত)-এর লেখক। মোয়াল্লাকাত হচ্ছে ষাট থেকে একশো পয়ার ছন্দে রচিত গীতিকবিতা। ওকাজের মেলার কবিতা উৎসবে বিচারকেরা গুণ অনুসারে বিচার করে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা পুরস্কার হিসেবে মিশরের দামী লিনেন কাপড়ের ওপর সোনার অক্ষরে খোদাই করে ৩৬০ দেবতার ঘর 'কাবা'র দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হতো। সেখান থেকেই বিজয়ী গীতিকবিতার (কাসিদা) নাম হয়েছে 'ঝুলন্ত' (মোয়াল্লাকাত) কবিতা। ইমরুল কায়েসের কবিতাও ওকাজ মেলায় বিজয়ী হয়ে

[১৪] প্রথম অধ্যায়ের 'মুহম্মদ (দঃ)সত্যই কি নিরক্ষর ছিলেন?' শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।

[১৫] Ibn Warraq (Editior), *The Origins of the Koran*, Prometheus Books, New York, USA, 1998, page 235-236.

কাবাঘরের দরজায় শোভিত হয়েছে দীর্ঘদিন। মূল প্রসঙ্গে যাই, মুহাম্মদের জন্ম ও ইসলাম আভির্ভাবের বেশ আগেই কবি ইমরুল কায়েস মারা যান; তবে তাঁর জনপ্রিয় ধর্মীয় ভক্তিমূলক কবিতাগুচ্ছ সারা আরববাসীর মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। একবার নবীজির কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা কোরানের (৫৪ নম্বর) সুরা 'কমর' (চাঁদ)-এর আয়াত 'কিয়ামত আসন্ন, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে...' বারে-বারে আবৃত্তিকালে কবি ইমরুল কায়েসের মেয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছো, ফাতিমা? ফাতিমা জবাব দিলেন, 'আল্লাহর ওহি' কোরানের আয়াত পাঠ করছেন। কায়েসের মেয়ে রাগান্বিত হয়ে বললেন : "সর্বনাশ! এ তো আমার বাবার লেখা কবিতার একটি পংক্তি। তোমার বাবা দেখি আমার বাবার কবিতা নকল করে বেহেস্ত থেকে আগত 'আল্লাহর বাণী' বলে কোরানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন!" ফাতিমা এবং ইমরুল কায়েসের মেয়ের এই ঘটনাটি এখন পর্যন্ত সারা আরব জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।[১৬] তা মুহাম্মদ (দঃ) কখন-কিভাবে ইমরুল কায়েসের ঐ কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন তা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে মুসলমানরা যখন দাবি করেন, 'আল্লাহর বক্তব্যই কোরান', তখন বলতে ইচ্ছে করে মুহাম্মদ (দঃ) নয়, আল্লাহই নিশ্চয়ই তাহলে ইমরুল কায়েসের কবিতার পংক্তি নকল করে কোরানের আয়াত বলে চালিয়ে দিয়েছেন! এ প্রসঙ্গে '*The Origins of Islam*' নামক বিখ্যাত রচনার লেখক W. St. Clair-Tisdall-এর বক্তব্য তুলে ধরছি :

> "The connection between the poetry of Imra'ul Qays and the Koran is so obvious that the Muslims cannot but hold that they existed with the latter in the Heavenly table from all eternity! What then will he answer? That the words were taken from the Koran and entered in the poem?—an impossibility. Or that their writer was not really Imra'ul Qays, but some other who, after the appearance of the Koran, had the audacity to quote them there as they now appear?—rather a difficult thing to prove!" (দ্রষ্টব্য : *The Origins of the Koran*, page 236)।

কথিত আছে, খলিফা হযরত ওমর ও হযরত আলি ইমরুল কায়েসের কাব্য প্রতিভা এবং মৌলিকত্বের প্রশংসা করলেও নবীজি আরবের এই শ্রেষ্ঠ কবিকে 'নরকাগ্নির নেতা' বলেও অভিহিত করেছেন।[১৭] ইমরুল কায়েসকে নিয়ে মুহাম্মদের (দঃ) এরকম তীব্র ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝতে নিশ্চয়ই আমাদের 'রকেট সায়েনটিস্ট' হতে হবে না! কায়েসের মেয়ের কাছে এভাবে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলে মাথা কী ঠাণ্ডা রাখা যায়! যাহোক, হাদিস থেকে জানা যায়, গ্রন্থাকারে কোরানকে সংকলিত করার ধারণাটা প্রথম আসে হজরত ওমরের মাথায়। হজরত ওমর খলিফা আবু বকরকে এ ব্যাপারে প্রস্তাব দিলে আবু বকর প্রথমে রাজি হননি। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬১, নম্বর ৫০৯)। আবু বকর (রাঃ) জানতেন বিষয়টা স্পর্শকাতর ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খলিফা উসমান যখন পুনরায় এ উদ্যোগটা নিলেন, তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সিরিয়া, কুফা, বসোরা, আজারবাইজান, মিশরসহ বিভিন্ন এলাকার কোরান আর মদিনায় হজরত ওমরের নির্দেশে তৈরি, তাঁর মেয়ে হাফসার কাছে গচ্ছিত কোরানের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী, জগতজুড়ে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের উচ্চাবিলাসী কোরায়েশ শাসকগণ তাঁদের প্রজা নির্যাতন, অপশাসন ও শোষণের বৈধতা যখন কোরানিক নির্দেশ বলে দাবি করতেন, তখন নির্যাতিত শোষিতেরাও একই কোরান দিয়েই প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন শাসকেরা তাদের স্বার্থানুযায়ী কোরানে পরিবর্তন-পরিবর্ধন এনেছে এবং তাঁরা কোরানের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। সাহাবি হজরত আবু জওহর গিফ্‌ফারি (রাঃ) সিরিয়ার স্বৈরশাসক হজরত মুয়াবিয়াকে সরাসরি 'কোরান-বিরোধী শাসক' বলে অভিযোগ করেন। আবু জওহর কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন : 'আপনি যে জনগণের সম্পদ দিয়ে রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছেন এবং রাজকীয় বেশে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছেন তা কোরানের পরিপন্থি।' মুয়াবিয়া (রাঃ) আবু জওহর গিফ্‌ফারীকে (রাঃ) ধমক দিয়ে বললেন : 'বেকুবের দল, রাষ্ট্রীয় আয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিক জনগণ নয়। সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহই আমাকে তাঁর সম্পদের রক্ষক হিসেবে মনোনীত খলিফা করেছেন। সম্পদ ব্যবহার হবে জনগণের নয়, খলিফার ইচ্ছানুযায়ী।'

জনগণের কাছে যখন সারা মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক গভর্নরসহ স্বয়ং খলিফা উসমান কোরান-বিরোধী, অনৈসলামিক শাসক বলে বিবেচিত, তখন হজরত উসমানের কোরান সংকলন মানুষের কাছে কতটুকু সমাদৃত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হজরত উসমান মদিনার খাজরাজ গোত্রের অ-কোরায়েশ জায়েদ বিন হারিথকে সর্বপ্রধান করে আব্দুল্লাহ ইবনে আল-জুবায়ের, সাদ বিন আল আস এবং আব্দুর রহমান বিন আল-হারিথ বিন হিশামসহ ১২ সদস্য (আনাস বিন মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ওবেই ইবনে ক্বাব প্রমুখ) বিশিষ্ট একটি কোরান সংকলন কমিটি গঠন করলেন। নির্দেশ দিলেন মদিনার 'ওহি' লেখকদের সাথে যদি ভাষাগত মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে কমিটি যেন কোরায়েশদের ভাষা অনুসরণ করে। খলিফা আরো বললেন : 'এই কমিটি কর্তৃক

[১৬] এ প্রসঙ্গে মুক্তমনায় প্রকাশিত আবুল কাশেমের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ '*Who Authored the Qur'an?—an Enquiry*' পড়া যেতে পারে। প্রবন্ধটিতে জনাব কাশেম কোরান শরিফের প্রথম দিককার কিছু সুরার সাথে ইমরুল কায়েসের কবিতার অভূতপূর্ব মিল দেখিয়েছেন।

[১৭] আর. এ. নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০৬।

প্রণীত কোরানই হবে সরকার অনুমোদিত পরিপূর্ণ বৈধ কোরান এবং রাজ্যের অন্যান্য সকল কোরান অবৈধ বলে গণ্য হবে।' কোরানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লেখা ও সম্পাদনা হলো। হজরত উসমান কমিটিকে কোরানের ৭টি কপি তৈরি করতে আদেশ দিলেন। ৭টি রাজ্যে কোরানের ৭টি কপি পাঠিয়ে তখনকার প্রচলিত বাকি সব কপি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিলেন। বেসরকারিভাবে প্রচলিত সকল কোরান পুড়িয়ে ফেলা হলো। এবারে আরব-অনারব, হাশিমি-উমাইয়া, কোরায়েশ-অকোরায়েশ নয়, রাজ্যের সকল প্রদেশের সকল এলাকা থেকে, সকল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো। খলিফা উসমান ১২টি বছর খেলাফত কালের পূর্ণ ১০টি বছর যুদ্ধবিগ্রহ করে কাটিয়েছেন। অন্যায়ভাবে বিরাট ভূখণ্ড দখল করা হলো, যশ-মান-পদোন্নতি-জগতের অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার-সম্পদ- দাস-দাসী সবই পদানত করা হলো। তবু হায়! অগণিত নিরপরাধ নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরের প্রাণ সংহার করে, এতো মানবরক্ত পান করেও তার পিপাসা নিবারণ হলো না। ইসলাম এবার নিজেরই রক্তপান করতে উদ্যোত হলো। রাজ্যের সকল এলাকা থেকে সরকার-বিরোধী সংগঠন গড়ে উঠলো। তাদের এক দফা, এক দাবি : স্বৈরশাসনের পতন হউক। সর্বদলীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে যারা এগিয়ে আসলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হলো :

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) : মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা নবী মুহাম্মদের অতি প্রিয়ভাজন সাহাবি হজরত আবু বকরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নবী মুহাম্মদের কনিষ্ঠ স্ত্রী আয়েশার ভাই। প্রথম খলিফা আবু বকরের (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী, শিশু পুত্র মুহাম্মদকে নিয়ে হজরত আলিকে বিয়ে করেন। আবু বকরের স্নেহের সন্তান মুহাম্মদ ছিলেন যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী। হজরত আলির পোষ্যপুত্র মুহাম্মদ, তৃতীয় খলিফা নির্বাচনে, হজরত ওমরের নির্বাচন কমিটির ওপর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করেছিলেন। উসমানের (রাঃ) খেলাফত লাভের পরপরই তাঁর অদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনা, অন্যায় শাসন সহ্য করতে না পেরে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) মদিনা ছেড়ে মিশর চলে যান।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ) : রসুল মুহাম্মদের (দঃ) বিশেষ সম্মানিত সাহাবি হজরত আবু হুজাইফার (রাঃ) পুত্রের নামও 'মুহাম্মদ'। তাঁর পিতা ইয়ামামার যুদ্ধে (আবু বকরের আমলে) মৃত্যুবরণ করার পর থেকে তিনি খলিফা উসমানেরই গৃহে প্রতিপালিত হতে থাকেন। বড় হয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা বুঝতে পারলেন, ইসলাম প্রচারের নামে জগত জুড়ে যে অত্যাচার-অনাচার চলছে তা কোনোভাবেই ধর্ম-সমর্থিত হতে পারে না। স্বদেশ ত্যাগ করে মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ) মিশরে চলে আসেন। মিশরের আদিম অধিবাসী 'কীবতি সম্প্রদায়' কোরায়েশদের প্রভুত্ব সহ্য করতে পারতো না। মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা মিশরের নির্যাতিত নিপিড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহর দিকে ইঙ্গিত করে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শাসকদের বিলাসিতাপ্রিয় আসল চেহারা। মিশরে এসে 'মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর' ও 'মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা' নামের দুই মুহাম্মদ, সুদীর্ঘ ১২টি বছর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলতে থাকেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা : হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা বিলাসবহুল জীবন ঘৃণা করতেন। ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিল না। তিনি হজরত আলিকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল হজরত আলির ভেতর নবী মুহাম্মদের সকল প্রকার গুণাবলী বিদ্যমান বিধায় নবীর মৃত্যুর পর হজরত আলিই প্রথম খলিফা হবেন। পরপর তিনজন খলিফা জবরদস্তি ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। বসোরায় আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা তাঁর এই বিশ্বাসের পক্ষে প্রচারণা করতে থাকেন। বসোরার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আমির, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে তার দেশ থেকে বহিস্কার করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা কুফায় চলে যান। সেখানে আগে থেকেই হজরত আলির বহু সমর্থক ছিল। বসোরা ও কুফায় তাঁর বিশ্বাসের প্রতি প্রচুর লোক সমর্থন জানায়। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়ায় তখন হজরত উসমানের উমাইয়া বংশীয় সরকার হজরত মুয়াবিয়ার যাঁতাকলে, হাশিমি বংশের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। পরিশেষে সিরিয়া ত্যাগ করে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা মিশরে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফার সাথে মিলিত হন। এখানে তিনি 'সাবায়ি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন।

সারা মুসলিম বিশ্বে যে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছে, হজরত আলি তা আঁচ করতে পেরে খলিফা উসমানকে কতগুলি সূক্ষ্ম পরামর্শ দিলেন। ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে মানুষ যে কতো অন্ধ হতে পারে ৮০ বছর বয়স্ক হজরত উসমান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি হযরত আলির পরামর্শ গ্রাহ্য তো করলেনই না বরং বিদ্রোহের প্ররোচণাকারী বলে হজরত আলিকে অপবাদ দিলেন। দেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে থাকে। সমগ্র দেশটা গণ-আন্দোলনের বিস্ফোরণ অবস্থায় দেখেও হঠাৎ করেই হজরত উসমান নতুন একটি প্রথার উদ্ভব ঘটালেন : 'প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গিরদারি ও জমিদারি প্রথা।' দুটি উদ্দেশ্যে হজরত উসমান এ কাজটি করেছিলেন যথা : (এক) স্বগোত্রীয় বিত্তশালী লোকদের সমর্থন অর্জন; (দুই) গরিব প্রজাদেরকে নিঃস্ব

থেকে নিঃস্বতর, আর কৃষকদেরকে ভূমিহীনকরণ। তাঁর ধ্বংসমুখী আইনের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন এই বলে, 'দেশে মাত্রাতিরিক্তভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে নাগরিক সভ্যতা ও শালীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। দেশে নবাগত মুসলিম অধিবাসীদের বেশিরভাগই যাযাবর-বেদুইন কিংবা গ্রাম্য অনারব। এরা মূর্খ ও বর্বর। এদের রুচি-আচরণ কদর্য, অভদ্র ভাষা, অসভ্য ব্যবহার ও রীতিনীতি ঔদ্বত্যপূর্ণ। এদের দ্বারা দেশের শান্তি বিপন্ন হচ্ছে।' আসলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে। ধর্ম প্রচারের নামে খুন, লুট, ডাকাতিকে আরবগণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। ডাকাতি শুধু লাভজনক একটি বৈধ ব্যবসাই নয়, পূণ্য কাজ বলেও শাসকগণ প্রচারণা করতেন। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে ইসলাম ধর্ম কবুল করে দস্যুতা গ্রহণ ছাড়া কোনো গতি ছিল না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দলে দলে মুসলমান হলো, সৈনিক দলে যোগদান করে লুটকৃত সম্পদের অংশীদার হলো, সাথে নিয়ে আসলো কুসংস্কার, বিশৃঙ্খলা, অশ্লীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অজ্ঞতা ও অরাজকতা। তাছাড়া ক্ষমতাশীল, বিত্তবান সাহাবিগণের যৌনক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে গনিমতের মাল হিসেবে রক্ষিতা, যুদ্ধবন্দী নারীগণ, তাঁদের গর্ভজাত জারজ-সন্তানাদি সমাজ ও শাসকদের জন্য উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়।

খলিফা উসমানের 'প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গিরদারি ও জমিদারি প্রথা' নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ে নিমজ্জিত একটা জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় নাই, সে কথা বুঝতে কারো বাকি রইলো না। বেশ কয়েকজন সাহাবি এর প্রতিবাদ করলেন। প্রাক্তন বিশিষ্ট সাহাবিগণ অভিমত প্রকাশ করলেন, শরিয়ত-বিরোধী এ সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে মুসলিম জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সর্বোপরি ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে। এবারে নবীজির আমলের খ্যাতনামা সাহাবি দেশের বরেণ্য উলামাগণ বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। এমনকি এককালে উসমানের 'ডান হাত' বলে পরিচিত হজরত তালহা, হজরত জুবায়ের, কুফার কোষাধ্যক্ষ সাহাবি ইবনে মাসউদসহ বহুসংখ্যক সাহাবি ও সরকারি কর্মচারী খলিফার বিরুদ্ধে চলে যান। হজরত উসমান কঠোর দমননীতি অনুসরণ করলেন। কয়েকজন সাহাবিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেন, কিছু লোককে প্রসাদে ডেকে এনে স্বহস্তে অমানুষিক নির্মম শাস্তি প্রদান করেন। বিদ্রোহীদের প্রতি হজরত উসমানের ভাষা ছিল অত্যন্ত অশ্লীল, অকথ্য, অমার্জিত। হজরত আলিও উসমানের অকথ্য ভাষায় গালাগালি থেকে রেহাই পাননি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সাহাবি হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) যিনি হজরত ওমর কর্তৃক খলিফা নির্বাচন কমিটির প্রধান হয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চণার মাধ্যমে উসমানকে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন, সাহাবি হজরত জায়েদ বিন থাবিত যাঁকে উসমান তাঁর 'কোরান সংকলন কমিটি'র প্রধান বানিয়েছিলেন, সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস, যাঁর কথায় উসমান (রাঃ) হজরত ওমরের খুনী পুত্র উবায়দুল্লাহকে বিনা শাস্তিতে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, এঁরাসহ হজরত আলি বিদ্রোহী দলের প্রথম সারিতে এসে অবস্থান নেন। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে রাজধানী সর্বত্র বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। অবস্থা বেগতিক দেখে সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া খলিফাকে বার্তা পাঠালেন : "আমিরুল মোমেনিন, আপনি অতিসত্তর সিরিয়া চলে আসুন, মদিনায় আপনার প্রাণের নিরাপত্তা আর নেই, নতুবা সামরিক আইন জারি করুন, আমি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবো।" খলিফা কোনোটাই করলেন না। গণঅভ্যুত্থানের হাওয়ায় মদিনা উত্তপ্ত। উসমান টের পেলেন বিপদ আসন্ন। তিনি হজরত আলির স্মরণাপন্ন হলেন। হজরত আলিকে ডেকে এনে উসমান (রাঃ) নিজের ভুল স্বীকার করলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু ভুল স্বীকার করেননি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে হজরত আলিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। উসমান বললেন : "আলি এখন থেকে আমি শুধু তোমার কথাই শুনবো। মুয়াবিয়া, মারওয়ানের পরামর্শ নেয়া আমার ঠিক হয়নি। আজ থেকে তুমি যেভাবে বলবে রাষ্ট্র সেভাবে চলবে।" আলির মনে পড়লো ক্ষমতা ও সম্পদ লোভী, আত্মম্ভরী, স্বেচ্ছাচারী উসমানের সুদীর্ঘ ১২ বছর শাসনের কলঙ্কিত দিনগুলোর কথা, খলিফা উসমান তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনী সাহাবি হজরত ওমরের পুত্র হজরত ওবায়দুল্লাহকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোরান সংকলন-সম্পাদনা করে রাজ্যের সর্বত্র মানুষের হাতে লেখা 'কোরান' আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন। সেগুলোতে কি লেখা ছিল পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন জানতে পারবে না। গরিব কৃষকদের জমি জবরদস্তি দখল করে মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণ করে মানুষকে ভিটেহীন করেছেন। ঘোড়ার ওপর ট্যাক্স আরোপ করে নবীর আদর্শকে কলংকিত করেছেন। 'প্রজাস্বত্ব হস্তান্তর' আইন প্রণয়ন করে নিজের আত্মীয় উমাইয়া বংশের মানুষকে জমিদার বানিয়ে সাধারণ মানুষকে ভিখারী করেছেন। মাদকাসক্ত, ব্যাভিচারী, মিথ্যাচারী, দেশের স্বঘোষিত নামকরা সন্ত্রাসী, যাদের মধ্যে চরিত্রের বালাই নেই তাদেরকে গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছেন। বায়তুলমাল থেকে টাকা আত্মসাৎকারী কুফার গভর্নর কুখ্যাত অলিদের কথায় তার কোষাধক্য সাহাবি ইবনে মাসউদকে সকলের সম্মুখে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেছন। এই তো সেদিন ইবনে মাসউদকে মসজিদে দেখে উসমান বলেছিলেন, 'ঐ দেখো বাঁদির বাচ্চা নষ্টের কীট এসেছে, সে যে পাতে খায় সেই পাতে মলত্যাগ করে।' ইতিপূর্বে ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুফার গভর্নর হজরত অলিদের অন্যায় অবিচার সহ্য করতে না পেরে পদত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছিলেন। হজরত আয়েশা, মসজিদ সংলগ্ন ঘর থেকে উসমানের গালিগালাজ শুনে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, আপনি নবীর বিশ্বস্ত সাহাবিদেরকে এমনভাবে গালাগালি করছেন? আয়েশার কথায় খলিফা ভীষণ রাগান্বিত হয়ে ইবনে মাসউদকে (রাঃ) এমন লাথি মেরেছিলেন যে, সাহাবি মাসউদের কোমরের একটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় মাসউদকে সেদিন উসমান টেনে হিঁচড়ে

'মসজিদে নববী' থেকে বের করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে সাহাবি হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) খলিফা উসমানের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ খলিফার বিরুদ্ধে বায়তুলমাল থেকে যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল, কিছু স্বর্ণালংকার ও মণি-মুক্তা চুরির অভিযোগ এনেছিলেন মদিনার কিছু লোক। খলিফার বেশ কয়েকজন আত্মীয়ের গায়ে সেই অলংকারের প্রমাণও তারা দেখিয়েছিলেন। উসমান (রাঃ) মুয়াবিয়ার ভাষায় বলেছিলেন, 'বায়তুলমালের সম্পদের মালিক আল্লাহ। আমি আল্লাহর মনোনীত খলিফা। আল্লাহর মনোনয়ন ছাড়া খলিফা হওয়া যায় না। সম্পদ ব্যবহার হবে আমার ইচ্ছায়, তোমাদের তাতে কিছু বলার কোনো অধিকার নেই।' আম্মার ইবনে ইয়াসের ও হজরত আলি একসাথে সমস্বরে বলেছিলেন, 'খলিফা, আল্লাহর কসম, আমি হবো আপনার প্রথম প্রতিবাদী। বায়তুলমালের সম্পদের জবাবদিহি আপনাকে করতেই হবে।' খলিফা উসমান, আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে বন্দী করে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তিনদিন তাঁকে বেহুশ হয়ে মৃত অবস্থায় উম্মে সালমার (রাঃ) গৃহে পড়ে থাকতে হয়। আয়েশাও সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। হজরত উসমান সেদিন হযরত আলিকেও বলেছিলেন: 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমারও আম্মারের অবস্থা হবে।' আলিও রক্তবর্ণ চোখ দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আত্মম্ভরী উসমান, আল্লাহর কসম, আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে উত্তম, আমার মা তোমার মায়ের চেয়ে উত্তম, নবীর কাছে আমার মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আমাকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!' এসব কিছু স্মরণ করে আলি বললেন, 'আজ আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না। এর আগে বহুবার আপনাকে সতর্ক করেছি, পরামর্শ দিয়েছি, আপনি তো কানেই তোলেননি। বরং কিছুদিন আগে একজন বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু জওহর গিফ্ফারিকে (রাঃ) বিনা অপরাধে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি এর প্রতিবাদ করায় আপনি আপনার মন্ত্রী মারওয়ানের পক্ষ নিয়ে আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে প্রসাদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন।' উসমানেরও মনে আছে সেদিন হজরত আলিও কম বলেননি। উসমান জানেন কোথায় আলির পিতা আবু তালিবের হাশিমি বংশ আর কোথায় উসমানের উমাইয়া বংশ। কিন্তু আজ তিনি নীরবে শুধু আলির কথা শুনতে থাকলেন। উসমান বললেন, 'আলি, আমি জনগণের সকল অভিযোগ স্বীকার করে তাদের দাবি মেনে নেবো, তুমি তাদেরকে মদিনা থেকে ফিরিয়ে দাও।' হজরত আলি, তার কাছে ইতিপূর্বে বিদ্রোহীদের দেয়া অভিযোগ ও দাবিসমূহ উসামানকে এক-এক করে শুনালেন। অভিযোগগুলো শুনে হজরত উসমান, সকল দোষ তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলিফার ওপর, বিশেষ করে হজরত ওমরের ওপর চাপিয়ে দিলেন। তিনি আঙুলে গুণে কয়েকজন দুধর্ষ দুষ্কৃতিকারী সাহাবির নাম উল্লেখ করে বললেন, 'দেখো আলি, এদেরকে দ্বিতীয় খলিফা ওমর গভর্নর পদে নিয়োগ করে গেছেন। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া কেমন মানুষ তুমি তো জানো। তার মতো মানুষকে সরিয়ে আমার খেলাফত কি একদিনও টিকবে?' অতি নম্র ভাষায় উসমান আরো বললেন, ' দেখো, বিগত দুই খলিফাও অনেক ভুল করেছিলেন কিন্তু কেউ তো কোনোদিন তাদের পদত্যাগ দাবি করেনি, আমার বেলায় কেন এমন হচ্ছে? আমি শুধু একটি দাবি বাদে জনগণের বাকি সব দাবি মেনে নেবো। আমি ক্ষমতা ত্যাগ করতে পারবো না।' হযরত আলি বললেন : 'ঠিক আছে, আপনি যে জনগণের দাবি মানতে রাজি তার একটি প্রমাণ দিন। কিছুদিন পূর্বে নবীপত্নী আয়েশাও উসমানকে বলেছিলেন, 'খেলাফত ত্যাগ করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন এবং আমার ভাই মুহাম্মদকে মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করুন।' নবীপত্নী আয়েশা তার ভাই মুহাম্মদকে সরকারি কোনো পদ না দেওয়ায় উসমানকে সেই প্রথম থেকেই ঘৃণার চোখে দেখতেন। আয়েশা এবং তাঁর ছোট বোনের স্বামী হজরত তালহা (রাঃ) ও বড় বোনের স্বামী হজরত জুবায়ের (রাঃ) যে বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী, খলিফা উসমান তা টের পেয়েছিলেন। সবকিছু বিবেচনা করে উসমান ঘোষণা দিলেন যে, আজ থেকে মিশরের নতুন গভর্নর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে (আয়েশার ভাই) নিযুক্ত করা হলো। সরকার জনগণের সকল অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সকল দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছেন। ঘোষণা পত্রে উসমান দস্তখত করলেন। বিবি আয়েশার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর কিছু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় লোককে সঙ্গে নিয়ে মিশরের পথে রওয়ানা হয়ে যান। মদিনায় জড়ো হওয়া বিক্ষুব্ধ জনতা খলিফার ঘোষণা বাস্তবায়নের আশা বুকে ধারণ করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে থাকলেন। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, মিশর পৌঁছার আগেই খলিফা উসমানের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি জনসমক্ষে ধরা পড়ে যায়। উসমান তাঁর নিজস্ব গুপ্তচরকে একটি চিঠি দিয়ে মিশর প্রেরণ করেছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল : "মুহাম্মদকে তার দল নিয়ে মিশর পৌঁছামাত্র যেন হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহীদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।" গুপ্তচর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের দলের হাতে ধরা পড়ে যায়। সকলে মদিনায় ফিরে আসলেন। বিচার ডাকা হলো। বিচারের ভার দেয়া হলো হজরত আলির হাতে। হজরত আলি, খলিফা উসমানকে জিজ্ঞেস করলেন :

-এই গুপ্তচর কি আপনার?
-জ্বি, আমার।
-এই উট কি আপনার?
-জ্বি, আমার।
-এই চিঠির সীলমোহর কি আপনার?

-হ্যাঁ, আমার ।
-এই চিঠির নিচে স্বাক্ষর কি আপনার?
-হ্যাঁ, তাই তো মনে হয় ।
-এই চিঠি আপনি লিখেছেন?
-আল্লাহর কসম, আমি লিখি নাই ।
-আপনি কাউকে লিখতে বলেছিলেন?
-আল্লাহর কসম, আমি কাউকে লিখতে বলি নাই ।

হজরত আলি লেখা পরীক্ষা বিশেষজ্ঞগণকে চিঠির লেখা পরীক্ষা করতে অনুরোধ করলেন । বিশেষজ্ঞগণ একমত হলেন, চিঠির লেখা মারওয়ানের হাতের । আলি মারওয়ানকে বিচারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন । উসমান বাধা দিলেন, মারওয়ানকে এখানে আনা যাবে না । গর্জে উঠলো উপস্থিত জনতা । মদিনার আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে বজ্রধ্বনি উঠলো, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!, ইনতেকাম! ইনতেকাম! (প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!) । মুহূর্তে সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো মদিনার অলিতে গলিতে । অবস্থা আয়ত্বের বাইরে দেখে হজরত আলি, হজরত তালহা ও হজরত জুবায়েরসহ অনেকেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন । জনতা খলিফার গৃহ অবরোধ করলো । চার হাজারেরও বেশি মানুষের গৃহ অবরোধের শেষ পরিণতি আন্দাজ করতে পেরে নবীপত্নী আয়েশা চলে গেলেন মক্কায় আর আলি শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যান । স্বপরিবারে পূর্ণ বিশদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পরও উসমান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না । তাঁর একটি আশা ছিল সিরিয়া ও বসোরা থেকে সৈন্যবাহিনী এসে তাঁকে উদ্ধার করবে । হিজরি ৩৫ সালের ১৭ ই জিলহাজ্ব, শুক্রবার । হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) প্রাসাদের ছাদের ওপর দিয়ে জানালা ভেঙে খলিফা উসমানের কক্ষে ঢুকে পড়েন । হাতে উন্মুক্ত শাণিত তরবারি, সঙ্গে আরো ৪ জন । উসমান আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ মিনতি, বেঁচে থাকার শেষ প্রতারণা করলেন । বুকের ওপর দুই হাতে কোরান ধরে বসে রইলেন । নবীজির দোহাই দিলেন, মুহাম্মদকে তাঁর পিতা আবু বকরের দোহাই দিলেন, কোরানের দোহাই দিলেন । মুহাম্মদ ভীষণ শক্ত হাতে উসমানের সাদা ধবধবে দাঁড়িতে ঝাপটে ধরে টান দেন, উসমান মাটিতে পড়ে যান । উপর্যুপরি খঞ্জরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় উসমানের সর্বাঙ্গ[১৮] । ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমানের দেহনিঃসৃত রক্তের স্রোতধারা । তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কোরানের পাতাগুলো । উসমানের রক্তে সিক্ত, লাল রঙে রঞ্জিত, কোরানের ছিন্ন পাতাগুলোর সাথে তাঁর প্রাণহীন দেহটিও মেঝেতে পড়ে রইলো তিন দিন, তিন রাত্রি । চতুর্থ দিন রাতের অন্ধকারে, গোপনে হজরত আলি কতিপয় যুবককে নিয়ে লাশটি সংগ্রহ করে, জনবিরল এক গলিপথে শহরের বহির্ভাগে নিয়ে জান্নাতুল-বাকির পার্শ্ববর্তী ফাঁকা জমিতে সমাহিত করেন ।

(৬)

ইসলামের চার খলিফার কেউই তাঁদের জীবদ্দশায় জনগণের শত দাবির মুখেও ক্ষমতা ত্যাগ করেননি । তাদের তিনজনকেই জনতার রোষানলে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিল । পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, হজরত উসমানের খেলাফতের মধ্য দিয়ে ইসলামের ঘরে যে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে, তা হজরত আলির যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয় । হজরত আয়েশার আশা ছিল, উসমান-পরবর্তী মদিনার খলিফা হবেন তাঁর দুই দুলাভাই হজরত তালহা (রাঃ) অথবা হজরত জুবায়ের (রাঃ) । জনগণ হজরত আলিকে বিপুল ভোটে মদিনার চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত করে । নবীপত্নী আয়েশা এমনিতেই হজরত আলিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন । হজরত আলি ছিলেন বিবি আয়েশার চক্ষুশূল । আয়েশা ছিলেন ব্যক্তি স্বার্থপর নারী । যে মহিলার বিছানার ভেতর থাকা অবস্থায় জিব্রাইল ওহি নিয়ে আসতেন বলে নবী মুহাম্মদ (দঃ) গর্ব করতেন, সেই আয়েশা যখন ঘোষণা দিলেন উসমান হত্যায় হজরত আলি জড়িত, মানুষ তা

[১৮] Muhammad b. Abi Bakr, accompanied by Kinanah b. Bishr b. 'Attab, Sudan b. Humran and 'Amr b. al-Hamiq, reached 'Uthman by climbing over the wall from the house of 'Amr b. Hazm. They found 'Uthman, with his wife Na'ilah, reading the Surah of the Cow from the Qur'an. Muhammad b. Abi Bakr came up to them and seized 'Uthman's beard. "May God disgrace you, you hyena," he said. 'Uthman replied, "I am no hyena. I am God's servant and the Commander of the Faithful."Muhammad said, "Neither Mua'wiyah nor anyone else has been of any use to you." 'Uthman said, "Son of my brother, let go my beard. Your father would not have gripped like this." Muhammad replied, "Had my father seen you doing these things, he would have denounced you for them, and I mean to do worse to you than grab your beard." 'Uthman said, "I seek God's help and support against you." Then Muhammad pierced his forehead with a broad iron-tipped arrow that he was holding. Kinanah b. Bishr raised some arrows of the same kind that he was holding, and plunged them into the base of 'Uthman's ear down to his throat. Then he fell on him with his sword until he killed him (al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir, *The Crisis of the Early Caliphate,* vol. xv. Translated and annotated by R. Stephen Humphreys, State University of New York Press, Albany, 1990. ISBN 0-7914-0155-3, pp.219-220).

অবিশ্বাস করতে পারলো না। সাহাবি হজরত তালহা ও হজরত জুবায়ের (আয়েশার দুই দুলাভাই) আলিকে খলিফা মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আয়েশার পরামর্শে তারা সে শপথ অস্বীকার করে বললেন যে তাদেরকে অস্ত্রের মুখে বাধ্য করা হয়েছিল আলিকে খলিফা মানতে। উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে হজরত আয়েশার ডাকে উমাইয়া বংশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তাঁর সাথে যোগদান করলো বেশকিছু মুসলিম, যারা নবী মুহাম্মদের (দঃ) অস্ত্রের মুখে প্রাণ রক্ষার্থে মুসলমান হয়েছিল আর যাদের মাতা-পিতা আত্মীয়স্বজন নবী মুহাম্মদের নির্দেশে হজরত আলির হাতে খুন হয়েছিল।

এদিকে খেলাফত লাভের সাথে সাথে হজরত আলি সকল প্রাদেশিক গভর্নর পদ বাতিল করে দেন। কিছু উমাইয়া বংশীয় গভর্নরগণ পদত্যাগ করলো বটে কিন্তু রাজস্বভাণ্ডার লুটপাট করে শূন্য করে দিল। আর অনেকেই আলির খেলাফত অস্বীকার করলো। হজরত আলির জন্য প্রাদেশিক গভর্নর সমস্যার চেয়ে আয়েশার সৃষ্ট সমস্যা মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি, তাঁর সর্বকণিষ্ঠ সৎ-শাশুড়ি বিবি আয়েশা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন। হজরত উসমানকে যখন হত্যা করা হয়, আয়েশা তখন মক্কায় ছিলেন। সেখান থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। হজরত আয়েশা, আলি (রাঃ) কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত, ইয়েমনের গভর্নরের দেয়া পুরস্কার, অত্যাধিক সুন্দর, হৃষ্ট-পুষ্ট তাজা উট আল-আসকারের ওপর আরোহণ করলেন। পেছনে তাঁর ১০০০ হাজার সশস্ত্র সৈন্য। ডান পাশে হজরত তালহা (রাঃ), বামপাশে হজরত জুবায়ের (রাঃ)। আয়েশার জীবনে বাল্যকালের আনন্দ ছিল না। যৌবন ছিল চরম হতাশা আর বেদনায় ভরা। যুদ্ধের ময়দানে হারিয়ে যাওয়ায় আয়েশার ওপর লোকে সেনাপতির সাথে কেলেঙ্কারি রটিয়েছে। মানুষ তাঁকে সতীত্বের অপবাদ দিয়েছে। আজ আয়েশার দু'চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে সারা জনমের জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ! মা বেরিয়েছেন, তার চেয়ে বয়সে বড় তার মেয়েকে (নবীকন্যা ফাতিমা) বিধবার কাফন পরাতে। হায়, নবীজি মুহাম্মদ! একবার এসে দেখে যান, আপনার বিষবৃক্ষে কি অপরূপ ফল ধরেছে। দেখে যান, আদরের দুলালী ফাতিমা জননীর স্বামীকে বধ করতে আপনার প্রিয়তমা বালিকা বধুর হাতে খঞ্জর। এ তো আপনারই শিক্ষা। এ তো আপনারই দেখানো সেই পথ! সর্বনাশা এই পথের সন্ধান 'উলমে সালমা' জানতেন কিভাবে? উম্মুল-মোমেনিন (মুসলিম জাতির মা) হজরত আয়েশা সৈন্যদল নিয়ে বসোরার পথে রওয়ানা হবার আগে, তাঁর অন্যতম সতীন উম্মে সালমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সালমা বললেন, ' অসম্ভব! আয়েশা তুমি ঐ সর্বনাশা পথে পা বাড়িও না। নবীজি আমাকে কানে কানে বলে গেছেন, একদিন একদল সশস্ত্র লোক ঐ পথে যাত্রা করবে যাদের নেতৃত্বে থাকবে একজন মুসলিম নারী। সে নারী, আমার উত্তরাধিকারী, খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমার স্বামী, আমার প্রিয় জামাতা হজরত আলির নেতৃত্ব অস্বীকার করবে। নবীজি আরও বলেছেন, যারা আমার আলির নেতৃত্ব অস্বীকার করবে, মনে করো তারা আমাকেই অস্বীকার করলো। আয়েশা তুমি সেই অভিশপ্ত নারী হতে যেও না।'

আয়েশার শরীরের রক্তধারা আজ উজান বইছে। উম্মে সালমার নির্বোধ কথা শুনার সময় আয়েশার নেই। বসোরার পথে আয়েশার দলে আরও ২ হাজার লোক যোগদান করলো। বসোরার গভর্নর আয়েশাকে বাধা দিলেন। ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আয়েশা রাজধানীতে ঢুকে পড়লেন। তারা আলির নতুন খলিফা, গভর্নর উসমান বিন হোনায়েফকে (রাঃ) নামাজরত অবস্থায় বন্দী করে তাঁর দাঁড়ি-গোঁফ মুণ্ডায়ে শহর থেকে বের করে দিলেন। হজরত আলি যখন উম্মে সালমা মারফত আয়েশার মনোভাবের সংবাদ পেলেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৪০ জন নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে আয়েশার সেনাবাহিনী বসোরা দখল করে নিয়েছেন। আলি (রাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে মাত্র ৯শত সৈন্য নিয়ে বসোরার পথে রওয়ানা হয়ে যান। নবীজির প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র (হযরত আলির সন্তান) হাসান ও হোসেন আর বসে থাকতে পারলেন না। পিতার নির্দেশে হজরত হাসান (রাঃ) অতিসত্তর কুফায় চলে যান। সেখান থেকে ৯ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে পিতার সাথে মিলিত হন। আলির পরাজিত গভর্নর উসমান বিন হোনায়েফ (রাঃ) এসে বসোরার অবস্থা বর্ণনা করলেন। আলি (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন, 'বৃদ্ধ গভর্নর পাঠিয়ে ছিলাম, এ দেখছি যুবক হয়ে ফিরে আসলেন'। ধীরে ধীরে হজরত আলির সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২০ হাজারে আর আয়েশার ৩০ হাজার। প্রথমাবস্থায় হজরত আলি ও হজরত তালহার মধ্যে সাময়িক বাকযুদ্ধ হলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো, পরের দিন আরো আলাপ হবে বলে তারা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন। ছোটবেলা থেকেই আয়েশা তার স্বামী মুহাম্মদের (দঃ) রণকৌশল দেখে আসছেন। পরের দিন আরো আলাপ করার জন্যে আয়েশা এতদূর আসেন নাই। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতভাবে আয়েশার সৈন্যদল হজরত আলির সেনা-তাঁবুতে আক্রমণ করে বসলো। অতি অল্পসময়েই তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাত হতে সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল, যুদ্ধ আর থামে না। হজরত আলির দক্ষ সেনাবাহিনীর সামনে আয়েশার সৈন্যগণ আর কতক্ষণ টিকে থাকবে? আয়েশার সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়লো। তারা পশ্চাদগমনের প্রস্তুতি নিল। এতক্ষণে দশহাজার মুসলিম সন্তানের তাজা রক্তে শুষ্ক-মরুভূমি রক্তনদীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নবীজির কাছ থেকে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) খেতাব প্রাপ্ত বীরের সামনে, উটের ওপর রমণীর উঁচু শীর! হজরত আলির আর সহ্য হয় না। নির্দেশ দিলেন, আয়েশার উটের পা কেটে ফেলা হউক। উটসহ আয়েশা মাটিতে পড়ে যান। হজরত আলি, আয়েশার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে বললেন, তোমার বোনকে উঠিয়ে মদিনায় নিয়ে এসো। (ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'জঙ্গে জামাল' নামে অধিক

পরিচিত)। হজরত আলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বটে, কিন্তু কল্পনা করতে পারলেন না, সামনে তাঁর জন্যে ও তাঁর আদরের ধন হজরত হাসান ও হোসেনের জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ সিফফিন ও কারবালা।

জামাল যুদ্ধে পরাজিত আয়েশাকে (রাঃ) বন্দী করে মদিনায় পাঠিযে দিয়ে হজরত আলি (রাঃ) বসোরা থেকে কুফায় গমন করলেন ৩৬ হিজরির রজব মাসে। সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করবেন। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখনও সিরিয়ার গভর্নর। মুয়াবিয়া (রাঃ) যে, হজরত আলিকে খলিফা হিসেবে এত সহজে মেনে নেবেন না, তা আলিরও জানা ছিল। আর মুয়াবিয়াও হজরত আলিকে লোমে-পশমে চেনেন। রহস্যজনক ভাবে মুয়াবিয়া, হজরত আয়েশার সমর্থনে জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। আলির জন্যে তা ছিল বিরাট উপকারী। কিন্তু আলি জানতেন না যে, আসলে হজরত মুয়াবিয়া সিরিয়ায় হজরত আলিকে লৌহকঠিন খাঁচায় বন্দী করার ফাঁদ পেতে রেখেছেন। মুয়াবিয়া রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে দিলেন যে, আলি ইচ্ছে করলে উসমানকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতালোভী আলি তা না করে হত্যাকারীদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং বাহুবলে শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। জামাল যুদ্ধে আলি যখন আয়েশার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে, মুয়াবিয়া তখন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। হজরত মুয়াবিয়া সারা পৃথিবীতে উমাইয়াবংশীয় শাসন কায়েম করতে চান। তার আগে হাশেমি বংশের নবী মুহাম্মদের (দঃ) একমাত্র উত্তরাধিকারী হজরত আলির জীবন প্রদীপ চিরতরে নিভিয়ে দেয়া চাই।

হজরত উসমানের সুদীর্ঘ বারো বছরের অপশাসনে আরব মুসলিম সাম্রাজ্যে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, উসমান হত্যার মধ্য দিয়ে তা আরও দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিল। হযরত আলির রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্ব এই সর্বপ্রথম কোরায়েশ বংশের হাশেমি গোত্রের নবী মুহাম্মদের রক্ত-সম্পর্কের একজন খলিফা পেলো। আলি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বটে কিন্তু দক্ষ রাজনীতিবিদ মোটেই ছিলেন না। ক্ষমতায় বসেই মারাত্মক ভুল করে বসলেন। আলির চোখে ভেসে ওঠে মুসলিম সাম্রাজ্যের এক কুৎসিত ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি। তাঁর মনে পড়ে সেই কালো রাত্রির কথা, যে রাতে হজরত ওমর তাঁর দরজার সামনে এসে হাঁক দিয়ে বলেছিলেন : "কে আছো ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো, আর আবু বকরের খেলাফত গ্রহণ করো, অন্যথায় মানুষসহ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো।' হজরত ফাতিমা বের হয়ে বলেছিলেন, 'আমার ঘরে নবীজির বিশ্বস্ত কয়েকজন সাহাবি মেহমান আছেন। ওমর, তুমি কি নবীজির মেয়ের ঘর আগুনে পোড়াতে চাও, যার হাতে আছে বেহেস্তের চাবি?" উল্লেখ্য, আবু বকরের খেলাফত গ্রহণ করার পর থেকে, ফাতিমার ঘরে রাতে কিছু লোক নিয়মিত বৈঠক করে পরামর্শ করতেন। তারা ফাতিমা ও আলির মতো আবু বকরের খেলাফত অস্বীকার করেছিলেন। ঐ ঘটনার পর হজরত ফাতিমা তাঁর স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, মৃত্যুর পর যেন তাঁকে রাতের আঁধারে গোপনে দাফন করা হয়, যাতে হজরত ওমর তাঁর জানাজায় আসতে না পারেন। এর কিছুদিন পরেই হজরত ফাতিমা ইন্তেকাল করেন। রাজ্যের সর্বত্রই হজরত আলি দেখতে পান মদ্যপায়ী, উচ্চাভিলাসী, শরিয়া-বিরোধী, স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী, নারী-আসক্ত, ভোগ-বিলাসী শাসকদের চেহারা। হজরত আলি এক সাথে সকল প্রাদেশিক গভর্নরের পদ 'অবৈধ' ঘোষণা করে দেন। রাগের বশে, আবেগের বশে, অথবা তাঁর ও তাঁর স্ত্রী হজরত ফাতিমার ওপর আবু বকর, ওমর ও ওসমান কর্তৃক সারা জীবনের অপমান, অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবেই হোক, হজরত আলির এ কাজটি ছিল অদূরদর্শিতার প্রমাণ। বেশ কিছু প্রাদেশিক গভর্নর তৃতীয় খলিফা উসমান হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ করা তো দূরের কথা, আলির খেলাফতই মেনে নিতে রাজি হলো না। 'উসমান হত্যার বিচার' ইস্যুটি ছিল হজরত মুয়াবিয়ার চক্রান্ত, আলির জন্যে এক মরণফাঁদ। মুয়াবিয়ার কাছে 'সবার ওপরে ধন আর ক্ষমতা সত্য'-এর উর্ধ্বে কিছুই ছিল না। হজরত মুয়াবিয়া ছিলেন নবী মুহাম্মদের (দঃ) রাজনৈতিক সচিব। মুয়াবিয়াই সম্ভবত নবী মুহাম্মদের (দঃ) 'ইসলাম' সৃষ্টির গোপন রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং রপ্তও করতে পেরেছিলেন। তাই রাজনৈতিক ইসলামের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ ফসল সম্ভবত তিনিই সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছিলেন। মুয়াবিয়া কোনোদিনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর (মুহাম্মদের) মাস্টার মাইন্ডেড ছল-চাতুরী, কৌশল, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ ভালোভাবেই অনুকরণ করেছিলেন। আর আজ সেই দক্ষতা দিয়ে প্রফেট বংশের শেষ বাতিটি চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দিতে মুয়াবিয়া উদ্দ্যত হয়েছেন। সারা মুসলিমজগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। উসমান হত্যায় জড়িত মিশর, মক্কা, কুফাসহ বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহীগণ হজরত আলিকে পরিস্কার হুমকি দিয়ে বসলো, যদি উসমান হত্যার বিচার করা হয়, তাহলে আলিকেও উসমানের মতো বড়ই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক পথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। আলি দেখলেন তিনি আজ সাত-পাঁকে বাঁধা পড়ে গেছেন। তলোয়ার দিয়ে রক্তের হুলি খেলা যে আলির নেশা, যে আলি মুহাম্মদের (দঃ) সহচরী হয়ে ৯৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে 'আলি হায়দার', 'সাইফুল্লাহ' 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবসমূহ পেয়েছিলেন সে আলী আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বড়ই ক্লান্ত। আজ মানুষের রক্তাসক্ত, আলির মাতাল তরবারি চায় একটু বিরতি, শান্তির একটু নিঃশ্বাস। কিন্তু তা তো হবার নয়। ক্ষমতা আর রক্ত যে একে অপরের সম্পূরক সে কথা বুঝতে আলির মোটেই দেরি হলো না।

(৭)

এখানে হজরত মুয়াবিয়ার জীবনের বিবিধ কার্যাবলী ও মুহাম্মদ (দঃ) বংশের হজরত আলির সাথে তাঁর শত্রুতার কারণ বুঝার প্রয়োজনে মুয়াবিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া ভাল। হজরত মুয়াবিয়া ছিলেন সাহাবি হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার জারজ সন্তান। আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার বিবাহের তিন মাস পরে মুয়াবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হিন্দা ছিলেন একজন 'বেশ্যা'। উর্দুভাষী একাধিক ঐতিহাসিক, হিন্দার চারিত্রীক বর্ণনায় 'বেশ্যা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সূত্রানুযায়ী হিন্দা, বেশ্যা না হলেও তিনি যে বহু-পুরুষগামী (Tart) মহিলা ছিলেন এবং মুয়াবিয়া যে তার জারজ সন্তান তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় হজরত হাসান (রাঃ) ও হজরত আয়েশার (রাঃ) উক্তিতে। শাম ইবনে মুহাম্মদ কালভি (রঃ) তাঁর 'কেতাবে মোসাব' বইয়ে লেখেন, 'হজরত হাসান (রাঃ) (হজরত আলির ছেলে, নবী মুহাম্মদের দৌহিত্র) একদিন ব্যঙ্গ করে হজরত মুয়াবিয়াকে বলেন, তোমার কি মনে আছে তোমার আসল পিতা কে? ইবনে আবি আল হাদিদ তাঁর '*নাহজুল বালাগা*' (ভলিউম ১০, পৃষ্ঠা ১৩০) বইয়ে উল্লেখ করেন, মুয়াবিয়ার জন্মদাতা হিসেবে সম্ভাব্য চারজন পিতার নাম লোকমুখে শুনা যায়; তারা হলেন : আবি ইবনে ওমর বিন মুসাফির, ওমর বিন ওলিদ, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং সাবাহ (এক ইথোপিয়ান কৃষ্ণাঙ্গ)। একই বক্তব্য পাওয়া যায় '*রাবিউল আবরার*' (ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ৫৫১) কেতাবে আল্লামা হজরত জামাক্শারির লেখায়। তবে যেহেতু আবু সুফিয়ানের, উতবা নামে সর্বজন স্বীকৃত আরেকজন জারজ সন্তান ছিলেন, আমরা ধরে নিতে পারি, বিয়ের আগে হজরত আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার দৈহিক সম্পর্কের ফসল হজরত মুয়াবিয়া। মুয়াবিয়া কর্তৃক আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদকে গাধার চামড়ায় মুড়িয়ে বস্তাবন্দী করে তাতে আগুন ধরিয়ে হত্যার সংবাদ শুনতে পেয়ে আবু সুফিয়ানের মেয়ে, মুয়াবিয়ার বোন ও নবীজির স্ত্রী উম্মে হাবিবা (আরেক নাম রামালা) আয়েশাকে আস্ত একটি ছাগল রান্না করে 'সদকা' হিসেবে পাঠিয়ে দেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, 'এর অর্থটা কি?' উত্তরে উম্মে হাবিবা বললেন, 'উসমান হত্যার পুরুস্কার। তোমার ভাই উসমানকে খুন করেছিল।' আয়েশা অভিশাপ দিয়ে বলেন, 'বহু-পুরুষগামী হিন্দার মেয়ের ওপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হোক।' এর পরে আয়েশা যতোদিন জীবিত ছিলেন, উম্মে হাবিবা ও তাঁর মা হিন্দাকে নামাজ শেষে অভিশাপ দিয়েছেন। (আর যতদিন বেঁচে ছিলেন নিজে কখনো ভাজা মাংস স্পর্শ করেননি)। এই হিন্দা (আবু সুফিয়ান পত্নী) 'পিতৃহত্যা-ভাতৃহত্যা ও চাচা হত্যার প্রতিশোধ' হিসেবে নবীজির চাচা হজরত হামজার কলিজা ভক্ষণকারী বলেও পরিচিত![১৯]

মুহাম্মদের (দঃ) মক্কা বিজয়ের পরে আবু সুফিয়ান নিজ পরিবার ও গোত্রের মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবু সুফিয়ান পেছনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকান। বদরের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাঁর নিজের ও মুহাম্মদের (দঃ) মধ্যকার শত্রুতা, কোরায়েশ বংশের অগণিত মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা এক দীর্ঘ ইতিহাস। চল্লিশটি বছর যে ছেলেটিকে আদরে আহ্লাদে কেউ এতোটুকু কটু কথা বলেনি, সেই হাশেমি বংশের একটা এতিম ছেলের হাতে উমাইয়া বংশের একি করুণ পরাজয়! আবু সুফিয়ান ও তাঁর পরিবারের মন থেকে সেই পরাজয়ের গ্লানি কোনোদিনই মুছে যায়নি। মুহাম্মদের (দঃ) কাছ থেকে, সরকারি উচ্চপর্যায়ে চাকুরি (সেক্রেটারি অব স্টেইট) দেয়ার অঙ্গিকার নিয়ে আবু সুফিয়ান ছেলে মুয়াবিয়াকে 'ইসলাম ধর্ম' গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে রাজি না হলেও পরে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে মুয়াবিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী, উচ্চাভিলাষী, চতুর রাজনীতিবিদ। তার অধীনেই মুসলিম সৈন্যগণ ত্রিপলী, আরমানিয়া, সাইপ্রাসসহ অনেক অঞ্চল দখল করে ভারত ও চীন দখল করতে চেয়েছিল। হজরত আলি তা ভাল করেই জানেন। আলি ভাবলেন, মদিনার অলিতে-গলিতে উসমান হত্যার আহাজারি, আকাশে-বাতাসে মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি থামতে না থামতেই আয়েশার বিরুদ্ধে করতে হলো 'জামাল যুদ্ধ'। রক্তক্ষয়ী জামাল যুদ্ধে দশ সহস্রাধিক মানুষের প্রাণনাশের পরপরই মুয়াবিয়ার সাথে আরেকটি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমুচিৎ হবে না। হজরত আলি হামদান প্রদেশের গভর্নর, বনি-বাজিলা প্রধান হজরত জারিরকে মুয়াবিয়ার প্রতি একটি প্রস্তাব দিয়ে সিরিয়া পাঠালেন, 'সিরিয়ার গভর্নর যেন অনতিবিলম্বে হজরত আলির খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন।' হজরত মুয়াবিয়া বিষয়টা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সুচতুর মুয়াবিয়া হজরত জারিরকে এমন এক মায়াবী মন-মাতানো আতিথিয়েতা দিয়ে মুগ্ধ করে দিলেন যে, হজরত জারির ভুলেই গেলেন, তিনি কী জন্যে এসেছিলেন। হজরত মুয়াবিয়ার চোখ-জুড়ানো রঙিন প্রাসাদে, চিত্তরঞ্জন করে হজরত জারির (রাঃ) ফিরে আসলেন দীর্ঘ তিন মাস পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে। এসে বললেন, 'মুয়াবিয়া (রাঃ) হজরত আলির সাথে রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় নিয়ে কোনো প্রকার আলোচনায় বসতে রাজি নন, যতোক্ষণ পর্যন্ত না হজরত উসমানের হত্যাকারীর ফাঁসি হবে।' তিনি আরও বললেন, 'এখনও হজরত উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কাটা আঙুল দামেস্কর মসজিদের মিনারে ঝুলছে। সিরিয়ার আপামর জনসাধারণ আল্লাহর নামে জীবনমরণ কসম খেয়েছে, যতদিন পর্যন্ত হজরত উসমানের হত্যাকারী ও হত্যার পরিকল্পনাকারীদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দামেস্কের মসজিদে হজরত উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তার স্ত্রীর কাটা আঙুল ঝুলন্ত থাকবে।' সাহাবি হজরত মালিক আল আশতার (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে হজরত জারিরকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের প্রস্তাব মুয়াবিয়াকে আদৌ দাওনি। দীর্ঘ তিনমাস মুয়াবিয়া তোমাকে তার রাজপ্রাসাদে

[১৯] আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hamza-ibn-'Abdul-Muttalib

চিত্ত-বিনোদনে মত্ত রেখে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে।' এই সেই সাহাবি হজরত মালিক আল-আশতার (রাঃ) যিনি অস্ত্রের মুখে হজরত আয়েশার দুই ভগ্নীপতি হজরত তালহা (রাঃ) ও জুবায়েরকে (রাঃ) হজরত আলির খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। ভয়ঙ্কর মালিক আল আশতারকে হজরত জারির ভালভাবেই চেনেন। আলি যখন হজরত তালহা (রাঃ) ও জুবায়েরকে (রাঃ) তাঁর খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেন, মালিক আল আশতার তখন তাদের মাথার ওপর উন্মুক্ত শাণিত তরবারি হাতে দণ্ডায়মান। প্রচণ্ড সাহসী বীর হজরত তালহা, যিনি ওহুদের যুদ্ধে নবীজির প্রাণরক্ষার্থে ঢাল হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের তীর বর্ষা নিজের বুকে-পিঠে গ্রহণ করেছিলেন, মালিক আল-আশতারের তলোয়ারের সামনে, আলির খেলাফত অনিচ্ছাকৃতভাবেই মেনে নিলেন। সাহাবি জুবায়েরকে জিজ্ঞাসা করায় যখন তিনি নীরব রইলেন, মালিক আল আশতার সিংহের মতো গর্জে উঠে হজরত আলিকে (রাঃ) বললেন, 'আলি (রাঃ), জুবায়েরকে আমার কাছে আসতে দিন, তার মাথাটা তলোয়ারের এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলি।' উল্লেখ্য, ইসলামের চার খলিফা নির্বাচনে প্রতিবারই একাধিক খলিফা পদপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু কোনোবারই গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং, কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের সময় থেকে। হজরত আলির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। হজরত জারির বুঝতে পারলেন এখানে থাকা তার জন্যে নিরাপদ নয়। তিনি কুফা ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যান এবং হজরত মুয়াবিয়ার সৈন্যদলে যোগদান করেন। মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্র ও দুষ্ট ছলচাতুরি দেখে হজরত আলি নিশ্চিত হলেন, বিষয়টার ফয়সালা অস্ত্রের মাধ্যমেই হতে হবে। সুতরাং আবারও যুদ্ধ, আবারও রক্তপাত। আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত হাসান সিরিয়া আক্রমণ করতে পিতাকে নিষেধ করলেন। হাসান বললেন, 'পিতা, প্রয়োজন হলে খেলাফত ছেড়ে দিন, মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে যাবেন না, মুয়াবিয়া সাংঘাতিক ভয়ানক মানুষ! এ যুদ্ধে মুসলিম-জাহানের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর কতো রক্তপাত, আর কতো প্রাণহানি?' হজরত আলি বললেন, 'আজ যদি মুয়াবিয়াকে ছাড় দেওয়া হয়, যদি তার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে না পারি, অল্পদিনের মধ্যেই সারা মুসলিম বিশ্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে বসবে।' হজরত আলি বিলম্ব না করে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। আলির ইচ্ছে হলো উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করে সিরিয়া দখল করবেন। তাই মেসোপটামিয়ান মরুভূমির মধ্য দিয়ে একদল সেনাবাহিনী অগ্রিম পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেনাদলটি আল ফোরাত নদীর পশ্চিম কিনারে এসে মুয়াবিয়ার একটি সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধ্য হয়ে তারা মেসোপটামিয়ান ফিরে যায়। এদিকে হজরত আলি মূল সৈন্যদল নিয়ে টিগরিস হয়ে পশ্চিমে মসুল এলাকার ফাঁড়ি পথে মেসোপটামিয়ান অতিক্রম করে আল-ফোরাত নদীর উপরিভাগে 'আর-রাককা' নামক স্থানে এসে উপনীত হলেন। আর-রাককা 'বালিক' ও 'আল-ফোরাত' নদীর মোহনা স্থান। অবাক বিস্ময়ে আলির সৈন্যদল লক্ষ্য করলেন নদীপাড়ে এক বিরাট মানববন্ধন তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি মালিক আল আশতার শাণিত তরবারি উঁচু করে তাদেরকে আক্রমণ করার হুমকি দিলেন। জনতা ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিল। সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় পৌঁছার পথে বেশ কয়েকটি জায়গায় হজরত আলির সৈন্যদলের সাথে মুয়াবিয়ার ছোট ছোট সেনাবহিনীর খণ্ডযুদ্ধ হয়। ৩৬ হিজরির জিলহজ মাসে (৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ), হজরত আলি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার 'সিফ্‌ফিন' নামক স্থানে এসে মুয়াবিয়ার ১২০ হাজারের মূল সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হন। ইতোমধ্যে আলির সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ হাজারে। আলি বুঝতে পারলেন চতুর্দিকে ব্যারিকেড, নদী পারে পানি-পথ বন্ধ, ১২০ হাজার সৈন্য মোতায়েন, এ সকল মুয়াবিয়ার বহুদিনের সুনিপুণ আয়োজন।

'সিফ্‌ফিন' ময়দানে এসে আলি (রাঃ) বিনা যুদ্ধে তাঁর খেলাফত স্বীকৃতি আদায়ের সকল প্রকার শেষ চেষ্টা করলেন। উসমান হত্যার বিচার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্যে হাতেমতাঈ পুত্র আদীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল পাঠালেন, নিজেও মুয়াবিয়ার কাছে ব্যক্তিগত পত্র দিলেন। কিন্তু তাঁর এই কোমলমতি আচরণ তীক্ষ্ম বুদ্ধির মুয়াবিয়ার চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলো না। মুয়াবিয়ার কাছে আলি মিথ্যাবাদী, প্রতারক। বসোরায় আয়েশার বিরুদ্ধে জামালযুদ্ধের সময়ে আলি প্রথমে হজরত তালহা ও হজরত জুবায়েরের প্রশংসা করে তাদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তালহা তুমি রসুলের (দঃ) একজন বিশ্বস্ত সাহাবি, ইসলামের একজন সাহসী বীর সৈনিক। তুমি আর আমি নবীজির পাশে থেকে অনেক যুদ্ধ করেছি। তুমি না-হলে নবীজিকে ওহুদের যুদ্ধে সাহাবি হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) হাত থেকে রক্ষা করা মুশকিল হতো। উল্লেখ্য, মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ ওহুদের যুদ্ধে মুহাম্মদের (দঃ) মাথায় তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করেছিলেন যে, নবীজির হ্যালমেট ভেদ করে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তাঁর দুটি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। একপর্যায়ে আলি যখন বললেন, তোমরা তো স্বেচ্ছায় আমার খেলাফত মেনে নিয়েছিলে, তাহলে আজ কেন আমার বিরোধিতা করছো? হজরত তালহা ও হজরত জুবায়ের একবাক্যে চিৎকার করে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমাদের মাথার ওপর তলোয়ার রেখে আলি স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছিলেন।' বসোরার জনগণ বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে একদল লোক মদিনায় প্রেরণ করলো। খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো, হজরত আলি শুধু তালহা ও জুবায়েরকেই নয়, অন্যান্য নেতৃপর্যায়ের লোক যারা খেলাফতের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন, সকলকেই জোরপূর্বক তাঁর খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। মুয়াবিয়া এও জানেন, তালহা ও জুবায়েরের এতো প্রশংসাকারী হজরত আলিই তাদেরকে হত্যা করে আয়েশার দুই বোনকে একসাথে বিধবার কাপড় পরিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া মনে মনে বললেন, আলি, আয়েশার বসোরা দেখেছো, মুয়াবিয়ার

সিরিয়া দেখো নাই। আলির প্রতিউত্তরে মুয়াবিয়া জানিয়ে দিলেন, উসমান হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে সোপর্দ না করা পর্যন্ত একটা সৈন্যও রণক্ষেত্র থেকে সরানো হবে না।' এতক্ষণে হজরত আলি বুঝলেন এখানেই হবে হয়তো তার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই হয়তো সূচনা করবে ইসলামের ভিন্নমুখী এক নতুন ইতিহাস। মুয়াবিয়া জানেন, উসমান হত্যাকারীদেরকে শাস্তি দেয়া আলীর পক্ষে সম্ভব নয়। আলিও জানেন তার সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ লোকই উসমান হত্যায় জড়িত। আলির সেনাপতি মালিক আল আশতার ও মুহাম্মদ বিন আবু বকর তাদের অন্যতম। উসমান হত্যাকারীদেরকে মুয়াবিয়ার হাতে সোপর্দ করা আর প্রকারান্তরে তাঁকে খলিফা মেনে নেয়ারই সমান।

৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস সৈন্য মোতায়েন, সংলাপ বিনিময়, ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধে অতিবাহিত হলো। মে মাসে বিশাল প্রশস্ত সিফ্‌ফিন মাঠ, ইসলামের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সেনাদলের পদাঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠলো। বর্শা আর তরবারির ঝনঝনানী শব্দে, রণবাদ্যের হুংকারে স্তব্ধ হয়ে যায় জগতের পশুপক্ষী, জীবজন্তুর কলরব। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর ১২০ হাজার সৈন্যকে ৮জন সেনাপতি দিয়ে ৮টি দলে বিভক্ত করলেন। অপরপক্ষে আলিও তাই করলেন। যুদ্ধের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য, এই বিশাল আয়োজন দেখে উভয় পক্ষই আতঙ্কিত হলো, এই বুঝি ইসলাম ও মুসলিম জাতি বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যায়! কেউই পুরোদমে (Full scale) যুদ্ধ শুরু করতে চাইলো না। বিচ্ছিন্নভাবে সেক্টর ভিত্তিক যুদ্ধ চললো পুরো একমাস। আসলো জুন, ৩৭ হিজরির পবিত্র মহর্‌রম মাস। উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতি চাইলো। হজরত আলি পুনরায় সংলাপের মাধ্যমে বিষয়টার সমাধান চাইলেন। চতুর মুয়াবিয়া বিরতির সময়টাকে প্রপাগাণ্ডা ছড়ানোর কাজে লাগালেন। আলির সৈন্যদলে যারা উসমান হত্যার বিচার কামনা করে, তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, আলি সত্যিকার অর্থে উসমান হত্যার বিচার করবেন না, কারণ হত্যাকারীরা আলির আত্মীয়, আলি তাদেরকে চেনেও না-চেনার ভান করেন। খলিফা উসমান হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করাতো দূরে থাক বরং অনেককে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে পুরস্কৃত করেছেন। আলির কিছু লোক তাঁর ওপর সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলো। উভয় পক্ষের সংলাপ চলতে থাকলো। এক পর্যায়ে সিরিয়ার সংলাপ প্রতিনিধিদল আলিকে প্রশ্ন করেন, 'আলি, আপনার দৃষ্টিতে খলিফা উসমানকে হত্যা করা কি ন্যায়-সঙ্গত ছিল'? আলি জবাব দেন, 'এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলবো না।' মুয়াবিয়ার প্রপাগাণ্ডার বৃক্ষে ফল ধরতে শুরু করলো। আলির সকল প্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তিনি দেখলেন এখান থেকে বিনা যুদ্ধে পরিত্রাণ পাওয়ার সকল পথ মুয়াবিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আরবি সফর মাসে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রতিদিন উভয় পক্ষে শতশত প্রাণহানি ঘটতে থাকলো। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) একাই একদিনে, প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করে এক-এক করে ৪০০জন শত্রুর মস্তক কেটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুয়াবিয়ার একজন সৈন্য আলির পেছনে ধাওয়া করে এসেছিল। আলি তলোয়ার দিয়ে তার পেট বরাবর এমন শক্ত কোপ মেরেছিলেন, চোখের পলকে লোকটির শরীরের নীচভাগ ঘোড়ার পিঠে রেখে উপরিভাগ মাটিতে পড়ে যায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বিরামহীন যুদ্ধ চললো। দিনে দিনে প্রাণহানির সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। তবে তুলনামূলকভাবে মুয়াবিয়ার দিকে হতাহতের সংখ্যা ছিল বেশি। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন, বিজয় নিকটবর্তী। মুয়াবিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নের কথা ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়েই মুয়াবিয়ার সেনাপতি সাহাবি হজরত আমর ইবনে আস (রাঃ) তাদের শ্রেষ্ঠ প্রতারণার অস্ত্রটি ব্যবহার করার অনুমতি চাইলেন। মুয়াবিয়ার অনুমতি নিয়ে হজরত আমর ইবনে আস তাঁর সৈন্যবাহিনীর বর্শার ফলকে ৫০০ কপি কোরান গেঁথে দিয়ে উড়াতে নির্দেশ দিলেন। আলির সেনাবাহিনী থমকে গেল, বিষয়টা কি? আমর ইবনে আ'স বললেন, 'আর রক্তপাত নয়, উভয় পক্ষের অসংখ্য মুসলমান নিহত হয়ে গেছেন। আমরা অস্ত্র নয়, কোরানের মাধ্যমে ফয়সালা চাই। হজরত আলি তাঁর সিপাহীদেরকে নিষেধ করলেন, 'সাবধান মুয়াবিয়ার প্রতারণায় কর্ণপাত করো না, এ নিছক প্রতারণা বৈ কিছু নয়।' বেশকিছু সৈন্য আলির কথা অমান্য করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিল। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার দৌড়ে এসে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আরো কিছুক্ষণ সময় তোমরা ধৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, বিজয় আমাদের অনিবার্য।' এক নাগাড়ে একমাস যুদ্ধ করে অবশ ক্লান্ত দেহের আলির একদল সৈন্য হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে বললো, 'আমরা অস্ত্রের চেয়ে কোরানের মাধ্যমে ফয়সালা শ্রেষ্ঠ মনে করি।' চতুর্দিক দিক থেকে 'আল্লাহর আইন, কোরানের ফয়সালা' চিৎকার ধ্বনি শুনা গেলো। আলি পুনরায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তার দলের কিছু লোক, এই বলে আলির ওপর অভিযোগ আনলো যে, আলি ইচ্ছে করেই ক্ষমতার লোভে মুসলিম জাতিকে এ যুদ্ধে লিপ্ত করেছেন এবং তিনি উসমান হত্যার বিচার মোটেই চান না। আলিকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে হলো। বনি-কিন্দা প্রধান হজরত আল-আশা'ত মুয়াবিয়াকে জিজ্ঞেস করেন : '৫০০ খানি কোরান বর্শার মাথায় গাঁথার মানেটা কি? মুয়াবিয়া বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছের ওপর, তাঁর কোরানে লিখিত সমস্যার সমাধান খোঁজা আমাদের উচিৎ।' কোরানকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেও মুয়াবিয়া কোরানিক সমাধানটা নিজেই দিয়ে দিলেন। বললেন, 'উভয় পক্ষ নিজ নিজ দল থেকে একজনকে প্রধান করে মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠন করা হউক। মধ্যস্থাতাকারী দুই প্রধান যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।' আলির লোকজন সমস্বরে বলে উঠলেন : 'আমরা মানি, আমরা মানি।' বৈঠক বসার আগে হজরত মুয়াবিয়া অতি গোপনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেললেন। হজরত উসমানের সময়ের মিশরের গভর্নর হজরত আমরকে বললেন, 'বৈঠকে সিদ্ধান্ত যাই হোক তুমি মিশর ছাড়বে না।' হজরত আমর বললেন, 'যদি মিশর আলির দখলে চলে যায়?' সর্বপ্রথম মিশর

আক্রমণ করা হবে, তোমরা প্রস্তুত থেকো। মুয়াবিয়া হজরত আমরকে আশ্বস্ত করলেন। আলির পক্ষে মধ্যস্থতাকারী দল-প্রধানও মুয়াবিয়ার তৈরি। আলি প্রস্তাব করলেন, দল-প্রধান হিসেবে প্রবীণ নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নাম। আলির লোকেরা প্রতিবাদ করলো। তারা প্রস্তাব করলো মুয়াবিয়ার সমর্থক হজরত আবু মুসা আশারির (রাঃ) নাম। আলি বললেন : 'সর্বনাশ, আবু মুসা আশারি একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। তাকে আমি কুফার অস্থায়ী গভর্নর করে পাঠিয়েছিলাম। সে আমার খেলাফত অস্বীকার করায় এই সেদিন আমি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি।'

(৮)

এক সময়কার হজরত আলির অন্ধসমর্থনকারী কুফাবাসীও আজ আলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। তারা বললো, 'আলি তোমারই কারণে আয়েশার বিরুদ্ধে জামাল যুদ্ধে কুফার হাজার হাজার নারী বিধবা হয়ে কাঁদছে, তাদের চোখের জল আজও শুকায়নি।' ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (৩৭ হিজরির রমজান মাস) ঐতিহাসিক 'আলি-মুয়াবিয়া' শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের সত্তর হাজার মানুষের রক্তে আজ স্যাত স্যাতে পিচ্ছিল সিফ্ফিনের বিশাল সবুজ মাঠ। এর আগে ইসলামের ইতিহাসে এতো বড় হত্যাকাণ্ড আর কখনো ঘটেনি। হজরত আলির ২৫ হাজার আর হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষের ৪৫ হাজার মানুষের গলাকাটা লাশ পড়ে রইলো সিফ্ফিন প্রান্তরে। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দেখতে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, কুফা, বাসরা, মিশরসহ রাজ্যের সকল প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হলো। কোনো এক গোপন রহস্যে হজরত মুয়াবিয়া, 'সন্ধিপত্র' লেখার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে আলির পক্ষকে অনুরোধ করলেন।

তারা সন্ধিপত্র তৈরি করতে থাকুন, ইত্যবসরে আসুন দেখা যাক, যুদ্ধের মাঠে ও যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে কে, কোথায়, কি বলেছিলেন : হজরত আম্মার (রাঃ) তাঁর অধীনস্থ আলির একদল সৈন্যকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা কি শুনো নাই, নবীজি জীবিতকালে বহুবার বলেছেন, যে লোক আমার আলিকে দুঃখ দেবে, মনে করো সে আমাকেই দুঃখ দিল, যে লোক আমার আলির বিরুদ্ধাচরণ করবে, মনে করো সে আমারই বিরুদ্ধাচারণ করলো। তোমরা কি জানো না এই মুয়াবিয়া একজন বিধর্মী, ইসলামের শত্রু, সে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের প্রেমে ইসলাম গ্রহণ করে নাই। ? তার রাজপ্রাসাদে অমুসলিম নারীদের আনাগোনা, বিধর্মীদের সাথে তার মেলামেশা। আমরা জেহাদ করছি নবীজির শত্রুদের বিরুদ্ধে, বিধর্মী শাসকের হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাতে।' হজরত আম্মারের (রাঃ) কথা সম্পূর্ণই সত্য। মুয়াবিয়া এবং তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ঘটনাটি ছিল এরকম : মক্কা বিজয়ের পরপরই নবী মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানকে তাঁর একটি খাস কামরায় তলব করলেন। বুদ্ধিমান আবু সুফিয়ান ঘরে ঢুকেই ঘরের পরিবেশ দেখে অনুমান করতে পারলেন, কি জন্যে তাঁকে ডাকা হয়েছে? মুহাম্মদের (দঃ) ডানে বামে দুইজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের একজন। ইবনে আব্বাসের চাদরের নিচে তলোয়ার লুকানো। কোরায়েশ নেতার বুঝতে বাকি রইলো না মুহাম্মদ (দঃ) তাকে কি প্রশ্ন করবেন : মাথা দেবে, না মুহাম্মদের অধীনতা মেনে নেবে? আবু সুফিয়ান অধীনতা মেনে নিলেন। ঘরে গিয়ে পুত্র মুয়াবিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। মুয়াবিয়া বললেন, 'একি বলছেন আপনি? এই সেদিন বদরের যুদ্ধে আপনার চোখের সামনে মুহাম্মদ আমার দুটি ভাইকে খুন করেছেন। আপনি নিজের হাতে আপনার ছেলেদেরকে দাফন করেছেন। পুত্রশোকে মা (হিন্দা) আমার পাগলবেশে মক্কার অলিতে-গলিতে গড়াগড়ি করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করবো না, আমি এর প্রতিশোধ নিবো।' আবু সুফিয়ান বললেন, 'শত্রুকে শক্তিবলে পরাজিত করতে না পারলে, তার দলে যোগদান করা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিশোধ নেয়ার সময় একদিন আসতেও পারে।'

হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মুয়াবিয়ার সৈন্যদলের এক সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ, খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) সেই খুনি পুত্র, যিনি উসমানের শাসনামলে তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনের আসামি, যাকে জনতার আদালতে হজরত আলি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, আর হজরত উসমান তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। আজ সিফ্ফিনের ময়দানে সাহাবি হজরত ওমরের (রাঃ) পুত্র ওবায়দুল্লাহ ও সাহাবি হজরত আবু বকরের (রাঃ) পুত্র মুহাম্মদ একে অপরকে বধ করতে অস্ত্র হাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁর সৈন্যদেরকে বলেন, 'আমিরুল মোমেনিন হজরত মুয়াবিয়ার সমর্থক সিপাহী সাথীরা, আমার চক্ষের সামনে হজরত উসমানের খুনিকে (মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে ইঙ্গিত করে) স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যে সকল খুনিদের বিচার হজরত আলি করতে পারেননি, আজ এই মাঠে তাদেরকে হত্যা করে আমরা খলিফা উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নিবো, আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবো।' ওবায়দুল্লাহর সেই সাধ পূরণ হয়নি। কিছুক্ষণ পরেই আলির সৈন্যের তীরের আঘাতে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। ওবায়দুল্লাহর মরদেহ কেউ না তুলেই পলায়নের পথ খোঁজছিল। ওবায়দুল্লাহ যা বলছিলেন, তা আংশিক সত্য। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর হজরত উসমান হত্যায় জড়িত ছিলেন কিন্তু আলির ৯০ হাজার সৈন্যদলের সবাই উসমান হত্যার পক্ষে ছিলেন না। সত্য কথা হলো, মুয়াবিয়ার দলেও উসমান হত্যায় জড়িত অনেক লোক ছিলেন। মুয়াবিয়া অতি কৌশলে কিছু লোককে

সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে, যাকে যেভাবে পারেন লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং হজরত আলি (রাঃ) খলিফা উসমান হত্যার বিচার করলেও সিফ্‌ফিন যুদ্ধ এড়াতে পারতেন না।

মহর্‌রম মাসে যুদ্ধ বিরতির সময়ে মুয়াবিয়ার এক যোদ্ধাকে হজরত হাশিম ইবনে উতবা (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের হয়েছেটা কি? তোমরা কেন বোঝতে পারছ না, উসমানকে কেন আমরা হত্যা করেছি। উসমান নিজের পছন্দের লোক দিয়ে কোরান লিখিয়েছেন। নবী পরিবার ও কোরানের অবমাননা করেছেন, আগুন দিয়ে কোরান পুড়িয়েছেন। যারা জালিম খলিফা উসমানকে হত্যা করে নবীর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা তো নবীর বিশ্বস্ত লোক। তোমরা কি নবী পরিবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে?'

হজরত আলি একে একে বেশ কয়েকজন সাহাবির নাম উল্লেখ করে তাদের চারিত্রিক পরিচয় দিলেন। তন্মধ্যে মুয়াবিয়া, হজরত আমর ইবনে আস, হজরত আবি মুয়াত, হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর, হজরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্, হজরত হাবিব মাসলামাহ অন্যতম। আলি বললেন, 'মুয়াবিয়া বিধর্মী, ওবায়দুল্লাহ সর্বজন নিন্দিত সন্ত্রাসী, খুনী, আমর ইবনে আস লুটেরা, ডাকু স্বৈরাচারী, আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্ নিজে কোরান লিখে এখনো কোরান আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে না, আবি মুয়াত ও হাবিব মাসলামাহ্ দেশদ্রোহী, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক। তোমরা সবাই এদেরকে না চিনলেও আমি ছোটবেলা থেকে এদেরকে চিনি, জানি। তোমরা বিশ্বাস করো, এ জেহাদ মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের জেহাদ, এ জেহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জেহাদ।'

শেষ পর্যন্ত ৭০ হাজার মানুষের প্রাণনাশের পর যুদ্ধ থামলো। এবার সন্ধিপত্র লেখা হবে। মক্কা, মদিনা, কুফা, সিরিয়ার বড় বড় প্রবীণ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। লেখক লেখা শুরু করলেন : 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, এই মর্মে আমিরুল মোমেনিন হজরত আলি (রাঃ) ইবনে আবি তালিব ও হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান...' থামুন! বজ্রকণ্ঠে আমর বিন আস লেখককে থামিয়ে দেন। কি ব্যাপার? লেখক জিজ্ঞেস করেন। আমর বলেন, 'আমিরুল মোমেনিন হজরত আলি (রাঃ) লাইনটি কেটে ফেলা হউক। আলি তোমাদের আমিরুল মোমেনিন হতে পারেন, আমাদের নন।' সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলির বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে! যেন একটা বিষ-মাখানো তীর তাঁর বুক ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আলি বুঝলেন মুয়াবিয়া বহুদিনের পুরনো একটি ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটালো : সেদিন মুহাম্মদ (দঃ) ও আবু সুফিয়ানের মধ্যকার ঐতিহাসিক 'হুদাইবিয়া-সন্ধি'কালে একই ঘটনা ঘটেছিল। ঐ দিন কলম ছিল আলির হাতে। আলি লিখছিলেন, 'পরম করুণাময় আল্লার নামে, এই মর্মে আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ও আবু সুফিয়ান ইবনে...' থামুন! আবু সুফিয়ান ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রসুল কথাটি বাদ দিয়ে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখা হউক, মুহাম্মদ তোমাদের রসুল হতে পারেন, আমাদের নয়।' হজরত আল আহনাফ (রাঃ) বললেন, 'দোহাই আপনাদের, হজরত আলির নাম থেকে 'আমিরুল মোমেনিন' উপাধিটি মুছে ফেলবেন না, নবী বংশকে জগৎ থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে ফেলার এ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র।' নবীজির কথা মনে পড়ায় আলির চোখের জলের বাধ ভেঙে যায়। ফোটা দু-এক অশ্রু গাল বেয়ে তার দাড়ি ভিজিয়ে দিল। জীবনে নবীজি দুজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, একজন আলি আর একজন হজরত ফাতিমা (রাঃ)। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে, 'হুদাইবিয়া-সন্ধি'কালে নবীজি যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই আলি বললেন, 'ঠিক আছে 'আমিরুল মোমেনিন' কথাটি কেটে দেয়া হোক।' উভয়পক্ষের প্রতিনিধি প্রধানগণ পরামর্শ দিলেন, যতদিন পর্যন্ত কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত না করেছেন, ততদিন পর্যন্ত আলির লোকজন আলিকে ও মুয়াবিয়ার লোকজন মুয়াবিয়াকে তাদের খলিফা হিসেবে মেনে চলবে। কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারবে না। কমিটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার সময় নিলেন কমপক্ষে ছয় মাস। এবার নিজ নিজ লাশ গ্রহণের পালা। মানুষের রক্তে পিচ্ছিল মাঠ, হাটতে গিয়ে অনেকেই বারবার হোঁচট খেল। উভয়পক্ষের সত্তর হাজার মানুষ আর গৃহে ফিরে এলো না। স্বামীহারা বিধবাদের আর্তচিৎকার, পিতৃহারা শিশুদের ক্রন্দনরোল শুনা গেল আরব দেশের ঘরে ঘরে বহুদিন।

কয়েক মাস পর আজ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি কোরান নিয়ে বসেছেন কোরানিক ফয়সালা দিতে। হায়রে জগতের অভাগা মুসলমান! আজ অবধি তারা বুঝতে সক্ষম হলো না, রমজান মাসের যে দিন থেকে কোরান নামক বইখানি আরবের বুকে তৈরি হলো, সেদিন থেকে শান্তি নামের সুখ-পাখিটি আরব ছেড়ে লক্ষযোজন দূরে চলে গেছে! মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি প্রধান সিংহরূপী আমার ইবনে আস-এর সামনে, আলির প্রতিনিধি প্রধান আবু মুসা 'মুষিক ছানা'র সমান। প্রবীণ নেতা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) আবু মুসাকে ধূর্ত আমর (রাঃ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বললেন, 'সাবধান আবু মুসা, এই ধূর্ত মানুষটা মিশরের গভর্নর থাকাকালীন সময়ে খলিফা উসমানও তাঁকে ভয় পেতেন। খলিফার নিযুক্ত মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্‌কে বাধ্য করেছিল তার সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে, আমর ইবনে আস (রাঃ), হজরত আবু মুসাকে এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করলেন। মুয়াবিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমর, আবু মুসাকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখালেন। শাহী ভোজন ও আপ্যায়ন পর্ব সমাপন করে আমার ইবনে আস (রাঃ), আবু মুসাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কি মনে হয় আলি কোনোদিন উসমান হত্যার বিচার করবেন?' আবু মুসা উত্তর দেন, 'উসমান হত্যা পূর্ব সময় থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, আমি মনে করি এসব কিছুর জন্যে হজরত আলি ও মুয়াবিয়া সমভাবে

দায়ী।' এ উত্তরটাই হজরত আমর ইবনে আস কামনা করেছিলেন। তারিখ ঘোষণা করে সমাবেশ ডাকা হলো বিচারকদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে। সমাবেশে আমর ইবনে আস খুব নম্র ভাষায় বিনীত ভঙ্গিতে অনুরোধ করলেন আবু মুসা যেন প্রথম বক্তব্য প্রদান করেন। আবু মুসা ঘোষণা দেন : "আমারা তত্ত্বাবধায়ক কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আজ থেকে আলি ও মুয়াবিয়া উভয়ের খেলাফত অবৈধ ঘোষণা করা হলো। সাধারণ নির্বাচানের মাধ্যমে জনগণ নতুন খলিফা নির্বাচিত করবেন।" তারপরই আমর ইবনে আস তার বক্তব্যে ঘোষণা দেন, 'আবু মুসার সাথে আমিও একমত। রাজনীতিতে আলি সম্পূর্ণই নতুন। খলিফা হওয়ার যোগ্যতা তাঁর এখনও হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের আইন-প্রশাসন বলতে কিছুই নেই। জাতি আজ এক অশুভ রাহুগ্রস্থ। এই সঙ্কটময় দিনে আমিরুল মোমেনিন হজরত মুয়াবিয়ার মতো একজন বিচক্ষণ-দক্ষ রাজনীতিবিদ আমাদের প্রয়োজন।' বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো আবু মুসার মাথায়। গালি দিয়ে ওঠলেন অশ্লীল ভাষায়। শুরু হলো কোরানের 'কালাম-যুদ্ধ'। দুনিয়ার যত অশ্লীল গালি আছে তারা ছুঁড়তে থাকলেন একে অপরের প্রতি। আলির প্রতিনিধি দল চিৎকার করে তেলাওত করলেন কোরানের (৭নং) সুরা আ'রাফের ১৭৫নং আয়াতটি : "তাদেরকে তুমি সেই লোকের কথা শোনাও যাকে আমি নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা বর্জন করে, (আর কেমন ক'রে) শয়তান তার পিছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।"[২০] আলির সমর্থকগণ মিছিল বের করে শ্লোগান দিতে থাকে 'মুয়াবিয়া শয়তান! মুয়াবিয়া শয়তান!' অপরপক্ষে মুয়াবিয়ার লোকজন নিয়ে এলো (৬২নং) সুরা আল জুম্আ ৫ ও ৬ নং আয়াত দুটো : "যাদেরকে তৌরাতের ভার দেওয়া হয়েছিল তারপর তারা তা অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বই বওয়া গাধার মতো। কত নিকৃষ্ট তাদের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে। আর আল্লাহ অন্যায়কারীকে সৎপথে চালান না।" এবং "বলো, ওহে, যারা ইহুদি-মত পোষণ করো, যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু-বান্ধব, অন্য কোনো লোকজন নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[২১] কোরান থেকে 'কালাম-যুদ্ধ' করতে করতে তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। সম্মেলন ভঙ্গ হয়ে যায়। শান্তি প্রদানে ব্যর্থ কোরান বুকে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরলেন। হজরত আলি কুফায় বসে সম্মেলনের এ সংবাদ শুনে খুবই আহত হলেন। আকাশ পানে দু'হাত তুলে লম্বা একটি দোয়া করলেন: 'হে দয়াময়, মহাশক্তিমান প্রভু, তোমার সর্বনিকৃষ্ট গজব অর্পিত করো তাদের ওপর, বিশেষ করে মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আস, আবুল আওয়ার আল সুলাইমি, আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্, হাবিব ইবনে মাসলামাহ, আব্দুর রহমান বিন খালিদ, জাহাক বিন কায়েস আর অলিদ বিন উকবার ওপর।'

(৯)

আলির এই দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছিল কী-না জানা যায়নি, তবে মুয়াবিয়ার কানে যথাসময়েই পৌঁছিল। মুয়াবিয়া জুমার নামাজের জন্যে খুতবায় নতুন কিছু আয়াত সংযোজন করতে তার সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন। মুয়াবিয়া সেদিন থেকে আইন করে প্রতি শুক্রবার খুতবায়, নবী পরিবার অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত হামজাহ, হজরত আলি, হজরত ফাতিমা, হজরত হাসান ও হোসেনকে অভিশাপ দেয়া বাধ্যতামূলক করে দেন। হযরত হুজুর ইবনে আদি নামের একজন সাহাবি মুয়াবিয়ার এ আদেশ অমান্য করায় মুয়াবিয়া তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। আমরা এখানে বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত আবুল আলা মৌদুদির '*খেলাফত ও রাজতন্ত্র*' গ্রন্থে থেকে উক্ত ঘটনাটি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি[২২] : "হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে খুতবায় প্রকাশ্যে মিম্বারে হযরত আলি (রাঃ)-এর লানত (অভিসম্পাত) এবং গালিগালাজের সিলসিলা শুরু হলে অনেকেই অতি কষ্টে চুপ করে থাকতেন। কিন্তু কুফা নগরীতে নবীজির অন্যতম সাহাবি হজরত হুজর ইবনে আদি (রাঃ) মুয়াবিয়ার এ নির্দেশ প্রত্যাখান করে হজরত আলির (রাঃ) প্রশংসা করতে লাগলেন। হজরত মুগিরা (রাঃ) কুফার গভর্নর থাকালীন সময়ে ইবনে আদির কোন অসুবিধা হয়নি কারণ তখনও কুফায় খুৎবায় অভিশাপ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়নি। কিন্তু বসোরার গভর্নর হজরত জিয়াদের (রাঃ) আমলে কুফাকে যখন বসারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, জিয়াদ (রাঃ) জুমার খুতবায় হজরত আলিকে অভিশাপ দেয়া শুরু করে দেন। হুজর ইবনে আদি (রাঃ) এর প্রতিবাদ করলেন। একদিন ইবনে আদি (রাঃ) হজরত যিয়াদকে জুমার নামাজে দেরি করে না আসার জন্য সতর্ক করেন। হজরত জিয়াদ (রাঃ) ইবনে আদি ও তাঁর ১২জন সঙ্গী-সাথীর ওপর মিথ্যা দেশদ্রোহিতা ও খলিফা মুয়াবিয়াকে অভিশাপ দেয়ার অভিযোগ এনে তাদেরকে গ্রেফতার করে

[২০] ইউসুফ আলি অনূদিত আয়াতটি হচ্ছে : "Relate to them the story of the man to whom We sent Our signs, but he passed them by: so Satan followed him up, and he went astray." (7:175).

[২১] ইউসুফ আলি অনূদিত ইংরেজি আয়াত দুটি হচ্ছে : "The similitude of those who were charged with the (obligations of the) Mosaic Law, but who subsequently failed in those (obligations), is that of a donkey which carries huge tomes (but understands them not). Evil is the similitude of people who falsify the Signs of Allah: and Allah guides not people who do wrong." Say: "O ye that stand on Judaism! If ye think that ye are friends to Allah, to the exclusion of (other) men, then express your desire for Death, if ye are truthful!" (62:5-6).

[২২] সাইয়েদ আবুল আলা মৌদুদি, (অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী), *খেলাফত ও রাজতন্ত্র*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৩।

মুয়াবিয়ার নিকট সিরিয়া পাঠিয়ে দেন। মুয়াবিয়া ৫১ হিজরিতে অভিযুক্ত ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দেন। তাদের একজন সাথী হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানকে হজরত মুয়াবিয়া গভর্নর জিয়াদের নিকট ফেরত পাঠান। জিয়াদ তাঁকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলেন।"

যাহোক, সম্মেলনের সংবাদ শুনে কুফার জনগণ কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। হজরত আলি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপনের অজুহাতে 'খোরাইজ' গোত্র সরাসরি আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলো। মধ্যপথে বিজয়ক্ষণে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়ায় আরেক দল অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অনেকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে লাগলো মুয়াবিয়া একজন সুদক্ষ, শক্তিশালী শাসক। দিন যত যায়, মুয়াবিয়ার দল বড় ও শক্তিশালী হতে থাকলো আর আলির খেলাফতের প্রাচীর ভেঙে একটি একটি করে ইট খসে পড়তে থাকলো। কিন্তু আলি থেমে যাওয়ার পাত্র নন। মুহাম্মদের (দঃ) রক্ত তাঁর শিরা-উপশিরায়। হজরত আলি মরণপণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। বিদ্রোহী চরমপন্থী মৌলবাদী (Extermist Fundamentalist) 'খোরাইজ' বা খারিজি দল আলি ও মুয়াবিয়া উভয়কে প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব একটি দল গঠন করলো। তারা আল্লাহর হুকুমত, কোরানের শাসন কায়েম করতে চায়। তাদের মতে আলি ও মুয়াবিয়া দুজনই কোরান-বিরোধী শাসক। সিফ্ফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত এরা আলির পক্ষেই ছিল। যেহেতু আলি, মুয়াবিয়ার মতো একজন বিধর্মীর সাথে শান্তিচুক্তিতে দস্তখত করেছেন এবং রাজ্যে শরিয়ার আইন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে হজরত আলিও একজন বিধর্মী। খারিজি দল 'হারোরা' নামক একটি গ্রামে সমেবেত হয়ে তাদের মতাদর্শ প্রচার করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দলে পরিণত হলো। তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে, মানুষের গলা কেটে, জীবন্ত মাটিতে পুঁতে, নির্বিচারে হত্যা করে সারা এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে দেয়। হজরত আলি দিবস-রজনী কষ্ট করে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাবলিগ করে কিছু লোককে পুনরায় সিরিয়া আক্রমণের জন্যে রাজি করিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, এখন তাঁর সামনে সিরিয়া আক্রমণের চেয়ে বিদ্রোহী খারিজি দলকে দমন করা আবশ্যক হয়ে গেছে। এদিকে খারিজিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, মুয়াবিয়া, আলি ও আমার ইবনে আস এই তিনজনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেন না। তাদের শ্লোগান হলো 'লা হুক্‌মা ইল্লা লিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর শাসন ছাড়া কোনো শাসন নাই। তাদের মতে 'সব মুমিন মুসলমান যখন সমান, এক আল্লাহ বরাবর তখন কোনো খলিফারই দরকার নেই, কোনো মানুষের হাতে বায়েত গ্রহণের নেই কোনো প্রয়োজন। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত শাসন-পরিষদের হাতে থাকবে দেশ শাসনের দায়িত্ব।' হজরত আলি তাদের কাছে লোক পাঠালেন, বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি কোরানের খেলাফ কোনো কাজ করেন নাই। ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন, 'রাজ্যে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে সকল আগে মুয়াবিয়াকে ধ্বংস করতে হবে। আর এ জন্যে তোমাদেরকে আমার সাথে যোগদান করে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।' তারা পাল্টা উত্তর দিল, 'আলি আপনি কোরান অমান্যকারী, আপনি কোরান বুঝেন না।' হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে বিদ্রোহী খারিজি দল, তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো বাগদাদ থেকে ১২ মাইল দূরে 'নহরওয়ান' নামক স্থানে। বসোরাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু লোক এসে তাদের সাথে যোগদান করলো। ১২ হাজার সদস্যের খারিজি জঙ্গি দল এখান থেকেই রাষ্ট্রের সর্বত্র খাটি ইসলামি আইন বাস্তাবয়ন করবে। তাদের মূল মন্ত্র হলো রাজ্যের সকল সমস্যার ফয়সালা করবে একমাত্র কোরান।

খারিজিদেরকে নিজ দলে আনতে সকল প্রকার চেষ্টা করে হজরত আলি ব্যর্থ হয়ে ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়া আক্রমণের যাত্রা পথে 'নোখাইল'-এর উপত্যকায় এসে তাবু ফেল্লেন। আলির কাছে সংবাদ এল, সন্ত্রাসী খারিজিরা 'নাহরাওয়ান'-এর গভর্নর হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে খাববাবকে মুরগিকাটা কেটে খুন করেছে, সাথে গভর্নরের অন্তসত্তা ক্রীতদাসী ও বনু-তাঈ গোত্রের তিনজন নিরপরাধ মহিলাকেও অত্যন্ত নির্মমভাবে তারা হত্যা করেছে। বিষয়টা তদন্ত করতে হজরত হারিস ইবনে মুররাহকে 'নাহরাওয়ান' প্রেরণ করা হলো। খারিজিরা ইবনে মুহরাহকেও হত্যা করে ফেলে। আলির সন্দেহ হলো এই মুহূর্তে সিরিয়া আক্রমণ করতে গেলে খারিজিরা কুফা দখল করে নিতে পারে। হজরত আলি খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ৩৮ হিজরির সফর মাসের ৯ তারিখ খারিজিদের সাথে আলির যুদ্ধ হয়, যা ইতিহাসে 'যুদ্ধে নহরওয়ান' বা 'খাল-যুদ্ধ' নামে অভিহিত। আলির শক্তিশালী সৈন্যগণ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই খারিজিদের ১২ হাজার সদস্যকে তাদের তলোয়ারের নিচে কতল করতে সক্ষম হলেন। মাত্র ৯জন খারিজি পলায়ন করে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক Sir William Muir-এর ভাষায় : "The Snake was scotched, not killed." বছর দুয়েক পর ৪০ হিজরিতে এই ৯ জনের তিনজন মিলে হজরত আলিকে মসজিদ প্রাঙ্গণে খুন করে।

খারিজিদেরকে হত্যা করে আলি ভেবেছিলেন একটা আপদ গেলো, এবার সিরিয়া আক্রমণ করতে আর কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু বিধি বাম, আলির সৈন্যগণ আর কোনোমতেই যুদ্ধ করতে রাজি হলো না। হজরত আলির বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ভগ্ন হৃদয়ে কুফায় ফিরে গিয়ে আলি নিজের লোকজনকে ভীরু-কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিয়ে শান্ত হয়ে যান। এদিকে আলির এই নীরবতা হজরত মুয়াবিয়ার মোটেই ভাল লাগলো না। মুয়াবিয়ার দৃঢ় সংকল্প, 'আমি সেই দিন হবো

শান্ত, যেদিন জগতের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার মতো হাশেমি বংশের কেউ থাকবে না।' মুয়াবিয়া জানেন এখন আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিংহ ও ছাগলের ব্যবধান। মুয়াবিয়ার বাবা আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, 'শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ একদিন আসতেও পারে।' পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়ার এখনো কিছুটা বাকি। সুতরাং দুর্বল ছাগলের শক্তিও আলির আছে কিনা পরীক্ষা করতে মুয়াবিয়া দিকে দিকে ছোট্ট ছোট্ট সেনাদল পাঠালেন। আজ থেকে কয়েক যুগ পূর্বে ঠিক যেভাবে নবী মুহাম্মদ রাতের অন্ধকারে একটি একটি করে আরব অমুসলিম গোত্রের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা করে তাদের সহায়-সম্পত্তি দখল করেছিলেন, মুয়াবিয়ার সৈনগণ সেভাবেই একের পর এক আলির প্রদেশসমূহ দখল করতে লাগলো। ইসলামের জন্মভূমি ও নবী মুহাম্মদের রাজধানী মদিনা আক্রমণ করার জন্যে সাহাবি হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হজরত বাশারকে সেনাপ্রধান করে একটি শক্তিশালী দল মদিনা পাঠালেন। হজরত বাশারের সৈন্যবাহিনী দানবের মতো আক্রমণ করে বসে মদিনার মানুষের ওপর। তারা ক্ষণিকের মধ্যেই সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত মদিনাবাসী বিনা যুদ্ধেই মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলো। বিজয়ী বাশার মদিনাবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'মদিনার লোক যদি আজ খলিফা মুয়াবিয়ার নির্দেশ নিয়ে না আসতাম, আল্লাহর কসম মদিনার একটা পুরুষও আমি জীবিত রাখতাম না।' সেনাপতি বাশার, নবী মুহাম্মদকর্তৃক বনি মুত্তালিক গোত্রের ওপর আক্রমণের তুলনায় মদিনাবাসীর ওপর অশেষ করুণাই করলেন। সেদিন নবী মুহাম্মদ বনি মুত্তালিক গোত্রের একটা পুরুষকেও জীবিত রাখেন নাই, উপরন্তু তাদের সকল নারীদেরকে বন্দী করে তাঁর সেনাবাহিনীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মদিনা জয় করে বাশার, তার দল নিয়ে ইয়েমেন দখল করতে রওয়ানা হলেন। মদিনা পতনের সংবাদ পেয়ে হজরত আলি কাগুজে বাঘের মতো কিছুক্ষণ গর্জন করলেন। কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। মদিনার মতো একই পদ্ধতিতে আক্রমণ করে সেনাপতি বাশার ইয়েমন দখল করে নেন। তবে সেখানকার গভর্নর হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাধা প্রদান করায় তাঁকেও তাঁর ছোট ছেলেকে বাশার হত্যা করেন।

ছোট ছোট রাজ্যগুলো দখল করে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এবার দৃষ্টি ফেললেন মিশরের ওপর। সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা মিশরের গভর্নর আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারবে না, তাকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি নিজ হাতে তার বিচার করবো।' উল্লেখ্য, আবু বকর মদিনার খলিফা হওয়ার পর, হজরত আবু সুফিয়ান তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন, 'এই আবু বকর তোমার দুই ভাইয়ের হত্যাকারী, আমার বিশ্বাস তুমি একদিন এর প্রতিশোধ নেবে।' মুয়াবিয়ার সন্দেহ ছিল আলি কুফা থেকে সৈন্য পাঠিযে মিশর রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আলির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং মিশর দখল করতে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর তেমন বেগ পেতে হলো না। আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদকে বন্দী করে মুয়াবিয়ার কাছে নিয়ে আসা হলো। মুয়াবিয়া ঠাণ্ডা মাথায় মুহাম্মদকে বলেন, 'তোমাকে এমন মৃত্যু উপহার দেবো যা খলিফা উসমান হত্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর, তরবারি ও বর্শার আঘাতে মৃত্যুর চেয়েও কষ্টদায়ক।' হজরত মুয়াবিয়া আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদকে গাধার চামড়ায় মুড়িয়ে বস্তাবন্দী করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

মুয়াবিয়ার মনে আছে, বদরের যুদ্ধে তার পিতা আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে এই আবু বকর, তার পুত্র মুহাম্মদ ও তার কন্যা আয়েশা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই মুয়াবিয়া সেদিন 'জামাল যুদ্ধে' হজরত আলির বিরুদ্ধে বিবি আয়েশাকে সাহায্য করেননি। হিজরি ৪০ সনের রমজান মাস। খারিজি দলের তিনজন লোক হজরত আলিকে হত্যার উদ্দেশ্যে মসজিদের পাশে অবস্থান নেয়। আলি মসজিদ থেকে বেরিয়ে দ্বারপ্রান্থে আসামাত্র শাবির ও আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম, হজরত আলির মাথায় বিষ মাখানো তলোয়ার দিয়ে সজোরে আঘাত করে। কিছুদিন পরেই ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে (৪০ হিজরি, ১৭ই রমজান, শুক্রবার) হজরত আলি তেষট্টি বছর বয়সে কুফায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে হজরত আলিকে হত্যা করতে গিয়ে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম গ্রেফতার হয় জনতার হাতে। আলির মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) পিতার হত্যাকারী মুলজামকে বস্তায় ভরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন।

পিতৃশোকে কাতর হজরত হাসান (রাঃ) বাবার শোকসভায় বলেন, 'আজ এমন একটি পবিত্র মাসে নবীজির শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে ঘাতকরা হত্যা করলো, যে মাসে কোরান শরিফ নাজিল হয়েছিল। যে মাসে হজরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ আকাশে তুলে নেন, যে মাসে হজরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেন। কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীরা কোরান লেখককেই খুন করে ফেললো।' উল্লেখ্য, হজরত আলি নবী মুহাম্মদের পাশে পাশে থেকে কোরানের বাণী লিখতেন। হজরত উসমান যখন কোরান সংকলন করেন আলিকে সংকলন কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়। ৩৩ সন্তানের জনক, হজরত আলি জীবনে তাঁর প্রথম স্ত্রী ফাতিমার মৃত্যুর পর আরো ৮ জন রমণীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন।

হজরত আলি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু মুয়াবিয়া আলি পরিবারের পিছু ছাড়লেন না। হজরত হাসান (রাঃ) ঘরমুখো নিরীহ, সরল, স্বভাবের মানুষ ছিলেন। রাজনীতি বা ক্ষমতালোভী ছিলেন না, তবে শোনা যায় নারীলোভী ছিলেন। হজরত আলির ভক্তগণের চাপে প্রথমে অস্বীকার করে, পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে খেলাফত গ্রহণ করেন। হাসানকে ক্ষমতা থেকে সরানো এখন হজরত মুয়াবিয়ার জন্যে মাটির পুতুল ভাঙার মতোই সহজ। এক নাগাড়ে দীর্ঘ তিন যুগের শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষ মুয়াবিয়া সবগুলো কাজ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। তিনি জানেন 'ধর্ম' অশিক্ষিত ও দুর্বল মানুষকে ধোঁকা দেয়ার একটি সহজ অথচ শক্তিশালী অস্ত্র, তা দিয়ে উন্নতশীল রাষ্ট্রগঠন বা গণকল্যাণমুখী কোনো কাজ সাধন হয় না। তাই মাঝে-মাঝে তিনি প্রয়োজনে খুব সতর্কতার সাথে 'ধর্ম' ব্যবহার করতেন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের ধারে কাছেও যেতেন না। বরং তিনি পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাজ্য বাইজানটাইন, আরমানিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। পরবর্তীতে ঐ সকল এলাকা দখল করে বহু খ্রিস্টান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজনকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। বহুজাতিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, রাজতন্ত্রের আদলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হজরত মুয়াবিয়া, ধর্মনিরপেক্ষ এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। যুদ্ধকালীন কঠিন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সিরিয়ার জনগণ সবসময় তাদের নেতার পাশে থেকে সমর্থন দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হজরত আলির ধর্মতান্ত্রিক ঘুনেধরা পঁচা সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অনাস্থা এনে দলে দলে মুয়াবিয়ার দলে আসতে থাকে। হজরত আলির একান্ত বাধ্য সৈন্যগণ, এমনকি নবী বংশের হজরত হাসানের আপনজন চুরি, দুর্নীতি, মিথ্যাচারে জড়িয়ে পড়েন। হাসান একদিন দুঃখ করে বলেন, 'এই দুনিয়ায় নবীর আদর্শ, কোরান-হাদিসের অনুসারী একজন মানুষও কি বেঁচে নেই?'

হজরত মুয়াবিয়া কুফা ও বসোরার অবস্থা পরখ করার লক্ষ্যে দুইজন গুপ্তচর পাঠালেন। একই সাথে কুফার অদূরে ৬০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করে হাসানকে, পত্রমারফত জানিয়ে দিলেন, 'স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করো, নইলে অস্ত্রের মাধ্যমে কুফা দখল করা হবে।' হাসান তাঁর পিতার রক্ষিত ৪০ হাজার সৈন্য থেকে, হজরত কায়েসকে সেনাপতি করে ১২ হাজার সৈন্য মুয়াবিয়ার মোকাবিলায় সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে পারস্যের প্রাচীন বিলাসবহুল কুসুম কাননে বিশ্রাম নেন। বিশ্রামরত অবস্থায় হাসানের কাছে খবর এলো সেনাপতি হজরত কায়েস আর বেঁচে নেই। সৈন্যগণ রণভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে। পালিয়ে আসা হাসানের নিজের সৈন্য ও বিক্ষুব্ধ জনতা দৌড়ে এসে তাঁর রঙ্গমঞ্চের তাঁবু ছিড়ে-ভেঙে, ছিন্নভিন্ন করে তাদের মনের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করলো। যে মখমল কার্পেটে বসে তিনি আয়েশে আরাম করছিলেন, একজন লোক হেঁচকা টানে কার্পেটটি উঠিয়ে নেয়। তারা হাসানকে 'কাফের'-'মুশরিক' বলে গালি দিতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে হজরত হাসান পালিয়ে আত্মগোপন করলেন। ভীরু, কাপুরুষ, নারীলোভী হাসান, মুয়াবিয়ার কাছে সংবাদ দিলেন, তিনি বিনা যুদ্ধে দুটি শর্তে আত্মসমর্পন করতে রাজি। শর্তনামায় হজরত হাসান লিখলেন : (এক) কুফায় বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি, রাজস্বখাতে জমাকৃত সোনা-দানা, টাকা-পয়সা আমাকে দিতে হবে, যাতে বাকি জীবনটুকু কাটাতে আমাকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়; (দুই) আমার বাবা ও আমাদের পরিবারের নামে জুমার নামাজে খুতবাপাঠে অভিশাপ দেয়া বন্ধ করতে হবে।

মুয়াবিয়া ইচ্ছে করলে বলপূর্বক কুফা দখল করতে পারতেন। কুফার সামান্য ধনের পিপাসা মুয়াবিয়ার নেই, আছে নবী মুহাম্মদের বংশের রক্তপান করার নেশা। বুদ্ধিমান মুয়াবিয়া অপ্রয়োজনে তাঁর একটি সৈন্যও হারাতে রাজি নন। হাসানের দুটো শর্তই তিনি মেনে নিলেন। তবে দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে বললেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে আলি পরিবারকে অভিশাপ দেয়ার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দেয়া হলো, তবে জনগণ যদি স্বেচ্ছায় তা চর্চা করে তাতে সরকারের কিছু বলার থাকবে না। হজরত আলির অন্ধ সমর্থক, বেঁচে থাকা অবশিষ্ট শিয়াদের পানে 'ব্যক্তি স্বার্থপর' হাসান ফিরে তাকালেন না। রাজস্ব কিছু সম্পদ নিয়ে স্বপরিবারে মদিনায় চলে যান। কুফায় হাসান আত্মসমর্পন করার কিছুদিন আগেই, বসোরার গভর্নর (নবীবংশের) ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজরত মুয়াবিয়াকে চিঠি লিখে আত্মসমর্পন করে তার দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির অভিযোগে আলির যুগেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বেচ্ছায় বসোরার গভর্নরপদ ত্যাগ করার আগে রাজভাণ্ডার শূন্য করে নিয়ে যান। মুয়াবিয়া এখানেও অসন্তুষ্ট হলেন না। এখন শুধু হাসান আর হোসেনের প্রাণ দুটো হাতে এলেই হয়। মুয়াবিয়ার মিশন সম্পূর্ণ কমপ্লিট।

সমস্ত আরব বিশ্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক সম্রাট মুয়াবিয়া রাজকীয় বেশে কুফায় প্রবেশ করলেন। জনগণ প্রফুল্লচিত্তে ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করলো। কুফা নগরীকে বসোরার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। দামেস্ক হলো মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। এবার গোপনে সকলের অগোচরে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নিলেই হয়। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) গুপ্তচরের মাধ্যমে, হজরত হাসানের স্ত্রী জায়েদা বিনতে আশাত বিন কায়েসকে জানিয়ে দিলেন, 'জায়েদা যদি তার স্বামী হাসানকে হত্যা করতে পারে, তাহলে তাকে একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে এবং খলিফার পুত্রবধু করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে।' একদিন হাসান রোজা ছিলেন। জায়েদা তার স্বামীকে দুধে বিষ মিশিয়ে ইফতার করতে দেন। বিষ পানের চল্লিশ দিন পর ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবি ৫০ হিজরির সফর মাসে হজরত হাসান

(রাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। জায়েদা স্বামীকে হত্যা করে যখন মুয়াবিয়ার কাছে তার পুরস্কার দাবি করলেন, মুয়াবিয়া জায়েদাকে একলক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্বামী হত্যাকারী মহিলাকে আমার পুত্রবধু বানাতে পারি না।'

মুয়াবিয়া এবার ভাবলেন, নিজে ক্ষমতায় থাকতেই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উমাইয়া বংশের হাতে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথমে বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করলেন। স্বপুত্র এজিদকে রাজপুত্র ঘোষণা দিয়ে রাজতন্ত্র কায়েম করবেন। বিষয়টা সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে 'রাজকুমার' না 'খলিফা' ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের সমর্থনে, না বল প্রয়োগ করে পুত্রের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন, এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সীমাহীন মতোবিরোধ দেখা যায়। আমরা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত রাখার লক্ষ্যে দু-একটি উদাহরণের প্রতি আলোকপাত করবো :

ইবনে খালেদুন (Ibn Khaldoun) তাঁর '*Qayd Al-Shareed min Akhbar Yazeed*' বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "Mu`awiyah was eager for people's agreement to give allegiance to his son Yazeed. He resolved to take allegiance to Yazeed as a crown prince. So he consulted the grandest companions, the masters of the people and the district's governors. They all accepted. Delegations from the districts came with acceptance to give allegiance to Yazeed. Many Companions gave him the allegiance as well. Hafij Abdul ghoni says,`His (Yazeed's) caliphate is reightful, sixty of the companions of the prophet give him the allegiance. Abdullah Ibn`Umar was one of them."

এই তথ্যানুযায়ী নবীর সহচরী ৬০ জন সাহাবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুয়াবিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, সুতরাং এজিদকে ইসলাম বিরোধী বললে সাহাবিদেরকেও অপমান করা হবে। হয় এজিদ ও সাহাবিগণ সত্যের পথে ছিলেন, না হয় যে অপরাধে এজিদ দোষী, সেই অপরাধে সাহাবিগণও দোষী।

মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে বলেন,

> "O my son, I have arranged everything for you, and I have made all the Arabs agree to obey you. No one will now oppose you in your title to the caliphate, but I am very much afraid of Husayn Ibn Ali, Abdullah Ibn Umar, Abdur Rahman Ibn Abu Bakr, and Abdullah ibn Zubayr. Among them Husayn Ibn Ali commands great love and respect because of his superior rights and close relationship to the Prophet. I do not think that the people of Iraq will abandon him until they have risen in rebellion for him against you. As far as possible, try to deal with him gently. But the man who will attack you with full force, like a lion attacks his prey, and who will pounce upon you, like a fox when it finds as opportunity to pounce, is Abdullah Ibn Zubayr. Whenever you get a chance, cut him into pieces." (দ্রষ্টব্য : '*ইক্বদ আল ফারিদ*' (Iqd all Fareed), ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ২২৬)।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে এজিদ কেটে কুটরো টুকরো করেছিলেন কিনা জানা যায়নি তবে পিতার অসম্পূর্ণ কাজটি তিনি পূরণ করেছিলেন। এজিদ অত্যন্ত নৃশংস, অমানুষিকভাবে হজরত হোসেনকে (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে স্বপরিবারে হত্যা করেন। মৌলানা সাঈদ কুতুবের লেখা '*Social Justice in Islam*' (আরবি ভার্সন *Adalah al-ijtima iyah fi al-Islam*) বইয়ে আমরা আরও দেখতে পাই[২৩] :

> "After the oath was taken to Yazid in Syria Mu`awiya gave Syed ibn'Aas the task of gaining the acceptance of the people of the Hejaz. This he was unable to do, so Mu`awiya went to mecca with an army and with full treasurey. He called together the principal Muslims and addressed them thus: "You all know that I have lived among you, and you are aware also of my ties of kindred with you. Yazid is your brother and your nephew. It is my wish that you take the oath of allegiance to Yazid as the next Caliph; then it will be you who will bestow offices and depose from them, who will collect and apportion money." He was answered by Adullah ibn Zubair, who gave him a choice of three things to do, first he might do as Allah's Messenger had done and appoint no successor, second he might do as Abu Bakr had done and nominate a successor, third he might do as Umar had done, and hand over the whole matter to a council of six individuals,

[২৩] Sayyid Qutb, *Social justice in Islam*, Islamic Publications International, New York, USA, 2000, Page 209-210.

> none of whom was a member of his own immediate family. Mu`awiya's anger was kindled, and he asked "Have you any more to say?" "No". Mu`awiya's turned to the remainder of the company" "And you?" "We agree with what Ibn Zubair has said", they replied. Then he addressed the meeting in threatening terms: "The one who warns is blameless. I was speaking among you, and one of you was bold to get up and call me a liar to my face. That I will bear and even forgive. But I stand to my words, and I swear by Allah that if any of you speaks one word against the position that I take up, no word of answer will he receive, but first the sword will take his head. And no man can do more than save his life.
>
> Thereupon the commander of Mu`awiya's guard ordered two to stand over each of the nobles of the Hejaz who opposed him and to each he said, "If your man leaves his guards to speak one word, either for me or against me, then let the guards strike off his head with their swords". Then he mounted the pulpit and proclaimed: "These men are the Leaders and the choicest of the Muslims; no matter can be successfully handled without them, nor can any decision be taken without their counsel. They are now satisfied to take the oath to Yazid and have indeed already taken that oath by the name of allah". So the people took the oath. " (ঈষৎ সংক্ষেপিত) ।

মৌলানা হজরত রসিদ আখতার (দেওবন্দি) তাঁর '*তাহজীব আওর তামাদ্দুনে ইসলাম*' বইয়ের ১ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাধারণ মানুষকে জোরপূর্বক এজিদকে খলিফা মানতে বাধ্য করেছিলেন । একই বক্তব্য পাওয়া যায় সিরিয়ান লেখক হজরত রসিদ রেজার 'ইমামাতুল উজমা' বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠায় । অধ্যাপক সাইয়্যেদ আকবর এলাহাবাদী '*মুসলমানৌ কা উরজ ও জাওয়াল*' গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় এবং সাইয়্যেদ আবুল আলা মৌদুদি '*খেলাফত আওর মুলকিয়াত*' পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫ বইয়ে, উভয়েই মুয়াবিয়াকে অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক এজিদকে খলিফা মানতে বাধ্য করার দায়ে অভিযুক্ত করেন ।[২৪] (দ্রষ্টব্য : *খেলাফত ও রাজতন্ত্র*, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫২) ।

তবে সুখের কথা হলো, কোনো প্রকার সংঘাত, প্রাণহানি ছাড়াই হজরত মুয়াবিয়া তাঁর রাজতন্ত্র কায়েম করার ইচ্ছে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন । ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর, এজিদ তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন । উমাইয়া বংশ ৬৬১ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । তাই হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) আরব বিশ্বে 'উমাইয়া রাজতন্ত্রের স্থপতি' হিসেবেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ।

অসত্য, মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চণার উপর ভিত্তি করে যে ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, জগতের অগণিত নিরপরাধ শিশু-নারী-পুরুষের রক্ত পান করে যার বিকাশ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র তার বেঁচে থাকার অবধারিত অধ্যায়, অনিবার্য অবলম্বন ।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) আবুল ফজল, হজরত আলী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৩ ।

(২) মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, হজরত ওসমান, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

(৩) স্যর সৈয়দ আমীর আলী, *এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯২), ২০০৫ ।

(৪) Sir William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall*, Revised edition by T. H. Weir. John Grant, Edinburgh, 1924; The internet version can be read at: http:// www.answering-islam.org/Books/Muir/Caliphate/

(৫) Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 'The Life of Muhammad', (translated in English by A. Guillaume), Oxford University Press, London, 1955, 2004.

(৬) Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *The History of Al-Tabari,* Vol. 17: The First Civil War: From the Battle of Siffin to the Death of Ali. Translated by Hawting, State University of New York Press (SUNY), N.Y., USA.

(৭) Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *The History of Al-Tabari,* Vol. 18: Between Civil Wars: The Caliphate of Mu'awiyah AH 40-60. Translated by M.Morony, State University of New York Press (SUNY), N.Y., USA.

[২৪] S.A. Mawdudi, *Khilafat wa Mulukiyyat*, published by Idara Tarjuman ul Quran, page 164-165

(৮) Saiyid Safdar Hosain, *The Early History of Islam*, Vol 1 & 2, Low Price Publications, Delhi, India, (First Published 1933), Reprinted 2006.
(৯) Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Low Price Publications, Delhi, India, (First Published 1923), Reprinted 2002.

সমাপ্ত